HINDUISM.

Scientific, Philosophic and Theosophic.

PART II.

BY

Sri Nath Ghosh, M.B.

LATE MEDICAL ADVISER TO H. H. THE MAHARAJA OF PANNA.

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম।

দ্বিতীয় ভাগ।

হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মরূপের ব্যাখ্যান।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ, এম, বি,

পান্নাধিপতির ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার কর্ত্তৃক বিরচিত।

১৩১০।

Price 1/8. মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা।

৫৫ নং জানবাজার ষ্ট্রীট—"ক্লাসিক প্রেসে"

শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

"বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম" নামক পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগ আজ জনসমাজে প্রকাশিত হইল। ইহাতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান দর্শন ও জড়বিজ্ঞানের মতে হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মরূপের নানামত ও অনুষ্ঠান ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইল। কৃতবিদ্যমাত্রেরই বিশ্বাস, সাকারোপাসনা অপেক্ষা সভ্যদেশের নিরাকারোপাসনা উৎকৃষ্ট। তাঁহাদের মতখণ্ডনের জন্য পুরাকালের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে সভ্যদেশের সগুণ নিরাকার লৌকিক ঈশ্বরের উপাসনা যে কত পৃথক, আধুনিক নিরাকারোপাসনাপদ্ধতি যে কতদূর অসার, ইহা অপেক্ষা সাকারোপাসনা যে কতদূর সহজ ও ফলদায়ক, তাহাই এ পুস্তকে নানা সুযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্রমাণিত হইল। হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতনের দিনে অনেকে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের গূঢ় তাৎপর্য্য না বুঝিয়া সকলই ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া উড়ান। তাঁহাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রোক্ত তীর্থভ্রমণাদি নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানের গূঢ় তাৎপর্য্য ও রহস্য এ পুস্তকে বর্ণিত ও উদ্ঘাটিত হইল। পুস্তকপাঠে হয়ত অনেকে মনে করিবেন, যে ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের অযথা প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে। স্বধর্ম্মের প্রশংসা যথোচিত হউক বা অযথোচিত হউক, তাঁহাদের নিকট করযোড়ে মিনতি, তাঁহারা যেন সমগ্র পুস্তকখানি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া স্বধর্ম্মের গুণাগুণ বিচার করেন। এখন যদি পুস্তক পাঠে সহৃদয় পাঠকবর্গ জাতীয় ধর্ম্মে অধিক আস্থাবান হন, আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইতি

নিবেদন,

গ্রন্থকারস্য।

ROW RAJA KHOMAN SING JU DEB
deceased third Prince of Panna.

DEDICATION.

Oh Thou ill-starred deceased Third Prince of

PANNA, ROW RAJA KHOMAN SING JU DEB BAHADOOR,

In 1901 when through the treachery of your own nephew, His Highness The Mohendra Maharaja Madhab Sing Bahadoor of Panna and through the machinations of his well-known concubine Hadrijan, your untimely and lamented death occurred from arsenic poisoning and the beneficent Government of India touched with compassion on your bereaved family and in vindication of the cause of justice took cognisance of the case and ultimately were graciously pleased to dethrone the reigning Chief, Madhab Sing, sentencing his Hindu Secretary Acchalal to ·apital punishment and to raise your minor son Jadabindra g to the *guddy* of Panna, the poor author of this k, who then in the service of His Highness, in obedie to the dictates of his own conscience, tried in his humble way to uphold the cause of virtue, honesty and truth, even at a tremendous risk of his life, had by an irony of fate to relinquish all his connection with that illustrious Royal Family, to which he had the honour to render an unstinted service and homage for a period of 17 long years. Now though that connection, once so dear and dignifying, has ceased most probably for ever, he can not wipe out from his mind the sweet recollections of your blessed companionship which you were then so pleased to grant him. It was through that blessed companionship that he was inspired with many noble and elevating thoughts about the principles of Hindoo Religion, which you with your deep knowledge and vast erudition in the countless treasures of the ancient *shasters* inculcated into his mind. In respectful acknowledgment of the debt immense of endless gratitude which you were thus pleased to lay him under, THIS BOOK is dedicated in your beloved name with a fervent prayer that your departed soul may rest in peace in heaven and your noble son may live long in the blissful enjoyment of such hard-fought and dear-bought Throne of Panna as its pride and glory, walking in the footsteps of his illustrious fore-fathers and glorifying the most noble and august family of the Great *Chatrasal.*

CALCUTTA,
Dated the 30th January, 1904.

By the Author.

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৬	শাস্ত্রাধ্যয়ন	শাস্ত্রাধ্যয়নে
৪	২০	এ্যস্ত	ত্রস্ত
৪	২৫	ঈর্ষ্যা	ঈর্ষা
৫	৩	পরিস্ফূরিত	পরিস্ফুরিত
৫	১৮	স্ফূরিত	স্ফুরিত
১১	২৩	শতাব্দি	শতাব্দী
১৪	৯	বিশ্বোদর	বিশ্বোদার
২৬	২২	কেমন হইয়া	হইয়া
২৬	২৬	করে ; মাত্র	করে মাত্র ;
২৬	২৮	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
৩০	৩	দোষে !	দোষে
৩১	৮	স্থূলত্ব পরিবর্দ্ধনের	স্থূলত্বপরিবর্দ্ধনের।
৩২	৯	পারে	পারেন
৩৫	২	জগতে,	জগতে
৩৫	৫	আভ্যন্তরিণ	অভ্যন্তরীণ
৪৬	১১	এমন	এখন
৪৭	১৪	করে ?"	করে ?
৪৭	১৯	হইবে।	হইবে।"
৫৭	১৮	হয়।	হয়
৬২	১৪	করিয়া	করিয়াও
৭৩	২	পরমেশ্বর	পরমেশ্বর।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৪	১৬	বিচ্যুত	বিচ্যুত
৭৪	২৮	প্রকৃতি জগতে	প্রকৃতিজগতে
৮৬	৪	আজ	আরও
১০৩	৫	দেব চিকিৎসক	দেবচিকিৎসক
১০৪	১১	ভৌতত্বকি	ভৌতত্বিক
১০৮	১৮	লিপ্ত	লিপ্ত,
১০৯	১৩	Brontal	Frontal
১১৪	১	আবির্ভূত	আবির্ভূত,
১১৫	২২	নির্ম্মিত	নির্ম্মিত,
১২০	৪	মাবব	মানব
১২৭	২৭	দুরাদৃষ্টের	দুরদৃষ্টের
১২৮	২৮	জোড়হস্ত	যোড়হস্ত
১৪৭	৪	তিনি	তিনিই
১৫২	৩	পড়ে !	পড়ে ?
১৫৪	৮	কম্ববাহী	কম্বাবাহী
১৫৭	১	না,	না ;
১৬৬	২৪	আবশ্যক,	আবশ্যক ;
১৬৯	১২	“মা	(বসিবে না)
১৬৯	১৪	ভগবতি ।”	“মা ভগবতি !”
১৮৫	২	দেন !	দেন,
২২৯	১২	দুরীভূত	দূরীভূত

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও ইংরাজী পুস্তকে আজকাল অনেকেই পাঠ করেন, অর্দ্ধ সভ্য ভারতবর্ষে এখনও পৌত্তলিকতা প্রবল। ইংরাজগুরুগণের নিকট সুশিক্ষা পাইয়া, যে সুসংস্কার আজ তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল, তাহা তাঁহারা আজীবন পরিহার করিতে পারেন না। এই সুসংস্কার বশতঃ তাঁহারা ভাবেন হিন্দুধর্ম্ম অসার, অপদার্থ, সুনীতিবর্জ্জিত, কুসংস্কারপূর্ণ পৌত্তলিকতা মাত্র। বল দেখি, যে ধর্ম্ম বালকদিগের বাল্যক্রীড়ার ন্যায় কদর্য্য কর্দ্দমের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে উপদেশ দেয়, সে ধর্ম্মের মতন অপকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? যে ধর্ম্মের আদর্শ পুরুষগণ বিজয়পানোন্মত্ত ও মদ্যপানোন্মত্ত হইয়া অরুণ নয়নে, ভস্মাবৃত দেহে ও পাপান্তঃকরণে কাল্পনিক দেবতার পূজা করে, সে ধর্ম্মের মতন অপকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? যে ধর্ম্ম অশেষ দোষাকর কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা প্রচার করতঃ স্বসেবকমণ্ডলীর ভিতর ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও অনৈক্য চিরদিন প্রবল রাখে, সে ধর্ম্মের মতন অপকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে?

"তা নয়! তা নয়! ওরে যাদুমণি!" যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা ইহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারেন না। কুশিক্ষা

বশতঃ তাঁহারা আজকাল কেবল কতকগুলি কুসংস্কার নিজমনে বদ্ধমূল করেন। এই কুসংস্কারই তাঁহাদের সকল অনর্থের মূল। ইহারই জন্য তাঁহারা আজকাল হিন্দুধর্ম্মে এত বীতশ্রদ্ধ। ইহারই জন্য তাঁহারা শাস্ত্রের অমূল্য রত্নকে সামান্য কাঁচ জ্ঞানে অবজ্ঞা করেন। তাঁহাদেরই বা দোষ কি? চতুর্দ্দিকে তাঁহারা যেরূপ দেখেন এবং যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন, স্বধর্ম্মে অনাস্থা উহার অপরিহার্য্য ফল। ইংরাজী পুস্তকে তাঁহারা যাহা পাঠ করেন, তাহাই আজ তাঁহাদের বেদবাক্য। ইংরাজদিগের মুখে তাঁহারা যাহা শ্রবণ করেন, তাহাই আজ তাঁহাদের একমাত্র আপ্তবাক্য। ইংরাজ পণ্ডিতগণ হিন্দুশাস্ত্রের যেরূপ অর্থ করুন না, উহাদেরই অর্থ তাঁহাদের নিকট একমাত্র আদরণীয়। সে স্থলে হিন্দুধর্ম্ম যে এখনও স্বমস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক ভারতে বর্ত্তমান, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করেন, সে সকল মতামত আমাদের গ্রহণ করা কি কর্ত্তব্য? তাঁহাদের লেখনী হইতে যাহা কিছু বিনিঃসৃত, তাহাই যে অমোঘ সত্য, তাহা কদাচ হইতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আকাশপাতাল প্রভেদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যতই কেন চেষ্টা করুন না, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ও যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। অতএব তাঁহাদের কথায় আমাদের কর্ণপাত না করাই শ্রেয়।

শব্দের অর্থ করিয়া ও ব্যাকরণ দেখিয়া শাস্ত্র পাঠ করা, আর শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা, এতদুভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। গ্রীফিথ সাহেব রামায়ণ ইংরাজি পদ্যে অনুবাদ করেন। তিনি কি রামায়ণের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করেন? ইলিয়াড পাঠে হিন্দুর মনে যে ভাব উদয় হয়, রামায়ণ পাঠে ইংরাজের মনে সেই ভাবই উদয় হয় মাত্র। ভক্ত তুলসীদাসও হিন্দিতে রামায়ণ লেখেন। কিন্তু তিনি রামায়ণের যে সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহার শতাংশের একাংশ কি গ্রিফিথ সাহেবের মনে উদয় হয়? যখন একজন হিন্দু রামায়ণ পাঠে বা শ্রবণে ভাবে গদগদ হইয়া গলদশ্রুলোচনে রোদন করেন, তখনই তিনি রামায়ণের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করেন।

সেইরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদের বেদবেদান্ত পাঠ করেন,

উহাদের বিবিধ টীকা টিপ্পনী দেখেন, ইংরাজিতে উহাদের অনুবাদ করেন এবং উহাদের উপর বিবিধ সমালোচনাও করেন ; কিন্তু তাঁহারা যে উহাদের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করেন, এমন বোধ হয় না। বাইবেল পাঠে একজন খৃষ্টানের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, আমাদের বাইবেল পাঠে সেরূপ কদাচ হইতে পারে না। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী", এ কথার যাঁহারা প্রকৃত মর্ম্মগ্রাহী, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রমর্ম্মগ্রহণে কিরূপ প্রভেদ! যদি শবব্যবচ্ছেদে জীবাত্মার গুণাগুণ অবগত হওয়া যায়, পরধর্ম্মশাস্ত্রপাঠেও উহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল ঐক-দেশিক সিদ্ধান্ত করেন বা অমূলক মতামত প্রকাশ করেন, সে সকল প্রকৃত হিন্দুর নিকট অশ্রোতব্য।

এখন হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাউক। হিন্দুধর্ম্ম জগতের সত্য, সনাতন, প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রকৃতির অকৃত্রিম ধর্ম্ম। খৃষ্ট প্রভৃতি কৃত্রিম ধর্ম্মগুলি সেদিন জগতে উত্থিত এবং লোকবিশেষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ; কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কেহ নাই। এ ধর্ম্ম আবহমানকাল এক স্রোতে প্রবাহিত। কত কালের পর কাল, কত যুগের পর যুগ অতীত, অথচ ইহার স্রোতের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, চিরকালই ইহা সমভাবে চালিত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সৃষ্টির এই চতুর্যুগ ব্যাপিয়া এ সনাতন ধর্ম্ম জগতে বিদ্যমান। যুগযুগান্তরে এ ধর্ম্ম কত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, কত স্তরের পর স্তর, কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত সমাজবিপ্লব অতিক্রম করে ; কিন্তু অদ্যাবধি এ ধর্ম্ম নিজ মূলপ্রকৃতি বজায় রাখিয়া স্বর্গময় ভারতভূমিতে নিজ প্রতাপ ও নিজ মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম। কালে কালে কত নূতন নূতন সংস্কারকবৃন্দ আবির্ভূত হইয়া ইহার সংস্কার করেন ; কিন্তু কেহই ইহার মূলপ্রকৃতি নষ্ট করেন নাই। সকলদেশে লোকবিশেষ কর্ত্তৃক প্রচারিত কৃত্রিম ধর্ম্মগুলি সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম্মকে গ্রাস করে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষে অদ্যাবধি অকৃত্রিম ধর্ম্মের জয় সমস্বরে বিঘোষিত।

পৃথিবীতে মানবধর্ম্মে যতগুলি স্তর বর্ত্তমান, তৎসমুদয়ই একাধারে হিন্দুধর্ম্মে নিহিত। অতি প্রাচীনকালের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বল, আধুনিক

সভ্যযুগের একেশ্বর বাদ বল, মধ্য অর্দ্ধসভ্য যুগের পৌত্তলিকতা বল, অসভ্য যুগের জড়োপাসনা বল, ধর্ম্মের সকল স্তরগুলি একাধারে মিলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাপর্ব্বত নির্ম্মিত। এ ধর্ম্ম সকলপ্রকার মানবের জাতীয় ধর্ম্মের সমষ্টি বা সারসঙ্কলন। যেমন ভূগোলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত-সার (Epetome of the world), সেইরূপ ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্মও পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মের সংক্ষিপ্তসার। চিরকালই হিন্দুর জীবন প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু হওয়ায়, সমাজের অসভ্যাবস্থায় ও অত্যুন্নতাবস্থায় যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব মানব মনে প্রকটিত, সকলই তিনি সাদরে ও সোৎসাহে গ্রহণ করেন এবং সকলেরই সাহায্যে তিনি সাধ্যমত নিজ মনের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিতে প্রয়াস পান। এ ধর্ম্মের মূলদেশ কালক্ষেত্রের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অভিব্যাপ্ত। এ ধর্ম্মের আদ্যগ্রন্থ ঋক্‌বেদ সংহিতা পর্য্যালোচনা করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ জগতের ইতিহাসের এক অনাবিষ্কৃত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

আজকাল মানবসমাজে যে সভ্যতা বর্দ্ধিত, তাহা কৃত্রিম সভ্যতা, তাহা প্রাকৃতিক অবস্থার ব্যভিচার মাত্র। এই কৃত্রিম সভ্যতার নিকট, যাহা কৃত্রিম বা অপ্রাকৃত, তাহারই অধিক সমাদর ও প্রতিপত্তি এবং যাহা অকৃত্রিম ও প্রাকৃত, তাহার তেমনি অনাদর। এ কারণ খৃষ্ট প্রভৃতি কৃত্রিম ধর্ম্মগুলি আজকাল সভ্যজগতে এত আদরণীয় এবং ইহারাই ক্রমশঃ সকল দেশে বিস্তীর্ণ। ইহাদের ভয়ে ও অত্যাচারে অকৃত্রিম ধর্ম্মমাত্রেই শশব্যস্ত ও ত্রস্ত এবং স্বসমাজে নিবদ্ধ থাকিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোককে স্বসমাজভুক্ত করিতে চাহে না; এই প্রকারে ইহার সেবকসংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

কৃত্রিম ধর্ম্মমাত্রের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল একটী মাত্র স্তর বিদ্য-মান। তদীয় প্রবর্ত্তক বা তাঁহার প্রাথমিক শিষ্যমণ্ডলী ইহাকে যেরূপভাবে লোকসমাজে প্রচার করেন, ইহা চিরদিন সেই ভাবে থাকে। ঈশা ও মহম্মদ স্ব স্ব ধর্ম্মকে যেরূপভাবে প্রচার করেন, উহারা এতকাল ঠিক সেই ভাবে আছে। এজন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, যে বিজ্ঞান জগতের ন্যায় ধর্ম্মজগতের উন্নতি নাই। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরব এই

যে, এ ধর্ম্ম মানব মনের ক্রম বিকাশের সঙ্গে ক্রমবিকশিত ; এ ধর্ম্ম সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিষয়ক উন্নতির সঙ্গে, কালক্রমে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরিস্ফূরিত। যে সময়ে বা যে স্থলে মানব মন অবনত, এ ধর্ম্মও তদনুরূপ অবনতভাব ধারণ করে, অথবা যে সময়ে বা যে স্থলে মানব মন অত্যুন্নত, এ ধর্ম্মও তদনুরূপ অত্যুন্নত ভাব প্রদর্শন করে। যে যুগে যেরূপ ধর্ম্মাচরণ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, মনের সাত্ত্বিক ভাবের স্ফূর্ত্তির জন্ত অত্যাবশ্যক, এ ধর্ম্মও সেই যুগে সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ বিধিবদ্ধ করে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে যখন দেবরূপী ও দানবরূপী মনুপুত্রগণের আধ্যাত্মিকতা আধুনিক মানব অপেক্ষা অধিক সমুন্নত ছিল, তখন এ ধর্ম্ম নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা, যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ উপদেশ দেয়। কলিযুগে যখন মানব আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ নির্গুণ পরব্রহ্ম বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং তৎপরিবর্ত্তে নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হন না, তখন এ ধর্ম্ম সাকার দেবদেবীর পূজা বিধিবদ্ধ করিয়া অতি সহজ উপায়ে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সাত্ত্বিকভাবের স্ফূর্ত্তির জন্ত চেষ্টা পায়। অসভ্যাবস্থায় যখন তাঁহার জ্ঞানশক্তি ঈষৎ স্ফূরিত এবং তিনিও জড়জগতের ভয়ে অস্থির, তখন এ ধর্ম্ম প্রকৃতির ভয়াবহ দৃশ্যপটলে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশদর্শনে উহাদের নিকট মস্তক অবনত করিতে শিক্ষা দেয়। সভ্যাবস্থায় যখন তাঁহার জ্ঞানশক্তি সম্যক স্ফূরিত এবং তিনিও জ্ঞানবলে একেশ্বর বুঝিয়া তাঁহাকে নিজ জীবনের আদর্শ করেন ও তাঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস করিয়া এই পাপতাপপূর্ণ সংসারের নানা ঝঞ্ঝাবাত উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখন এ ধর্ম্ম তাঁহাকে হরির মোহন মূর্ত্তি দেখায় এবং তাঁহার প্রতি পরাপ্রেম ও পরাভক্তি উপদেশ দেয়। যে অবস্থায় তিনি পতিত হউন না কেন, এ ধর্ম্ম সকল অবস্থায় তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্ত একান্ত ব্যগ্র।

অন্যান্য ধর্ম্ম ধর্ম্মবিষয়ে এক মহোচ্চ আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকবর্গকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, ইহাতে জনসাধারণ সেই আদর্শমত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হউক বা না হউক, কিন্তু সমাজের কিয়দংশ লোক সেই পূর্ণাদর্শের অনুসরণ করতঃ ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম জনসমাজে যে সকল

ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রচলিত দেখে, তাহাই স্বগ্রন্থে বিধিবদ্ধ করে। যখন বুদ্ধদেব সমাজে অবতার বলিয়া পূজিত, তখন হিন্দুধর্ম্মও স্বগ্রন্থে তাঁহাকে অবতার বলিয়া মান্য করে। সাধারণ সমাজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিষয়ে যেরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ অথবা উহাদের বোধশক্তি যেরূপ, এ ধর্ম্ম চিরকালই তদনুরূপ ক্রিয়া-যোগ প্রবর্ত্তিত করে ও তদনুরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয়। অতএব চিরকালই এ ধর্ম্ম দেশোচিত ও কালোচিত, অথচ ইহা যোগেশ্বরমুখবিনিঃসৃত স্বর্গীয় ধর্ম্মোপদেশে পূর্ণ; যে প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান আজ লোকসমাজে গুপ্ত, তাহাই ইহার আভ্যন্তরে নিহিত।

অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বরকে কেবল নিরাকাররূপে দেখায়; ইহাতে জন সাধারণ অশ্বডিম্ব বা আকাশকুসুমের ন্যায় নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিয়া মনে তাদৃশ তৃপ্তি বোধ করে না এবং উহারা ধর্ম্ম বিষয়ে চিরদিন পশ্চাৎপদ থাকে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন নিরাকারোপসনাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করে এবং সাধকদিগের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য সাকার দেবদেবীর পূজা বিধিবদ্ধ করে।

বিবিধ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, যে অতিপুরাকাল হইতে হিন্দুধর্ম্মরূপ মহানদী দুইটী বিভিন্ন স্রোতে বিভক্ত হইয়া বহমান। প্রথম স্রোতটী ঋকবেদের প্রাচীনতম ভাগের জড়োপাসনায় আরম্ভ করিয়া চতুর্ব্বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া বেদান্তে পরব্রহ্মের নির্গুণোপাসনায় পতিত। কেবলমাত্র পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ-জাতি এই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে অবগাহনসমর্থ।

দ্বিতীয় স্রোতটী যেমন সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ, তেমনি ইহা সকল জাতির নিকট চিরকাল উন্মুক্ত। এই স্রোতটী সেই প্রাচীন কালের জড়োপাসনায় আরম্ভ করিয়া আদি-রামায়ণ, আদি-মহাভারত ও আদি-পুরাণের মধ্য দিয়া আধুনিক রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে মিলিত। কালের গতির সহিত এই স্রোতটীর আয়াতন, প্রসর ও তেজ ক্রমবর্দ্ধিত ও ক্রমবিকশিত। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে লোকের সহজ বিশ্বাসগুলি যেরূপ-ভাবে পরিবর্ত্তিত, সমাজে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি সাধিত, এই স্রোতটীর কলেবর তেমনি কালসহকারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। তাঁহাদের মতে প্রথম স্রোতটী সগুণোপাসনা হইতে

নির্গুণোপাসনায় পরিণত এবং দ্বিতীয় স্রোতটী সগুণে আরম্ভ করিয়া সগুণেরই অনন্তগুণিত। প্রথম স্রোতটীতে বৈদিক তেত্রিশ দেবতা এক ব্রহ্মে পরিণত এবং দ্বিতীয় স্রোতটীতে বৈদিক তেত্রিশ দেবতা পৌরাণিক তেত্রিশ কোটী দেবতায় পরিণত।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দুধর্ম্মকে তৎপূজিত গঙ্গানদীর সহিত তুলনা করা যায়। যেমন গঙ্গানদী গঙ্গোত্রী হইতে নিঃসৃত হইয়া যতই বিভিন্ন দেশ দিয়া বহমান, ততই ইহা সকল দেশের সারবস্তু বিভিন্ন উপনদী দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেহ সম্যক পুষ্ট করত, শত শাখায় বিভক্ত ও পরিশেষে মহাসমুদ্রে পতিত; সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মও সেই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম হইতে উত্থিত হইয়া হিন্দুস্থানের বিভিন্ন দেশজাত সরল বিশ্বাস ও দর্শনাদি শাস্ত্রের নানাসত্য গ্রহণ করতঃ নিজদেহ পুষ্ট করে, পরিশেষে শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া একেশ্বরোপাসনারূপ মহাসমুদ্রে পতিত।

এখন জিজ্ঞাস্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই কি অমোঘ সত্য? আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম কি বৈদিক সময়ের জড়োপাসনায় আরম্ভ করিয়া একদিকে বেদান্তপ্রতিপাদিত পরব্রহ্মের উপাসনায় ও অপরদিকে পৌরাণিক সময়ের অশেষ দোষাকর পৌত্তলিকতায় পরিণত? আমরা কি সেই বৈদিক সময়ের জড়োপাসনা হইতে একবার ক্রমোন্নতিসাধন করতঃ সভ্যদেশোচিত একেশ্বরবাদ প্রাপ্ত হই, আবার সমাজের অবনতিবশতঃ পদস্খলিত হইয়া কি পুনরায় অর্দ্ধসভ্যোচিত জঘন্য পৌত্তলিকতা আশ্রয় করি? হায়! হায়! তবে আমাদের কি হৃদয়বিদারক জাতীয় অধঃপতন! আমরা কি জাতীয় জীবনে ক্ষণকালের জন্য একেশ্বরবাদরূপ সমুজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হই, পরে আবার "যে তিমিরে সেই তিমিরে" পুনরায় পতিত?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা তাঁহাদের কথা আদৌ গ্রাহ্য করিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, তজ্জন্য তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে মহাভ্রমে পতিত। তাঁহাদের মতে এদেশে প্রথম জড়োপাসনা, পরে একেশ্বরবাদ, তৎপরে পৌত্তলিকতা প্রবল। কিন্তু জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মানবসমাজে প্রথম জড়োপাসনা, পরে পৌত্তলিকতা, তৎপরে একেশ্বরবাদ প্রাদুর্ভূত; আর যে জাতি জড়োপাসনা

হইতে উন্নতিলাভ করতঃ একবার পৌত্তলিকতা আশ্রয় করে, সে জাতি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় পতিত হয় না এবং যে জাতি পৌত্তলিকতা হইতে উন্নতিলাভ করতঃ একবার একেশ্বরবাদ অবলম্বন করে, সে জাতি কখন পুনরায় পৌত্তলিকতা গ্রহণ করে না। তবে কেন একমাত্র ভারতবর্ষে উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় ? ইহার কি কোন কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন ? তাঁহারা না হয় বলেন আর্য্য ঋষিগণ জড়জগৎ অন্বেষণ করিতে করিতেই প্রকৃতির ঈশ্বর বুঝিতে পারেন। কিন্তু এ জ্ঞানালোক হিন্দু সমাজে বহুদিন স্থায়ী হয় না এবং জাতীয় অধঃপতন বশতঃ এ জাতি পৌত্তলিকতাই আশ্রয় করে। এজন্ত একেশ্ববাদের পর পৌত্তলিকতা হিন্দুসমাজে প্রাদুর্ভূত।

এস্থলে কয়েকটী প্রশ্ন মনে স্বতঃ উত্থিত হয়। (১) আধুনিক হিন্দুজাতির পৌত্তলিকতা ও পুরাকালীন গ্রীকজাতির পৌত্তলিকতা কি একপ্রকার ? (২) বেদান্তের নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা ও আধুনিক সভ্যযুগের একেশ্বরবাদ কি একপ্রকার ? (৩) বৈদিকধর্ম্ম কি উন্নত জড়োপাসনা ? যৎকালে গ্রীকজাতি পৌত্তলিকতা অবলম্বন করে, তখন তাহারা একেশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই ; কিন্তু আমাদের পৌত্তলিকতার প্রতি অক্ষরে একেশ্বরজ্ঞান দেদীপ্যমান ; ইহাতেই বোধ হয় উভয় জাতির পৌত্তলিকতা কদাচ এক হইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্র ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকে বুঝিতে পারেন, যে বৈদিক সময়ের আর্য্যধর্ম্মের একটী আদ্যন্তর বর্ত্তমান ; এই আভ্যন্তরটী যোগেশ্বর মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রকটিত। ইহাই সেই প্রাচীন কালের অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ দ্বারা নির্গুণ পরব্রহ্মের নির্গুণোপাসনাই ইহার প্রধান অঙ্গ। ইহা সৃষ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম বা উৎকৃষ্ট যুগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ; আর আধুনিক সভ্যযুগের একেশ্বরবাদ বা সগুণ লৌকিক ঈশ্বরের আরাধনা অপকৃষ্ট কলিযুগের অপকৃষ্ট ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এই প্রভেদটুকু পাশ্চাত্য মূর্খদিগের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও সগুণ ঈশ্বরোপাসনাকে তাঁহারা এক ভাবেন। এই মহাভ্রম বশতঃ তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ। আরও এক কথা যদি বৈদিকধর্ম্ম সামান্ত জড়োপাসনা হয়, তবে বেদের আদ্যন্তরে ওঁ তৎসৎ বা পরব্রহ্ম কেন প্রতিভাত হয় ? অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমাদের একান্ত অকর্ত্তব্য।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে হিন্দুধর্ম্মকে তাঁহারা পৌত্তলিকতা বা সামান্য পুতুল পূজা মনে করেন, তাহা কি সত্য সত্যই সামান্য পুতুল পূজা? আমরা কি কেবল কতকগুলি যৎসামান্য পুতুল পূজা করিয়া মনের সকল আকাঙ্ক্ষা মিটাই? হায়! হায়! তবে আমাদের কি দুর্বুদ্ধি! কি শোচনীয় অবস্থা! আর কতকাল আমরা এই জঘন্য ধর্ম্মের মোহে বিমুগ্ধ থাকিব? একবার ভাব দেখি, যে ধর্ম্ম মানবধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা উপদেশ দেয় ও তজ্জন্য যোগাদি উৎকৃষ্ট উপাসনাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করে, সে ধর্ম্ম কেন আজকাল প্রস্তরাদিনির্ম্মিত দেবদেবীর পূজা উপদেশ দেয়? কেন সে ধর্ম্ম আজকাল বালকের হস্তে খেলিবার পুতুলের ন্যায় মৃত্তিকার প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করিতে উপদেশ দেয়? এ স্থলে কেবল যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কালোপযোগী ব্যবস্থা করে। দেখ, এই অপকৃষ্ট কলিযুগে মানবমন কিরূপ অধঃপতিত! ইহার আধ্যাত্মিকতা কিরূপ হ্রাস প্রাপ্ত! এখন মনের তাদৃশ তেজ নাই, শরীরেরও তাদৃশ বল নাই; এখন মানব অল্পায়ু, ক্ষীণবীর্য্য ও শিশ্নোদরপরায়ণ। এখন তিনি পরব্রহ্মের নির্গুণোপাসনা বুঝিতে পারেন না ও যোগাদি অবলম্বন করিতে পারেন না। এখন সগুণ, নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনাও তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার পক্ষে সাকার দেবদেবীর পূজন যেরূপ ফলদায়ক ও সুগম, এমন আর কিছুই নয়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম কালের কঠোর অনুশাসনে অনুশাসিত হইয়া, কালের কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া, মানবমনের প্রকৃতউৎকর্ষ সাধনের জন্য পৌত্তলিকতা— উপদেশ দেয়। অতএব অসার নিরাকারোপাসনা অপেক্ষা সহজ সাকারোপাসনা যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিরাকারবাদীগণ যাহাই ভাবুন না কেন, সাকারোপাসনায় ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন করা যায়, ইহাতে মানবমন যেরূপ প্রকৃত শিক্ষা পায়, যেরূপ উন্নতি লাভ করে, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। অতএব পৌত্তলিকতা ধর্ম্মের আদৌ অবনত ভাব নহে এবং পৌত্তলিকতা উপদেশ দিয়াই হিন্দুধর্ম্ম কলিকালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করে। যাঁহারা পৌরাণিক ধর্ম্মের অনাদর করিয়া কেবল বৈদিক ধর্ম্মের প্রশংসা করেন, তাঁহারাও হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন না।

এখন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আজকাল হিন্দুসমাজে যেরূপ প্রচলিত, তাহাতে ইহাকে সম্যক বিশ্লিষ্ট করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, ইহার দুইটী প্রধান অঙ্গ, একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে, অপরটী সমাজ সম্বন্ধে ; একটী ইহার ধর্ম্মরূপ, অপরটী ইহার সামাজিক রূপ। ধর্ম্ম বিষয়ক মতামতের সমষ্টিই ইহার ধর্ম্মরূপ এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের সমষ্টি ইহার সামাজিক রূপ। অন্যান্য ধর্ম্মের ধর্ম্মরূপ যেরূপ প্রধান, উহাদের সামাজিক রূপ তেমনি অপ্রধান ; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক রূপ যেরূপ প্রধান, ইহার ধর্ম্মরূপ তেমনি অপ্রধান।

ধর্ম্মরূপ সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্ম যোগেশ্বরপ্রকটিত কতকগুলি মৌলিক মতামত প্রকাশ করত ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে মানবমনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী, ইহার বিভিন্ন ভাবানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মার্গ, ভিন্ন ভিন্ন পূজাপদ্ধতি নির্দ্দেশ করে এবং মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মের কয়েকটী মায়ারূপ প্রদর্শন করতঃ তাঁহাকে মায়াময় মানবমনের ভাব্য করে। পরব্রহ্মের বিভিন্ন মায়ামূর্ত্তিবশতঃ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত শৈবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত। ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ সম্বন্ধে, তাঁহার নির্গুণ উপাসনা সম্বন্ধে,পরলোকাদি সম্বন্ধে ঐ সকল সম্প্রদায় প্রায় এক প্রকার মতামত অবলম্বন করিলেও, তাঁহার সগুণ মায়ারূপ সম্বন্ধে, তাঁহার সগুণ পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করে।

ধর্ম্মবিষয়ক মতামত সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্ম স্ব-সেবকমণ্ডলীর ভিতর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। বাল্যকাল হইতে যাঁহার সংস্কার, শিক্ষা ও দীক্ষা যেরূপ, তিনি নিজ মনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ও বিশ্বাসানুযায়ী হিন্দুধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট কোন না কোন মার্গ অবলম্বন করেন, তাহাতে এ ধর্ম্ম কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করে না। এ ধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়ের উপর ইহার সুশীতল ছায়া সমভাবে বিতরণ করে। ইহার সকল মার্গই সমভাবে মানবমনের উন্নতিসাধক ; ইহার সকল মার্গই যথার্থ ভক্তিভাবে অনুসৃত হইলে এক প্রকার সুফল প্রদান করে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। (গীতা)।

"যিনি আমাকে যে ভাবে পাইতে চান, আমি তাঁহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! সকল মানব আমারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে।"

ইহারই জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অন্য কোন ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ বা ঈর্ষা

প্রকাশ করে না, কারণ যে কোন উপায়ে হউক সকল ধর্ম্মই সেই পরমেষ্ঠী পদ প্রাপ্তির অভিলাষী। ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোককে নিজ ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইতে বলে না। ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্ম কস্মিনকালে তরবারি বা বেদহস্তে অন্যদেশে নিজমত প্রচার করিতে যায় নাই।

ধর্ম্মরূপে হিন্দুধর্ম্মের যেমন উদার ভাব, সামাজিক রূপে তেমনি ইহার অনুদার ভাব ও অশেষ কড়াক্রান্তি বিচার। এ বিষয়ে এ ধর্ম্ম কাহাকেও অণুমাত্র স্বাধীনতা প্রদান করে না। যে সকল আচার ব্যবহার সামাজিক নির্ব্বাচনে সমগ্র [illegible] অশেষ মঙ্গলদায়ক ও পরম কল্যাণকর প্রতিপাদিত, অথবা যাহা প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুসামাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। জাতিভেদপ্রথা যাহার উপর হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি প্রোথিত এবং জীবনের বিবাহাদি সংস্কার, যাহা গৃহস্থ মার্গের একান্ত আবশ্যক, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, রাজাধিরাজ, মধ্যস্থ ও পথের কাঙ্গাল, যিনি যে অবস্থাপন্ন হউন না কেন, হিন্দুধর্ম্মের সামাজিকরূপ উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত যাবতীয় সম্প্রদায়, অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও, দেশাচার সম্বন্ধে এক প্রকার মত অবলম্বন করে। কৃত্রিম ধর্ম্মের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য, স্বজাতিকে অন্যান্য জাতি হইতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্য, খড়্গহস্ত হইয়া সামাজিক বিষয়ে এত কঠোর বিধান করিতে বাধ্য। যে জাতিধর্ম্ম প্রাণাপেক্ষা সকলের প্রিয়তর, যে জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য সকলে নিজ প্রাণ অনায়াসে উৎসর্গ করিতে পারেন, সেই জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম্ম সামাজিক বিষয়ে এত কঠোর ভাব ধারণ করিতে বাধ্য। এ বিষয়ে যদি এ ধর্ম্ম কিছুমাত্র উদারভাব প্রদর্শন করিত, তুমি কি আজ সপ্তশতাব্দি পরাধীনতায় থাকিয়া পবিত্র হিন্দুনামের গৌরব করিতে পারিতে? নিশ্চয়ই ভারতে হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইত। তখন কোথায় বা বেদ বেদান্ত! কোথায় বা রামায়ণ ও মহাভারত! সকলই অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইত। অতএব সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হিন্দুধর্ম্ম সামাজিক বিষয়ে এত কঠোর ভাব ধারণ করিতে বাধ্য।

হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে কত মাহাত্ম্য, ইহা এ সংসারে যে কত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা নব যুগের নব্যসম্প্রদায়গণ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যিনি ইহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন বা ইহার যথার্থ মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনিই ইহাতে সম্পূর্ণরূপ মজেন। যথার্থ বলিতে কি, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম, এমন সর্ব্বগ্রাহী, এমন বিশ্বগ্রাহী ধর্ম্ম জগতে আর দ্বিতীয় নাই। আশৈশব আমরা প্রতিদিন সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত দর্শন করি, অথচ উহার প্রকৃত গৌরব বা মাহাত্ম্য আমরা বুঝি না। সেইরূপ বাল্যকাল হইতে আমরা হিন্দুধর্ম্মে লালিত ও পালিত, ইহার দোলদুর্গোৎসবাদিতে চিরদিন আমোদ প্রমোদ করি, সমাজের দেশাচারগুলি কায়মনোবাক্যে পালন করি, অথচ উহাদের প্রকৃত মাহাত্ম্য কি, উহাদের দ্বারা আমরা এ সংসারে কিরূপ উপকৃত, তাহা আমরা একবার বুঝিতে চেষ্টা করি না।

দুরদৃষ্টবশতঃ আমরা এখন বিজাতীয় ধর্ম্মের সংঘর্ষে আনীত, নানা প্রকারে কুদৃষ্টান্তের প্রলোভনে প্রলোভিত এবং আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও নানাদিকে বিপর্য্যস্ত। এখন বিজাতীয় ধর্ম্মের সহিত তুলনা করত নিজ ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিয়া উহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধাবান হওয়া একান্ত আবশ্যক। পক্ষপাতশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত নিজ ধর্ম্মের তুলনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, তোমার হেয়, অপদার্থ, পৌত্তলিক ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা কত উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, উহাদের অপেক্ষা এ ধর্ম্ম জগতে কত শ্রেষ্ঠ! যে ধর্ম্ম পঞ্চদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রবলপ্রতাপান্বিত বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের সহিত মহাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পরিশেষে জয়লাভ করিতে সমর্থ, সে ধর্ম্ম এ সংসারে যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা কি কেহ একবার ভাবেন? যে ধর্ম্ম সপ্ত শতাব্দী পরাধীনতায় থাকিয়াও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ, সে ধর্ম্ম এ জগতে যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা কি কেহ একবার ভাবেন? ইহার ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, ক্রিয়াযোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জীবনের সংস্কারাদি, সমাজের মহোৎসবাদি সকলই এ জগতে অতুলনীয়; সকল বিষয়েই ইহা পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে; ইহাদের দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ কিরূপ

উপকৃত, ইহার কত মঙ্গল সাধিত, কত সাত্ত্বিক ভাব স্ফুরিত, কত আধ্যাত্মিকতা পরিবর্দ্ধিত, তাহা কি কেহ একবার ভাবেন?

আমরা গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে পূজ্য দেবতার সম্মুখে অপার ভক্তির সহিত যেরূপ ভাবে প্রণত হই, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের পরমহংসগণ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ করিয়া নির্গুণ পরব্রহ্মের পরমার্থ জ্ঞান যেরূপ ভাবে অর্জ্জন করিতে চেষ্টা পান, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই পূজার্চ্চনাবিধি, সেই অঙ্গন্যাস জপ প্রাণায়ামাদি, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থূলমায়ারূপকে আমাদের স্থূল মনের ভাব্য করি, যদ্দ্বারা আমরা সেই মায়ারূপের ধ্যান ও ধারণা করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হই, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যদ্দ্বারা আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও মানসিক শিক্ষা হইত, যদ্দ্বারা ভারত পুরাকালে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হইয়া নিজ সভ্যতাজ্যোতি অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে বিকীর্ণ করে এবং তিন সহস্র বৎসর সেই সভ্যতা সগৌরবে রক্ষা করে, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই উপনয়নাদি সংস্কারনিচয়, যদ্দ্বারা আমাদের এই পতিত, অধম মানবজীবন কয়েকবার ধর্ম্মকর্ত্তৃক মন্ত্রপূত ও সংস্কৃত হওয়ায় আমরা যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রস্তুত হই, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই সামাজিক মহোৎসবগুলি, যদ্দ্বারা আমরা এই পাপতাপপূর্ণ ভবসংসারে অপার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মানবজীবনের শোকরাশি ও দুঃখরাশি অনেক সময়ে বিস্মৃত হই, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের বেদান্তে মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট, পুরাণাদি গ্রন্থে মায়াময় মানবমনের ধারণার জন্য তাঁহার যেরূপ মায়াময় রূপ পরিকল্পিত, ভগবদ্গীতায় যেরূপ বিশ্বাশ্চর্য্য, অশেষ উন্নতিসাধক নিষ্কাম ধর্ম্ম উপদিষ্ট, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ, যদ্দ্বারা এই অপকৃষ্ট যুগের স্থূলত্বপ্রাপ্ত মানবমন স্থূলের উপর সূক্ষ্মের প্রকৃত জয়লাভের জন্য, আত্মার অষ্টসিদ্ধিস্ফুরণের জন্য নানা ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করে, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই অশেষ পূজ্য রামাবতার, যদ্দ্বারা আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পরা-

কাষ্ঠা শিক্ষা করিয়া মানবজীবন সুখে অতিবাহিত করি, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? আমাদের সেই আনন্দময় পরব্রহ্মের আনন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণাবতার, যদ্দ্বারা এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে আমরা মনের অশেষ সাত্ত্বিক ভাব স্ফুরণ করত হরি হুরি বলিতে বলিতে আনন্দে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করি, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? হিন্দু-ধর্ম্ম! তুমিই একমাত্র জগতে সত্য, সনাতন ধর্ম্ম! হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে না তোমার অপার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে, তাহার জনম বৃথা! তাহার জীবনে শতধিক্!

মানবধর্ম্মের বিশ্বোদর ভাব সনাতন হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ প্রকটিত ও প্রস্ফুরিত, এমন অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। ইহার মহৎগুণ এই যে, যিনি যেমনটী চাহেন, তিনি ইহাতে তেমনটী পান। পাঠক! তুমি আজ বিংশ শতাব্দীর উন্নত জড়বিজ্ঞানের উচ্চতম শাখায় অধিরূঢ় হইয়া লৌকিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে চাহ না, হিন্দুধর্ম্ম তোমায় সাদরে নিজ অঙ্কদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বলে, "কপিল মুনিও লৌকিক ঈশ্বর মানেন নাই, অথচ এ ধর্ম্মে তাঁহার কত সম্মান দেখ? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেন, 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।' তুমি লৌকিক ঈশ্বর মান, আর নাই মান, তাহাতে আমার কিছু-মাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু হিন্দুনাম বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য, স্বীয় জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য, যে সকল আচার ব্যবহার আবহমানকাল সমাজে চালিত, উহাদিগকে বিশ্বাস কর, বা না কর, নিদেন সমাজের খাতিরে, স্বেচ্ছায় হউক, নাপার্য্যমানে হউক, উহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে হইবে। তাহাতেও যদি তুমি উহাদিগকে পালন না কর, তুমি হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হও।"

পাঠক! তুমি আজ অশেষ পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশারদ হইয়া বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক নিরাকার একেশ্বর মানিতে চাহ, হিন্দুধর্ম্ম তোমায় সাদরে নিজ ক্রোড়দেশে স্থাপনপূর্ব্বক বলে, "আমার বেদান্তে ও উপনিষদে মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপ ও পরমার্থ জ্ঞান নির্ণীত, এমন কোন্ দেশের কোন্ ধর্ম্ম সেরূপ ব্যাখ্যান করিতে সমর্থ? আমার ভগবৎগীতায় ধর্ম্মবিষয়ক যেরূপ স্বর্গীয় উপদেশ প্রদত্ত, এমন কোন্

ধর্ম্ম এ জগতে সেরূপ উপদেশ দিতে সমর্থ? তবে কেন 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্মোভয়াবহঃ' এই গীতোক্ত জলন্ত সত্য বাক্য স্মরণ করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে যাও? তাহাতেও যদি আমার কথায় কর্ণপাত না কর, যাও! স্বচ্ছন্দে যাও! ম্লেচ্ছ ধর্ম্মে গিয়া মিশ্রিত হও ও জাহান্নবে যাও!"

হিন্দুধর্ম্ম সমাজস্থ সকল লোককে আহ্বানপূর্ব্বক সমস্বরে বলে, "ওহে প্রিয় সেবকবৃন্দ! তোমাদের ধর্ম্ম সাধনার জন্য, তোমাদের অবিনশ্বর আত্মার প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য, আমি বিবিধ মার্গ বিবিধ ক্রিয়াযোগ উপদেশ দিয়া থাকি; নিজ শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কারের অভিমত মদ্বিহিত কোন না কোন মার্গ অপার ভক্তির সহিত অনুসরণ কর, ইহাতেই তোমাদের প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হইবে। কিন্তু স্বসমাজকে অন্য সমাজ হইতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্য, স্বীয় জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদাদি প্রথা ও অন্যান্য দেশাচার যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যই দেশাচার সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে কিছুমাত্র স্বাধীনতা প্রদান করি নাই ও এত কড়াক্রান্তি বিচার করিয়া থাকি। যদি যথেচ্ছাচার বশতঃ মদ্বিহিত আচার ব্যবহার মানিতে না চাহ, পবিত্র হিন্দুনামকে, পবিত্র হিন্দুজাতিকে অগাধ জলধিগর্ভে ডুবাইয়া দেও ও সকলকে রসাতলে পাঠাও।"

সেইরূপ অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে সম্বোধনপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম গুরুগাম্ভীর্য্যস্বরে বলে, "দেখ, অন্যান্য ধর্ম্ম কেবল অসার নিরাকারোপাসনা উপদেশ দিয়া তোমাদিগকে সাধন পথে, প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতির পথে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখে। আমি কেবল তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিক প্রকৃত মঙ্গলের জন্য, এই অপকৃষ্ট যুগে স্থূলত্বপ্রাপ্ত, পতিত মানবের উপযোগিতানুসারে সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা বিধিবদ্ধ করি। তোমরা অপার ভক্তির সহিত আমার এই সরল ও সহজ মার্গটী অনুসরণ কর; এক পুরুষে হউক, সাত পুরুষে হউক, ভক্তি প্রেম প্রভৃতি মানবমনের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলন ও স্ফুরণ করত জাতীয় সার্ব্বজনিক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হও। ইহাতেই মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হইবে।" এই প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে যে সকল আদেশ প্রদান করে,

তাহা আমাদের অশেষ মঙ্গলদায়ক ও পরমকল্যাণকর। আমাদের প্রপিতামহগণ এই সকল আদেশ পালন করিয়াই হিন্দুনামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়া যান। কি পরিতাপের বিষয়! আজ কি না আমরা কুশিক্ষা-দোষে স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝি না!

আরও দেখ, হিন্দুর-ধর্ম্মপিপাসা চিরদিন এত অধিক প্রবল, যে তিনি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের ন্যায় ঈশ্বরকে কেবল একভাবে আরাধনা করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন না। মানবহৃদয়ে যতপ্রকার বিভিন্ন ভাব বর্ত্তমান, উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, সকলপ্রকার ভাবযোগে তিনি এ সংসারে কেবল ঈশ্বর অন্বেষণ করেন এবং তাঁহারই শ্রীচরণকমলের অনুগ্রহে নিজহৃদয়ে ঐ সকল ভাব স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পান। হৃদয়স্থ ভাবাবলীর সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট পরব্রহ্মের পূর্ণাবতার। পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকল ধর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা কর, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, হিন্দুধর্ম্মের এই স্বর্গীয় ভাবটী অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না, অন্য কোন ধর্ম্ম এই মহোচ্চ ভাবটী ঘুণাক্ষরে ভাবিতে পারে নাই। অন্যান্য দেশে জনসাধারণ কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া হৃদয়ের ভাবাবলি শিক্ষা বা অনুশীলন করে; উহাতে তাহাদের সম্যক ভাব শিক্ষা হয় না। কিন্তু হিন্দু হৃদয়ের সকল ভাবেই এক-মাত্র ঈশ্বরকে দেখেন ও ভাবেন এবং তাঁহারই অবতার বিশেষের লীলাদি বর্ণন ও শ্রবণ করত সর্ব্ববিধভাবে গদগদ হইয়া আনন্দাশ্রু ও শোকাশ্রু বিস-র্জ্জন করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করেন! যথার্থ বলিতে কি, হিন্দুর মতন প্রকৃত ধর্ম্মময় জীবন এ সংসারে কাহারও ছিল না, চিরদিনই তিনি ধর্ম্মের জন্য পাগল। কিন্তু এখন সমাজের সে ধর্ম্মভাব কোথায়? পাশ্চাত্য স্রোতে সকলই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই যে, তুমি ঈশ্বরকে যে ভাবে ভাবিতে চাহ বা যে ভাবে তাঁহার পূজা করিতে চাহ, সেই ভাবটী তুমি এ ধর্ম্মে ভাল-রূপ দেখিতে পাও। ঈশ্বরকে পিতামাতা ভাবে অপার ভক্তির সহিত পূজা করিতে অভিলাষী হও, ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পরমেশ্বর পরমেশ্বরীরূপে তাঁহার পূজা কর। তাঁহাকে মা! মা! বলিয়া অশেষ ভক্তিভাবে ডাকিতে চাহ, মহিষা-সুরনাশিনী দশভুজা কাত্যায়নী জগদম্বারূপে তাঁহার পূজা কর। তাঁহাকে

অনন্ত প্রেমভাবে দেখিতে চাহ বা তাঁহার প্রতি পরাপ্রেম প্রদর্শনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিতে চাহ, রাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তির উপাসক হও। তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় বাৎসল্যভাবে দেখিয়া হৃদয়ে বাৎসল্যভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তি করিতে চাহ, যশোদার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তির উপাসক হও। বিদ্যোপার্জ্জন, ধনোপার্জ্জন, সিদ্ধিলাভ, সন্তানলাভ প্রভৃতি সাংসারিক ইষ্টলাভের জন্য তাঁহার পূজা করিতে চাহ, তবে স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্ত্তিক রূপে তাঁহার পূজা কর।

এমন কি, যদি কেহ পঞ্চমকার (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন ও মুদ্রা) লইয়া আমোদপ্রমোদ করতঃ নিকৃষ্ট সুখভোগে রত হন এবং সেই সঙ্গে পাপপথে অগ্রসর হন, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত ও প্রিয়-সম্ভাষণ করতঃ উপদেশ দেয়, "বৎস! তুমি কলিযুগের মানব, যুগধর্ম্মে তুমি স্বভাবতঃ শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিকৃষ্ট-সুখভোগে রত; তুমি এখন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সদা ব্যগ্র। অতএব তুমি কি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পাপপথেই অগ্রসর হইবে এবং চিরদিনের জন্য মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইবে? যদি আমি তোমায় উপদেশ দিই, ঐ সকল পাপপথ পরিত্যাগ কর ও ধর্ম্মপথে বিচরণ কর, সে ধর্ম্মোপদেশ তোমার আদৌ ভাল লাগিবে না এবং তুমি পাপপথেই ধাবমান হইবে। যে স্থানে তুমি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতাবশতঃ পাপপথ পরিত্যাগ করিতে পার না, সে স্থানে আমি তোমার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিব, অথচ তোমায় ধর্ম্মপথের পথিক করিয়া দিব। ইহার জন্য শাস্ত্রে বীরাচার উপদিষ্ট। এখন এই মার্গানুসারে কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া মদ্য মাংস ভোজন কর ও স্ত্রী সম্ভোগ কর, তোমার ধর্ম্মসাধন হইবে, অথচ তোমার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও সেই সঙ্গে চরিতার্থ হইবে।"

বল দেখি, যে ধর্ম্ম প্রকাশ্যভাবে সুরাপানাদি পাপকর্ম্মের অনুমোদন করে ও পাপের প্রশ্রয় দেয়, সে ধর্ম্মের মতন বীভৎস ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? কোথায় ধর্ম্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করিবে, না ধর্ম্মই আমাদিগকে অগাধ পাপপঙ্কে নিমগ্ন করায়? এ সকল ভাবিলে কি হিন্দুধর্ম্মের সুখ্যাতি করিতে হয়, না ইহার প্রতি আমা-

দের আন্তরিক শ্রদ্ধা হয়? আবার ভাব দেখি, এই পাপ সংসারে কত অসংখ্য পাপিষ্ঠ নরাধম নিকৃষ্টসুখে রত হইয়া ধর্ম্মের সদুপদেশ অবহেলা করতঃ কিরূপ অধঃপাতে যায়! তাহাদের মঙ্গলের জন্য হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় সর্ব্বগ্রাহী ধর্ম্ম কি কোন সদুপায় করিবে না? তাহারা কি চিরদিন অধর্ম্মপথেই থাকিবে? তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যই পতিতপাবন, অধমতারণ হিন্দুধর্ম্ম বীরাচার উপদেশ দেয়। ইহাই বীরাচারের বাহ্য উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন ইহার ভিতর ধর্ম্মের আরও গূঢ় রহস্য আছে; তাহা এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন অনেকে কুলক্রিয়াদি অনুষ্ঠানগুলিকে বীভৎস ও ন্যক্কারজনক বিবেচনা করিয়া উহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। কিন্তু বল দেখি, বীরাচারাদি চালিত হওয়ায় হিন্দুসমাজে পানদোষাদি প্রবল হয়, না আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে ঐ সকল দোষ সমাজে প্রবল?

যাহা হউক স্বধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য, গৌরব ও মর্য্যাদা বুঝা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিষয়ে ইহার কি মহৎ উদ্দেশ্য, কি গূঢ় রহস্য, তাহা জানিয়া ইহাতে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাবান হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের পূজ্যতম প্রপিতামহগণ আমাদের অশেষ মঙ্গলের জন্য যে সকল বিধান দিয়াছেন, তাহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিও না, তাহাই আমাদের প্রকৃত সুসংস্কার।

"হিন্দুধর্ম্মের তথাকথিত কুসংস্কার।"

কত কালের পর কাল অতীত, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম জগতে প্রাদুর্ভূত! কত যুগের পর যুগ অতীত, এ ধর্ম্ম ভারতে প্রবল! এত কাল কত কোটী কোটী সেবকবৃন্দ ইহার সুশীতল ছায়ামূলে বিশ্রামসুখ সেবন করতঃ মানব জীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করেন! কত লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যাত্মা ও মহাত্মা ইহার ধর্ম্মামৃত পান করতঃ নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করেন! আজ কি না নব্য সম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, হিন্দুধর্ম্ম কেবল কুসংস্কারে পূর্ণ, ইহা সুশিক্ষিত অত্যুন্নত মানবমনের অনুপযুক্ত, ইহা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার শিক্ষা দিয়া লোককে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাঁহারা

ভাবেন, যে ধর্ম্ম নিরাকার ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে কতকগুলি পুতুল পূজা করিতে বলে, সে ধর্ম্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? যে ধর্ম্ম গাভী, বৃক্ষ, নদী, সর্প প্রভৃতিকে পূজা করিতে বলে, সে ধর্ম্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? যে ধর্ম্ম জাতিভেদ মানে, বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার করায় না, মহিলাগণকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখে, সে ধর্ম্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? যে ধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে, মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতে বলে এবং নানাদিকে নানা বিচার আচার করে, সে ধর্ম্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? তাঁহাদের মতে হিন্দুধর্ম্মের সকলই অসার, সকলই কুসংস্কারে পূর্ণ, সকলই জঘন্য ও ঘৃণাস্পদ। তাঁহারা আরও ভাবেন, যে স্বার্থপর পূজারিব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে আমরা এতকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলাম, পরম কারুণিক ব্রিটিশ-সিংহের কল্যাণে আজ তাহাদের ক্ষমতা সমাজে লুপ্তপ্রায় এবং আমরাও কুসংস্কার হইতে উন্মুক্তপ্রায়। এই প্রকারে তাহারা আজকাল গগনভেদিরবে স্বধর্ম্মের কুসংস্কার লইয়া নানা চীৎকার করেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইতে ঐ সকল মহাত্মাদিগের মহাবাক্য বঙ্গীয় সমাজে শ্রবণ করা যায়। তাঁহাদের গুণে আজকাল যাঁহারা দুই পৃষ্ঠা ইংরাজি পাঠ করেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বধর্ম্মের নিন্দা করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, কুসংস্কার কাহাকে বলে? কুশিক্ষা পাইয়া মনে কোন বিষয় লইয়া যে মন্দ সংস্কার বদ্ধমূল হয়, তাহার নাম কুসংস্কার। কুশিক্ষাই কুসংস্কারের মূল। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পান, তাঁহারা বেশ জানেন, যে তাঁহারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন, কারণ এই বিদ্যাবলে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাঁহারা আজকাল আপনাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করেন; আর যাঁহারা প্রাচ্য শিক্ষা পান, তাঁহারাও বেশ জানেন, তাঁহাদের বিদ্যা যদিও তাদৃশ অর্থকরী নয়, ইহাই প্রকৃত বিদ্যা এবং ইহারই গুণে তাঁহারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে সকল লোকেই নিজ বিদ্যা লইয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করেন। এই আত্মশ্লাঘাবশতঃ তাঁহারা নিজ নিজ সংস্কারকে সুসংস্কার ও তদ্ভিন্ন অন্য সংস্কারকে কুসংস্কার জ্ঞান করেন।

একজন কৃতবিদ্য নব্যসম্প্রদায় প্রাচ্য অধ্যাপকের শিক্ষাকে কুশিক্ষা ও তাঁহার সংস্কারকে কুসংস্কার মনে করেন; আর একজন অধ্যাপক নব্য-

সম্প্রদায়ের শিক্ষাকে কুশিক্ষা ও তাঁহাদের সংস্কারকে কুসংস্কার মনে করেন। শিক্ষার তারতম্য বশতঃ উহাদের এত মতভেদ উপস্থিত। একজন পাশ্চাত্য বিদ্যার জ্যোতি পাইয়া হিন্দুধর্ম্মকে অসত্য ও কুসংস্কারপূর্ণ জ্ঞান করেন; আর অপর ব্যক্তি প্রাচ্য বিদ্যার জ্যোতি পাইয়া খৃষ্টধর্ম্মকে অসত্য ম্লেচ্ছধর্ম্ম জ্ঞান করেন। যাহা একজনের নিকট সত্য, তাহা অপরের নিকট অসত্য, যাহা এক জনের নিকট কুসংস্কার, তাহা অপরের নিকট সুসংস্কার। এই প্রকারে হিন্দুর নিকট খৃষ্টধর্ম্ম অসত্য ম্লেচ্ছধর্ম্ম এবং খৃষ্টানের নিকট হিন্দুধর্ম্ম অসত্য ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্ম।

এখন বল দেখি, যে ধর্ম্ম তিন সহস্র বৎসরের উপর জগতে স্থায়ী এবং যে ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি ও আচার ব্যবহার দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ এতকাল সম্যক উপকৃত, যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া হিন্দুজাতি বিগত সাত শত বৎসর পূর্ব্বে অলৌকিক জাতীয় উন্নতি সাধন করতঃ জগতে অপূর্ব্ব সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করে এবং প্রায় সকল বিষয়ে অন্যান্য সভ্যজাতির আদিগুরু হইতে পারে, সে ধর্ম্ম কি কদাচ অসত্য ও কুসংস্কারপূর্ণ হইতে পারে? যদি ইহা অসত্য বলিয়া হিন্দুসমাজের অনুপযুক্ত হইত, ইহা কি কদাচ এতকাল স্থায়ী হইতে পারিত? সমাজবিজ্ঞানের মতে যে ধর্ম্ম বা যে রীতিনীতি সমাজ বিশেষে বহুদিবস স্থায়ী, যদ্দ্বারা উহা অশেষ উপকৃত, তাহাই ঐ সমাজের উপযুক্ত, তাহাই ঐ সমাজে সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাই ঐ সমাজের সুসংস্কার। অতএব লোকে কেন হিন্দুধর্ম্মকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পায়? তাঁহারা বিজাতীয় বিধর্ম্মীদিগের শাস্ত্রপাঠ করিয়াই স্বধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে অপারগ, সুতরাং তাঁহাদের নিকট এখন স্বধর্ম্মের সকলই কুসংস্কার। কিন্তু তাঁহাদের পিতামহগণ কেবল হিন্দুশাস্ত্রালোচনা করতঃ স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান হইয়া যেরূপ মনসুখে দিনযাপন করেন, সে সুখ আর কি তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে? স্বধর্ম্মের উপর বিশ্বাস হারাইয়া এখন তাঁহারা ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্ট।

কৃতবিদ্য পাঠক! তোমার মন আজ পাশ্চাত্য বিদ্যাজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া শারদীয় পৌর্ণমাসীর সুবিমল জ্যোৎস্নায় স্নাত। যদি পল্লীগ্রামস্থ একজন বৃদ্ধ, কথকঠাকুরের প্রমুখাৎ রামায়ণ কথা শ্রবণ করিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন

করে, তুমি তাহার উপর অশেষ দয়া প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়া থাক, যদি এ ব্যক্তি স্বর্গীয় ইংরাজি বিদ্যার কিছুমাত্র আস্বাদ পায়, এ ব্যক্তি কি আজ এরূপ কুসংস্কারজালে জড়িত হইয়া কতকগুলি কাল্পনিক কষ্টরাশি স্বমস্তকে বহন করে? তখন তোমার মনে হয়, হায়! এ সকল কুসংস্কার কবে হিন্দুসমাজ হইতে দূরীভূত হইবে? আর কতদিনে পাশ্চাত্য জ্যোতির সমক্ষে সমাজের এই সকল গাঢ়ান্ধকার বিদূরিত হইবে। কিন্তু বল দেখি, রামায়ণ কথা শ্রবণে ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করাই কি একটা কুসংস্কার? আর অর্থোপার্জ্জনের জন্য সভ্যদেশোচিত শঠতা ও প্রবঞ্চনা অবলম্বন করাই কি প্রকৃত সুসংস্কার?

পাঠক! তোমার বোধ হয়, মদ্যপান-বিষয়ে কোনরূপ কুসংস্কার নাই; তুমি বেশ জান, অতিরিক্ত মদ্যপানে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, অর্থের ক্ষতিব্যতীত অন্য কোন প্রকার ক্ষতি ইহাতে নাই। তুমি হয়ত কোন না কোন দিন বন্ধুবর্গের অনুরোধে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যৎসামান্য পান করিয়া পরমুহূর্ত্তে নিজ মনের দুর্ব্বলতা দর্শনে আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া থাকিবে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের একজন দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান,—যাহার মন একেবারে অমানিশার ন্যায় ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাকে যৎসামান্য মদ্যপান করিতে বল, হয়ত সে ব্যক্তি মদের দোষ গুণ কিছুই জানে না; এই মাত্র জানে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ; তখন প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি সে ব্যক্তি একবিন্দু সুরা অঙ্গুলিতেও স্পর্শ করে না। পাঠক! তুমি কি এ স্থলে স্পষ্ট বুঝিতে পার না, যত বিদ্যার গৌরব, যত জ্ঞানের অহঙ্কার, সব কেবল বালির বাঁধ? এক ঢেউয়ে কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহা দেখিতে পাও না? কিন্তু কুসংস্কারে শিক্ষিত মন পর্ব্বতোপরি-নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় অচল ও অটল; সে মন কি সামান্য অর্থপ্রলোভনে প্রলোভিত হয়? সকলপ্রকার বাধাবিঘ্ন উহার নিকট ভস্মীভূত হইয়া যায়, উহা চিরদিন স্বলক্ষ্যে স্থির থাকে। পাঠক! এখন হিন্দুদিগের কুসংস্কারের যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদ কর এবং যাঁহারা এ সকল প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ভারতের কুলাঙ্গার, তাঁহাদের জন্যই ভারতের এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত!

মনে কর, মধ্যপ্রদেশের একজন মূর্খ [illegible] দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতাদি অতি

ক্রম করিয়া পদব্রজে অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং তথায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জগন্নাথদেবকে মনে মনে বলিল, প্রভো! আজ আপনার শ্রীচরণকমল দর্শন করিয়া আমার মানব জীবন সার্থক হইল। বল দেখি পাঠক! সেই মুহূর্ত্তে তাহার কুসংস্কারাপন্ন, ভক্ত-মনে যেরূপ বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়, তাহা কি তুমি একবার স্বপ্নেও ভাবিতে পার? তুমি হয়ত জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া উহার নির্ম্মাণ-কৌশল ও কারুকার্য্যের প্রশংসা করিবে। জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে বাল্যকাল-দৃষ্ট মাহেশের জগন্নাথের রূপ তোমার স্মরণপথে পতিত হইবে। কিন্তু তীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য কি, কেন লোকে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তথায় আগমন করে, তাহা-তুমি আদৌ বুঝিতে পারিবে না। হয়ত তুমি সেই ব্যক্তির কুসংস্কার দর্শনে মনে মনে হিন্দুধর্ম্মকে শত ধিক্কার দিবে এবং যে স্বর্গীয়বিদ্যা তোমায় ঐ সকল কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়াছে, তাহাকেই শত ধন্যবাদ দিবে। কিন্তু তুমি কি একবার ভাব, সেই বিদ্যা তীর্থভ্রমণজনিত কিরূপ ব্রহ্মানন্দ হইতে তোমার মনকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রাখে? রে পাশ্চাত্য বিদ্যে! আজ সকলে তোমার মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে কিরূপ বিমুগ্ধ! তোমাকে পাইবার জন্য তাহারা আজ কিরূপ উদ্‌গ্রীব ও কিরূপ প্রাণান্তপরিশ্রমশীল! তুমি তাহা-দিগকে অর্থের প্রলোভন, সভ্যতার প্রলোভন দেখাইয়া নিজকুহকে কিরূপ বিমুগ্ধ কর! কিন্তু তুমি আজ সোনার ভারত ছারখার করিতে উদ্যত। আমা-দের জাতীয় হৃদয়মন্দিরে যে সকল দেবমূর্ত্তি এতকাল প্রতিষ্ঠিত, যাহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া আমাদের জীবন এতকাল শান্তিসুখে অতিবাহিত, সেই সকল অশেষপূজ্য দেবমূর্ত্তি তুমি আজ ধীরে ধীরে ভগ্ন করিতেছ এবং তৎপরিবর্ত্তে তুমি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস বা নাস্তিক মত প্রচার করিতেছ, ইহাতেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যাইবার উপক্রম। জনসাধারণের মনে যে সকল পরম কল্যাণকর সুসংস্কার এতকাল বদ্ধমূল, সেই সকল সুসংস্কার তুমি আজ কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছ, ইহাতেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যাইবার উপক্রম। যখন সমাজের অকালকুষ্মাণ্ডেরা স্বধর্ম্মে এত বীতশ্রদ্ধ, তখন জাতীয়ধর্ম্ম রসাতলে যাইবার আর বাকি কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন মার্গ।

এই অপকৃষ্ট কলিযুগে শিশ্নোদরপরায়ণ মানব যাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক হন, যাহাতে তিনি জনসমাজে বসবাস করতঃ অশেষ সুখে সুখী হন, যাহাতে তাঁহার স্থূলদেহনিবদ্ধ জীবাত্মা প্রকৃত সিদ্ধিলাভ ও শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তিন প্রকার সাধনোপায় বা তিনটী মার্গ উপদেশ দেয়, যথা :—

(১) কর্ম্মমার্গ বা ক্রিয়াযোগ।

(২) জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ।

(৩) ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগ।

কর্ম্মমার্গটী চতুর্ব্বেদে ও বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্রে বিশদরূপে ও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে প্রবল; আর তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে প্রবল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত। বিবিধ যাগযজ্ঞ ও জীবনের বিবিধ সংস্কার অনৈতিহাসিক সময়ে আর্য্যসমাজে প্রথম প্রচলিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ইহারা চারি সহস্র বৎসর হইল ভারতে প্রবর্ত্তিত। বোধ হয়, আর্য্যসমাজের বিবিধ অনাটন ও উন্নতির সঙ্গে ইহারা কালবশে উত্থিত। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, যে অশেষপূজ্য, ভীমপরাক্রমশালী আর্য্যজাতি আর্য্যাবর্ত্তে নিজ জয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন ও আর্য্যসভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করেন এবং যাঁহাদের পবিত্র বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত-শোণিত এখনও আমাদের শিরায় শিরায় বহমান, তাঁহারাই বিবিধ যাগযজ্ঞ ও সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। যেমন আমরা তাঁহাদেরই শ্রেষ্ঠবংশে উদ্ভূত, আমরাও সেইরূপ তাঁহাদেরই সংস্কারাদি ক্রিয়াকলাপ বিস্তারিতহৃদয়ে এখনও অনুষ্ঠান করতঃ নিজ জীবন সার্থক করি।

পরে আর্য্যসমাজে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে মহৎ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে, কতকগুলি বৈদিক যাগযজ্ঞ কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়,অপর কতকগুলি সমাজে একেবারে লুপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিমদশায় যখন ভারতের একদিকে পৌরাণিক ধর্ম্ম ও অপরদিকে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবল হয়, তখন বৈদিক যাগযজ্ঞের আরও অধিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; কিন্তু সকল দেশেই জীবনের সংস্কারগুলি বৈদিক নিয়মানুসারে চিরদিন সমভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে হিন্দুসমাজে নানা দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয় এবং বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্র স্ব স্ব পূজ্যদেবতার মাহাত্ম্য, মহিমা ও পূজার্চ্চনা-বিধি সম্যক প্রস্ফুরণ করে। ইহাদের পূজা ও অর্চ্চনা লইয়া যে সকল ক্রিয়া-যোগ সমাজে প্রবর্ত্তিত, তাহা কর্ম্মমার্গের আধুনিক অংশ। এই প্রকারে হিন্দু-ধর্ম্মান্তর্গত কর্ম্মমার্গ কালক্রমে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানমার্গটী বেদের নানাস্থলে প্রক্ষিপ্ত। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। ইহা সর্ব্বপ্রথমে যোগী ও মহর্ষিদিগের সমাধিস্থ আত্মায় প্রতিভাত হয়। কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা সমাজে গোপন করা হয় এবং ইহার ভগ্নাবশেষ আজ কাল বেদান্তে ও উপনিষদে দেখা যায়। ব্রহ্মার অমর পুত্র, সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে কথঞ্চিৎ সত্যের আভাস পাইয়া দার্শনিকগণ অগাধবুদ্ধিবলে নিজ নিজ মত পোষণ ও প্রচার করতঃ জ্ঞানমার্গের পরিবর্দ্ধন করেন। পরিশেষে পৌরাণিকগণ দর্শনশাস্ত্র হইতে জ্ঞানযোগ শিক্ষা করিয়া পুরাণাদি গ্রন্থে কথাচ্ছলে সাধারণ লোককে ইহার উপদেশ দেন। এই প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানমার্গটী সম্যক পরিস্ফুরিত। এই মার্গের পরিবর্ত্তন নাই; ইহা আবহমানকাল এক স্রোতে প্রবাহিত। কত কত যোগেশ্বর মহাত্মা, মহর্ষি ও পরমহংস এই মার্গের পরিপোষণ ও পবিবর্দ্ধন করিয়া যান, তাহার ইয়ত্তা নাই।

হিন্দুধর্ম্মের ভক্তিমার্গটী পুরাণাদি গ্রন্থে সম্যক প্রকটিত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক এবং ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের কালোচিত চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত। যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু নিরাকার ঈশ্বর ভজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন না এবং তাঁহার প্রতি অপার ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন না, তিনি তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অবতারের বিবিধ লীলা শ্রবণ করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হন ও মনের সাত্ত্বিক ভাবের

সম্যক স্ফূর্ত্তি করেন। এই ভক্তিমার্গের অনুশীলন দ্বারাই তাঁহার হৃদয়ের ভাবনিচয় সম্যক স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত। ইহা দ্বারাই তিনি এই অপকৃষ্ট কলিযুগেও ধর্ম্মপথে এত অধিক অগ্রসর। যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত ভক্তিমার্গের পরিপোষণে ও পরিবর্দ্ধনে কত কত ভগবৎভক্ত মহাত্মা আজীবন পরিশ্রম করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং এই মার্গের অনুশীলন দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ কিরূপ উপকৃত, তাহাও এস্থলে বর্ণনাতীত।

মানবমনের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের জন্য উপরোক্ত যে তিনটী মার্গ শাস্ত্রে উপদিষ্ট, ইহারা বিভিন্ন মার্গ বটে, কিন্তু ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানমার্গ বা পরমার্থজ্ঞানলাভই মোক্ষপদপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ, আর কর্ম্মমার্গ ও ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গের সোপানস্বরূপ। ইহাদের চরম ফল সংসারে বৈরাগ্যলাভ ও পরমার্থজ্ঞানলাভ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। (গীতা)

"হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট অখিল কর্ম্ম একমাত্র জ্ঞানে পরিসমাপ্ত।" এখন কত জন্ম জন্মান্তরে কর্ম্মমার্গ ও ভক্তিমার্গের সম্যক অনুসরণ দ্বারা পরমার্থজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা কেহ কি নির্ণয় করিতে পারেন?

হিন্দুধর্ম্মের কি ভক্তিযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি কর্ম্মযোগ, ইহাদের প্রত্যেকটী ধর্ম্মসাধনার পরাকাষ্ঠা ও ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়। বোধশক্তি থাকে, স্বধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনবিধি ভালরূপ বুঝিয়া নিজের বোধশক্তি চরিতার্থ কর; আর বোধশক্তি না থাকে, সকলই ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া মনসুখে উড়াইয়া দেও ও অপকৃষ্ট ম্লেচ্ছধর্ম্মের প্রশংসা কর। হিন্দুর মনের উচ্চাভিলাষ যেমন সর্ব্বোচ্চ, তাহার সাধনবিধিও সেইরূপ এ সংসারে সর্ব্বোচ্চ। যে হিন্দু অন্তে ভগবানের ন্যায় ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইতে চাহেন, তাহার সাধনবিধিও তদনুরূপ; তজ্জন্য তিনি এ সংসারে অপার ভক্তি ও প্রেমবলে ঈশ্বরের তন্ময়ত্ব লাভের প্রত্যাশী। যে হিন্দু অন্তে পূর্ণব্রহ্ম হইয়া নির্ব্বাণ পদলাভের অভিলাষী, সে হিন্দু এ সংসারে পরব্রহ্ম হইবার জন্য কেবল পরমার্থ জ্ঞানের অন্বেষণে একান্ত তৎপর। যে হিন্দু যুগধর্ম্মানুসারে স্থূলত্বপরিবর্দ্ধনবশতঃ

সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগৎ হইতে দূরে প্রক্ষিপ্ত, সে হিন্দু অশেষ সাধনবলে আত্মার আধ্যাত্মিকতার সম্যক স্ফূর্ত্তি করতঃ পরমধাম পাইবার জন্য সদা লালায়িত। যথার্থ বলিতে কি, জগতে এক হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মের সেবক সাধনার এমন পরকাষ্ঠা ভাবিতে পারে নাই।

উপরোক্ত তিনটী শ্রেষ্ঠ সাধনবিধি উপদেশ দেওয়াতে হিন্দুধর্ম্ম এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পক্ষপাতশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে একবার ভাব দেখি, ইহাদের দ্বারা আমাদের কিরূপ উপকার সাধিত, মনের সাত্ত্বিকভাব কিরূপ প্রস্ফুরিত, জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা কিরূপ পরিবর্দ্ধিত, শরীরের স্বাস্থ্য কিরূপ লব্ধ ও সমগ্রসমাজ ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া কিরূপ ধর্ম্মপথে অগ্রসর! খ্রীষ্টধর্ম্ম বল, মুসলমানধর্ম্ম বল, বৌদ্ধধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মই স্বসেবকদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে ও নানা উপদেশ দেয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম সমাজের ধর্ম্মোন্নতির জন্য স্ব-সেবকদিগকে প্রত্যহ দুই তিন বার ঈশ্বরের উপাসনা করায়, সমাজবন্ধনের জন্য সাত দিবস অন্তর সকলকে গির্জ্জায় একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করায় ও ধর্ম্মযাজকমুখে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ায়। মুসলমানধর্ম্ম স্বসেবকদিগকে প্রত্যহ পাঁচবার ঈশ্বরের নামাজ পাঠ করায় ও সমাজবন্ধনের জন্য সময়ে সময়ে সকলকে মসজিদে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করায়। কিন্তু উহাদের সকল চেষ্টাই অনেক সময়ে ব্যর্থ; কারণ মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের ভিতর জনসাধারণ ততদূর ধর্ম্মপরায়ণ নয়। অপরপক্ষে হিন্দুধর্ম্মের গুণে, ইহার ক্রিয়াযোগ ও ভক্তিযোগের গুণে হিন্দুজনসাধারণ কত ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপরায়ণ!

এস্থলে একেশ্বরবাদী নব্যসম্প্রদায় বলেন, যে ধর্ম্ম অসভ্যোচিত দেবদেবীর পূজা উপদেশ দেয়, সে অপকৃষ্ট ধর্ম্মের কেন এরূপ অযথা প্রশংসা কর? দেখ, সভ্যদেশে পাঁচজন সুশিক্ষিতলোক গির্জ্জায় একত্রিত কেমন হইয়া ঈশ্বরারাধনা করেন ও ধর্ম্মযাজকের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করতঃ কেমন আত্মোন্নতি করেন! আর এদেশে কি না একজন মূর্খ পূজারি ব্রাহ্মণ একটা সামান্য প্রস্তরকে অবোধ্যমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করে! এ ব্যক্তি কেবল পেটের দায়ে পূজা করে; মাত্র ইহার দেবভক্তি কোথায়? ইহাকে দেখিয়া কাহার মনে ভক্তি উদয় হয়? এ ধর্ম্মযাজকের নিকট কে কি ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা করে? তবে কেন মুমূর্ষহিন্দু ধর্ম্মের এমন সুখ্যাতি কর?

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মুমূর্ষু হউক বা অধঃপতিত হউক, এখন একবার ভাব দেখি, নিরাকার ঈশ্বরোদ্দেশে কতকগুলি অসার বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক জানু পাতিয়া মস্তক অবনমন করাতেই কি যথার্থ ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শন করা হয়? আর তাঁহার সাকারমূর্ত্তির সমক্ষে গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গেপ্রণত হওয়ায় কি তাঁহার প্রতি কোনরূপ ভক্তিপ্রদর্শন করা হয় না? সামান্য কথায় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান শ্রেয়, না কতকগুলি উৎকৃষ্টদ্রব্যের আয়োজন দ্বারা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান শ্রেয়? যে পূজার বাহ্যাড়ম্বর দেখিলেই ঈশ্বরভক্তি শতধারে উথলিয়া পড়ে, সে পূজা কি সামান্য পূজা? পাদরিসাহেবের প্রমুখাৎ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেই কি মন যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক হয়? আর কথকদিগের প্রমুখাৎ ভগবানের অমৃতময় অবতারলীলা শ্রবণ করিলে কি মানবমন ভক্তি প্রভৃতি রসে আপ্লুত হইয়া ধর্ম্মপথের পথিক হয় না? ধর্ম্মমন্দিরে পাঁচজনে একত্রিত হইয়া ঈশ্বরারাধনা করিলেই কি সমাজ ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হয়? আর বিগ্রহের সম্মুখে পাঁচজনে মিলিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিলে, বা মধ্যে মধ্যে দেবোৎসব করিলে কি সমাজ ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হয় না? আজ যে পূজারিগণ দেখিয়া মনে অভক্তি হয়, তাঁহারা কি সমাজের অকালকুষ্মাণ্ডদিগের অত্যাচারে মূর্খ ও উদরান্নের জন্য লালায়িত নন?

এখন জিজ্ঞাস্য, অন্যান্য ধর্ম্মে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত, হিন্দুধর্ম্ম কেন সেরূপ পদ্ধতি স্বসমাজে প্রবর্ত্তন করে না? সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুধর্ম্ম ভালরূপ অবগত, যে ঐরূপ ঈশ্বরারাধনায় কিছুমাত্র সুফল হয় না, ইহাতে মনের প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা হয় না, ইহাতে তাদৃশ উপকার নাই। সকলেই ত অনুক্ষণ বিপদেও আপদে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ডাকেন। এজন্য নিরাকারোপাসকদিগের উপাসনাপদ্ধতি হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করে। ব্রাহ্মণজাতির সন্ধ্যা ও আহ্নিকের উদ্দেশ্য ও অন্যান্য জাতির মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য কেবল ঈশ্বর ডাকা নয়? উহাদের উদ্দেশ্য আরও সুমহৎ।

অনেকে বলেন, সত্য বটে, হিন্দুধর্ম্ম সমাজস্থ শ্রেষ্ঠজাতির উন্নতির জন্য জ্ঞানমার্গাদি তিনটী শ্রেষ্ঠমার্গের উপদেশ দেয়, কিন্তু ইহা নিকৃষ্টজাতিদিগকে চিরদিন "যে তিমিরে সেই তিমিরে" রাখিয়া দেয়। দেখ, আমাদের ভিতর নিকৃষ্টজাতিবর্গের বেদবেদান্তে কিছুমাত্র অধিকার নাই এবং যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থই

দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় উহারা অন্যান্য জাতির নিকট চিরদিন অবরুদ্ধদ্বার। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্ম স্বসেবকদিগকে জাতিনির্ব্বিশেষে ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার দেয়। মুসলমানদিগের ভিতর যিনি নবাব ও উজীর, আর যিনি পথের ভিখারী, উভয়েই সমভাবে কোরাণ পাঠ করেনও পাঁচবার নামাজ পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে ডাকেন। খৃষ্টানদিগের ভিতর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই বাইবেল পাঠ করেন ও রবিবারে গির্জ্জায় একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন। বৌদ্ধদিগের ভিতরও সেইরূপ শাস্ত্রগ্রন্থে সকলের সমান অধিকার। তবে, যে হিন্দুধর্ম্ম পক্ষপাতদোষে দূষিত হইয়া একমাত্র ব্রাহ্মণজাতির অধিকার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক করে, সে ধর্ম্মের কি প্রকারে সুখ্যাতি করা যায়? দেখ, হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণজাতির পদ-গৌরব কতদূর বর্দ্ধন করে! যিনি রাজাধিরাজ, তিনিও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ভয়ে সদা শশব্যস্ত, তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য সদা ব্যগ্র। রে হিন্দুধর্ম্ম! তোমার এ কি অবিচার! তুমি কেন যোগ্যপাত্রে সম্মান ও আদর প্রদর্শন করাইতে শিখাও নাই? কেন তুমি এমন অযোগ্যপাত্রে এতদূর সম্মান দেখাইতে উপদেশ দেও?

এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। মানবসমাজের গঠনপদ্ধতি এইরূপ, যে ইহাতে একদল শাসন করে ও অপরদল শাসিত হয়। রাজ্যস্থাপনে বা রাজ্যশাসনে যেরূপ, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে বা ধর্ম্মরাজ্যশাসনেও তদনুরূপ। যিনি রাজ্যের অধীশ্বর, তিনি ইহার হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা, তিনি আধিভৌতিক বিষয়ের একমাত্র সম্পূর্ণ মালিক এবং তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্ম-চারিগণ তাঁহারই অল্লাধিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সমগ্ররাজ্য শাসন করে। সেইরূপ যিনি ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর, তিনি ইহার আধ্যাত্মিক বিষয়ে পূর্ণক্ষমতা-পন্ন। পূর্ব্বে মুসলমান জগতে খালিফা ও খৃষ্ট জগতে পোপের ক্ষমতা এইরূপ ছিল। যে দেশে রাজতন্ত্র ধর্ম্মতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন, সে দেশে রাজাই ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর; আর যে দেশে ধর্ম্মতন্ত্র রাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা-পন্ন, সে দেশে ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বরই সকল রাজন্যবর্গের উপর একাধিপত্য করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ্যশাসনে কেবল এক ব্রাহ্মণজাতির প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বর্দ্ধন করে এবং কোন লো[illegible] ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর করে

না, যদিও স্থল বিশেষে ইহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন সম্প্রদায়বিশেষ মঠাধিপতি মোহন্তকে ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর নিযুক্ত করে। যে হিন্দুধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা পূর্ণ-মাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য সমাজস্থ প্রত্যেক জাতির জাতীয় ব্যবসায় নির্দ্ধারিত করে, সে ধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্যই ব্রাহ্মণজাতিকে ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যান্য জাতির অধিনায়ক নিযুক্ত করে। যে সমাজে ক্ষত্রিয়জাতি রাজ্যশাসনে ও রাজ্যরক্ষণে নিযুক্ত এবং অপরাপর জাতি সমাজের অনাটন-পূরণার্থ বিবিধকর্ম্মে ব্যাপৃত, সে সমাজে সকল জাতিদিগকে ধর্ম্মপথে চালনা করিবার জন্য এক শ্রেষ্ঠ, শিক্ষিত জাতির আবশ্যক। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে ব্রাহ্মণজাতিকে অধিনায়ক করে এবং সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্যই এ জাতিকে সমাজের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করে। যেমন মস্তিষ্ক দেহের রাজা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উহার দাস; সেইরূপ ব্রাহ্মণজাতিই আধ্যাত্মিক বিষয়ে হিন্দুসমাজের অধিপতি এবং তাঁহাদেরই উপদেশ পালনীয়। যখন এ প্রথা এতকাল লোকপরম্পরায় চালিত, তখন ইহা হিন্দুসমাজে সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাদের অধিনায়কত্ব একপ্রকার প্রকৃতি-সিদ্ধ বলা উচিত। অতএব ব্রাহ্মণজাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমাজের অধিনায়ক করাতে হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপ পক্ষপাতদোষে দূষিত হয় নাই, কেবল সমাজের মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ বিধান করিতে বাধ্য।

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মমার্গে ও ভক্তিমার্গে সমাজস্থ সকল জাতির সমান অধিকার। কেবল ব্রাহ্মণজাতি ঐ সকল বিষয়ে অন্যান্য জাতির অধিনায়ক। যাগযজ্ঞ, পূজা মহোৎসবাদি, জীবনের সংস্কারাদি যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মে সকল জাতির সমান অধিকার; কেবল ব্রাহ্মণজাতি ঐ সকল বিষয়ে উহাদের চালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তাঁহারা ঐ সকল সম্পাদন করাইয়া উহাদের পুণ্যবর্দ্ধন ও সুখ বর্দ্ধন করান।

যে ব্রাহ্মণজাতি এতকাল ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুসমাজের অধিনায়ক, তাঁহারা শমদমাদি অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কিরূপ আদর্শপুরুষ করিতেন, প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান দিয়া হিন্দুসমাজকে কিরূপ সাত্ত্বিকভাবে শাসন করিতেন এবং যে সকল অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া সমাজ, শরীর মন ও জীবাত্মার

অশেষ মঙ্গলদায়ক, সেই সকল ক্রিয়া সম্যক নির্দ্দেশ করতঃ হিন্দুসমাজের কত উপকার সাধন করিতেন! হায়! তাঁহাদের সে দিন এখন কোথায়! আপনাদের দোষে, সমাজের দোষে! তাঁহারা এখন কিরূপ অবনত!

কর্ম্মমার্গ।

হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মমার্গ ভালরূপ বুঝা অত্যাবশ্যক। ইহাতেই ইহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষরূপ উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ ইহার কি কি অঙ্গ, তাহা নির্দ্দেশ করা যাউক, যথা ঃ—

(১) যোগসাধন ও তপশ্চরণ	কর্ম্মমার্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ
(২) আধুনিক পূজা পদ্ধতি (জপ, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস প্রভৃতি)	যোগের প্রথম সোপান, এখন উহার অপভ্রংশ মাত্র।
(৩) উপবাসাদি ব্রতপালন	তপস্যার প্রথম সোপান, এখন উহার অপভ্রংশ মাত্র।
(৪) বৈদিক যাগ যজ্ঞ তান্ত্রিক দেবোৎসব, দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ পর্ব্ব, বিবাহাদি সংস্কার, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।	কর্ম্মমার্গান্তর্গত সামাজিক ধর্ম্মের অঙ্গ।

(কর্ম্মমার্গের সামাজিক অংশ তৃতীয়ভাগে বর্ণিত।)

প্রথমে যে যোগ ও তপস্যা কর্ম্মমার্গের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, উহাদের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য; তজ্জন্য জীবাত্মা ও মনের প্রকৃত অবস্থা উল্লেখ করা আবশ্যক। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের সার্ব্বজনিক নিয়মানুসারে

সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মজগৎ যেরূপ স্থূলজগতে পরিণত, আমরাও সেইরূপ সূক্ষ্মরূপধারী দেব হইতে স্থূল, চর্ম্মাবৃত মানবে অধোগত এবং সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত শক্তির আধার জীবাত্মাও সেইরূপ স্থূলদেহে নিবদ্ধ হইয়া ইহার স্বাভাবিক জ্ঞান ও শক্তি হইতে বঞ্চিত। স্থূলত্বপরিবর্দ্ধনের সঙ্গে জগতে এক দিকে আধ্যাত্মিকতার অবনতি ও অপরদিকে আধিভৌতিকতার উন্নতি দেখা যায়। এই আধিভৌতিক উন্নতি লাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞানশক্তি মনে ক্রমবিকশিত ও জ্ঞানলাভের দ্বারস্বরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ও ক্রমস্ফুরিত এবং অযোনিসম্ভব মানবও কালক্রমে যোনিসম্ভব হন। এই প্রকারে জগতে স্থূলত্বপরিবর্দ্ধনের সঙ্গে মানবের প্রকৃত অধঃপতন হয় ও অশেষপাপতাপ সংসারে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টধর্ম্মে সয়তানের প্রলোভনে নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদনে আদি-মানব আদামের যে পতন উল্লিখিত, তাহাতেও উপরোক্ত মানবজাতির পতন ও জীবাত্মার অবনতি জানায়। এ কথা অলীক উপকথা নয়, কিন্তু ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জ্বলন্ত সত্য। বাইবেলে রূপকভাবে এ কথা লিখিত এবং হিন্দুশাস্ত্রেও অনেক স্থলে ইহা উল্লেখিত।

শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বে দেবাসুরগণ, পরে মহর্ষিগণ, তৎপরে মানবগণ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ করেন। যাঁহাদের শরীরে যেরূপ স্থূলত্বের বিকাশ হয়, তাঁহারা যোগবলে ও তপশ্চরণ দ্বারা শরীর ও মনের সেই স্থূলত্ব নাশ করতঃ আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও অনন্ত শক্তির স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পান। প্রথম জীবপ্রবাহে সুমেরু পৃথিবীতে স্বায়ম্ভব মনুপুত্রগণ বা দেবগণ সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট; তাঁহারা যোগবলে সকল অবগত হন। পঞ্চম জীবপ্রবাহে আধুনিক পৃথিবীতে বা জম্বুদ্বীপে বৈবস্বত মনুপুত্রগণ স্থূলশরীরবিশিষ্ট; এখন স্থূলত্বের পূর্ণবিকাশবশতঃ যোগবল দ্বারা শরীর ও মনের স্থূলত্ব নাশ করতঃ আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও অষ্টসিদ্ধিস্ফুরণ করা অতীব দুঃসাধ্য। কিন্তু মধ্যজীবপ্রবাহে যখন শরীরে স্থূল সূক্ষ্মের ন্যূনাধিক্য বর্ত্তমান, তখন মনুপুত্রগণ অর্থাৎ তদানীন্তন পৃথিবীর অধিবাসিগণ বা দৈত্যাসুরগণ যোগবলে ও তপশ্চরণ দ্বারা আত্মার অনন্তশক্তি স্ফুরণ করেন। অতএব যে যোগভ্যাস ও তপশ্চরণ দ্বারা শরীর ও মনের স্থূলত্ব নাশ করতঃ আত্মার অনন্তশক্তি স্ফুরণ করা যায়, তাহা চিরদিন হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্মমার্গের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। মধ্যে মধ্যে বা প্রত্যহ মনপ্রাণ

ভরিয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেই প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হয় না বা আত্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফুরিত হয় না; তজ্জন্য অশেষ সাধনার প্রয়োজন ও অশেষ ক্রিয়াযোগ আবশ্যক। এই সকল ক্রিয়াযোগের সমষ্টিই যথার্থ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ।

যুগধর্ম্মানুসারে শরীর ও মনের যে স্থূলত্ব এখন সম্যক পরিবর্দ্ধিত, সেই স্থূলত্বের বিনাশ সাধন করতঃ আত্মার অনন্ত শক্তির স্ফুরণ করা সামান্য কথা নহে। ইহার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নানা দুঃসাধ্য সাধন শিক্ষা দেয়। রাজযোগ বল, হট্টযোগ বল, তপস্যা বল, সকলই আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণের জন্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট। এখন এই অপকৃষ্ট কলিযুগে শিশ্নোদরপরায়ণ মানব সহজে সেই সকল দুঃসাধ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারে না। তজ্জন্য হিন্দুধর্ম্ম যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান জপপ্রাণায়ামাদি ও তপস্যার প্রথম সোপান উপবাসাদি দেবারাধনায় উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়। বহুদিন ধরিয়া এই সকল উত্তমরূপ অভ্যাস করিতে করিতে মন কথঞ্চিৎ একাগ্রতা লাভ করে ও যথার্থ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। এখন ভাব দেখি, যোগাভ্যাসও তপশ্চরণের সমক্ষে একেশ্বরবাদিদিগের নিরাকারোপাসনা কিরূপ অসার ও অপদার্থ! যাঁহারা ভাবেন, একবার ঈশ্বরকে ডাকিয়া স্বর্গে যাইবেন, তাঁহারা কিরূপ ভ্রান্ত! যে ধর্ম্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতি পাইয়া এমন স্বর্গীয় ও সর্ব্বোচ্চ ক্রিয়াযোগ উপদেশ দেয়, সে ধর্ম্ম কি কাহাকেও নিরাকারোপাসনারূপ অসার পথ দেখাইতে পারে? সে ধর্ম্ম নিদেনপক্ষে সকলকে সেই ক্রিয়াযোগের প্রথম সোপানই শিক্ষা দিতে বাধ্য। ইহার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আধুনিক সভ্যযুগের নিরাকারোপাসনাকে চিরদিন ঘৃণা চক্ষে অবলোকন করে ও জপপ্রাণায়াম শিক্ষা দেয়।

এখন ইহ সংসারে মনের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ, তাহা বর্ণন করা যাউক। মানবমন অবিনশ্বর জীবাত্মার আজ্ঞাবহ দাস; একদিকে ইহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে স্বপ্রভুর জন্য মায়াময় জগতের মায়াজ্ঞান সঞ্চয় করে, অপরদিকে ইহা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়যোগে স্বপ্রভুর আজ্ঞাপালন করে। দেহ ধারণ করিয়া কেহ ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না।

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ,
> কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। (গীতা)

"কেহ ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রকৃতির ত্রিগুণ বশতঃ সকলে অবশ হইয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য।"

এক সুষুপ্তির অবস্থা ব্যতীত সকল সময়ে সকলে কর্ম্ম করিতে বাধ্য। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সকলে অনুক্ষণ নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত এবং নিষ্কর্ম্মাবস্থায়ও তাহাদের মন নানা চিন্তায় চিন্তিত। অতএব মানবমন সদাই চঞ্চল ও অস্থির।

মন যেমন সদা চঞ্চল, ইহার দ্বার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণও তেমনি সদা প্রবল। সংসারের ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, যে বিষয়ের যত চালনা করা যায়, সে বিষয়টী ক্রমশঃ তত প্রবল হয়। এ কলিযুগে আধিভৌতিক জ্ঞানলাভ দ্বারা আধিভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য ইন্দ্রিয়গণ সম্যক স্ফুরিত। ইহারা যেমন প্রবল, ইহাদের বিষয়ও তেমনি অনায়াসলভ্য। বিষয়গুলি মায়াময় জগতের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং ইহাদের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি সদা অশেষ প্রলোভনে প্রলুব্ধ। মানসপক্ষী সেই সঙ্গে ভোগবিলাসে রত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান এবং জীবাত্মাও সেই সঙ্গে এই মায়াময় সংসারের দ্বন্দ্বজ সুখদুঃখে ক্রমশঃ জড়ীভূত হইয়া কর্ম্মবন্ধনসূত্রে আরও জড়িত। কর্ম্মবন্ধনসূত্রে ইহা যত জড়িত, তত ইহা পুনঃ পুনঃ জন্ম লইতে ও কর্ম্মভোগ করিতে বাধ্য।

এখন জীবাত্মার কর্ম্মবন্ধনসূত্র ছিন্ন হইয়া কি প্রকারে ইহার জন্মপরিগ্রহবাসনা মন্দীভূত হয়? মনের যে স্বাভাবিক চঞ্চলতা দ্বারা জীবাত্মা সদা বিপথে চালিত, সেই চঞ্চলতা নিবারণ করতঃ মনকে একাগ্র করিতে পারিলে জীবাত্মার পরমলাভ; কারণ এই প্রকারেই ইহার কর্ম্মবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়। মনের একাগ্রতালাভের অর্থ কি? যেমন পাঠক গ্রন্থবিশেষ আয়ত্ত করিবার জন্য প্রগাঢ় মনঃসংযোগপূর্ব্বক উহাতে নিজ মনকে একাগ্র করেন, সেইরূপ যিনি সংসারের অন্যান্য বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ একমাত্র ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক তন্ময়ত্ব লাভ করেন, অথবা যোগবলে নিজ আত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করেন, তিনিই মনের একাগ্রতা লাভ করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, মনের একাগ্রতা লাভ হইলে, কি প্রকারে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়? কর্ম্মে আসক্তিই কর্ম্মবন্ধনের মূল। সর্ব্ববিধ কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া মনে প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধন ক্রমশঃ মন্দীভূত

হয়। মনের একাগ্রতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ইহাতেই কর্ম্মবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়। কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইলে জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয় না সত্য, কিন্তু ইহাতে কি জীবাত্মা শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হয়? তবে কি প্রকারে ইহা ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠপদ পাইতে পারে, বা যে অধ্যাত্মজগৎ হইতে ইহা পতিত, সেই ধামে পুনরায় ইহা কি প্রকারে যাইতে পারে? শরীরের স্থূলত্ব নাশ করতঃ আত্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফূর্ত্তি করিতে পারিলে, ইহা ক্রমশঃ উচ্চ পদবীতে আরোহণ করে ও পরে দেবত্বে পরিণত হয়। ইহার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন কর্ম্মমার্গ দ্বারা চারিটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চেষ্টা পায়, যথা :—

(১) জীবাত্মার কর্ম্মবন্ধনছেদন।

(২) জীবাত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি।

(৩) মনের একাগ্রতা লাভ।

(৪) মন ও শরীরের স্থূলত্ব নাশ।

মানবমনের একাগ্রতা লাভের জন্য হিন্দুধর্ম্ম সাকার দেব দেবীর পূজা বিধিবদ্ধ করে। নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিতে গেলে, তুমি আধারশূন্য ও অবলম্বনশূন্য হইয়া, বায়ুবেগে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায়, সদা বিঘূর্ণিত হও, তজ্জন্য এ ধর্ম্ম হরির মোহনমূর্ত্তি বা জগদম্বার দালানভরা প্রতিমা তোমার চঞ্চল মনের সমক্ষে ধারণ করে, যাহাতে তুমি অতি সহজে সেই রূপের ধ্যান ও ধারণা করিয়া নিজ মনের স্থৈর্য্য ও একাগ্রতা লাভ করিতে পার। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ ধর্ম্ম আরও জপ ও প্রাণায়াম শিক্ষা দেয়। জাগ্রত অবস্থায় অনুক্ষণ বা অবকাশমত হরিনাম জপ বা ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে চঞ্চল মন সদা ঐ দিকে স্থিরীকৃত থাকে এবং যে শ্বাসপ্রশ্বাস আমাদের অগোচরে সদা চালিত, প্রাণায়াম দ্বারা উহাদিগকে স্বায়ত্ত করিবার জন্য মন ঐ দিকে স্থিরীকৃত করিলে, ইহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা নিবারণ করা যায়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম দেবারাধনায় প্রথম জপ ও প্রাণায়াম ভালরূপ শিক্ষা দেয়।

এখন মন ও শরীরের যে স্থূলত্ব আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তির প্রধান প্রত্যবায়, সে স্থূলত্ব কি প্রকারে নাশ করা যায়? যে ইন্দ্রিয়গণ উহাদের দ্বারস্বরূপ, তাহাদিগকে সম্যক সংযত করিতে পারিলে, এমন কি তাহাদের

প্রকৃত লয় সাধন করিতে পারিলে মন ও শরীরের স্থূলত্ব নাশ করা যায়। দেখ, মন পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জগতে, প্রকটিত; তন্মধ্যে যখন ইহার একটি ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়, তখন অপর চারিটি প্রবল হইয়া নষ্ট ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করে। সেইরূপ যখন মনের বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের নাশ সাধন করা যায়, তখন ইহার আভ্যন্তরিণ পঞ্চেন্দ্রিয় প্রবল হয়, ইহার স্থূলত্ব ও জড়ত্ব দূরীভূত হয় এবং জীবাত্মার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব বিকাশ পায়। যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিনাশসাধন করা যায় ও আত্মার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা স্ফুরণ করা যায়, তাহাদের নাম প্রকৃত যোগসাধন।

দেহ থাকিতে বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের লয় সাধন করা সহজ কথা নয়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই যে, দর্শনেন্দ্রিয় লয়প্রাপ্ত হয়, এমন নহে। ইহা অনেক সাধন-সাপেক্ষ। যে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইলে দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যে ক্রিয়াটি এখন কাহারও স্বায়ত্ত নয়, যাহা দিবানিশি সকলের অজ্ঞাতসারে সদা সমভাবে চালিত, সেই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রোধ করিতে করিতে স্বায়ত্ত করিলে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা যায়, এমন কি ইহাদের বিনাশসাধন করিয়া দেহের স্থূলত্ব এক প্রকার নাশ করা যায়। জীবজগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভেক, সর্প ও অন্যান্য সরীসৃপজাতি শীতকালে শ্বাস-রোধ করিয়া ৩।৪ মাস আহারাদি না করিয়া জীবন ধারণ করে। তৎকালে উহাদের দেহে প্রাণটি বর্ত্তমান থাকে মাত্র; কিন্তু দেহের যাবতীয় জৈবনিক ক্রিয়া একরূপ স্থগিত থাকে। শ্বাসরোধ হওয়াতে বা শ্বাস অত্যল্প মাত্রায় চালিত হওয়ায় জৈবনিক ক্রিয়া প্রায় স্থগিত। তৎকালে শ্বাসক্রিয়াটি জীবের স্বায়ত্ত থাকে, এজন্য প্রাণায়াম বা শ্বাসপ্রশ্বাসকে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত করাই যোগসাধনের প্রথম সোপান।

কেহ কেহ বলেন, ভেক প্রভৃতি জাতিদিগের ঐরূপ ব্যবহার দেখিয়া পুরাকালীন মহর্ষিগণ নিজের ভ্রান্তিবশতঃ শ্বাসরোধ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম করিতে শিক্ষা করেন। কিন্তু শ্বাসরোধ করিয়া একচল্লিশ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকা ও যোগসাধন দ্বারা আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ করা, এ সকল অলীক উপকথা নয়; ইহাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যে যোগক্রিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর জগতে প্রচলিত ছিল, সেই ক্রিয়াটি প্রকৃতি এখন শীতলশোণিত-

বিশিষ্ট সরীসৃপ জীবগণের চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছে, সে জন্য শীতকালে উহারা নৈসর্গিক সংস্কারবশত এক প্রকার যোগসাধন করিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইন্দ্রিয়সংযমদ্বারা মনের একাগ্রতা স্থাপন করাই মানব-জীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাতেই জীবনের প্রধান শ্রেয়োলাভ, ইহাতেই জীবাত্মার অক্ষয় পুণ্যলাভ। এ বিষয়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে সকল ক্রিয়া-যোগ উপদেশ দেয়, তাহা ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়, তাহা অপকৃষ্ট খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে না। রাজযোগ বল, হট্‌যোগ বল, তপস্যা বল, পুরাকালীন আর্য্যজীবনের শেষোক্ত দুইটি আশ্রম বল, ঈশ্বরের সাকারমূর্ত্তি-পূজন বল, আধুনিক পূজাপদ্ধতি বল, উপবাসাদি ব্রতপালন বল, সকলই এ ধর্ম্ম কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা নিবারণ পূর্ব্বক জীবাত্মার জন্মপরিগ্রহবাসনা ক্রমশঃ মন্দীভূত করিবার জন্য ও উহার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তির জন্য উপদেশ দেয়। ইহার জন্য এ ধর্ম্ম চিরদিন আধুনিক একেশ্বরবাদিদিগের নিরাকারোপাসনাকে অসার বলিয়া অবজ্ঞা করে। এখন বল দেখি, স্বধর্ম্মের কর্ম্মমার্গের সহিত তুলনা করিলে আধুনিক সভ্যদেশের নিরাকারোপাসনা কি অসার নয়, বা অপকৃষ্টযুগের অপকৃষ্ট ধর্ম্ম নয়? পাশ্চাত্য গুরুগণের নিকট যাহাই শিক্ষা কর না কেন, ইহা প্রকৃতই অসার ও অপদার্থ; ইহাতে মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয় না।

আরও দেখ, মানবমন চিরদিনই অভ্যাসের দাস। ইহাকে যে বিষয়ে অধিক দিন অভ্যস্ত করাইবে, সেই বিষয়টি ইহা আনন্দের সহিত, প্রীতির সহিত সম্পাদন করে। তোমার মন কাব্যশাস্ত্রপাঠে অভ্যস্ত, কাব্য-রসাস্বাদন ব্যতীত তোমার উদরান্ন জীর্ণ হয় না। যে কর্ম্ম যত দুষ্কর, অভ্যাস বশতঃ সে কর্ম্ম তত সুকর। যে কর্ম্ম যত ক্লেশকর, অভ্যাস বশতঃ সে কর্ম্ম তত সুকর। সন্ধ্যা, আহ্নিক ও তর্পণ, যাহা ব্রাহ্মণদিগের দৈনন্দিন কর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট, ইষ্টমন্ত্রজপ ও জপমালা লইয়া হরিনামজপ, এ সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? বৃথা কালক্ষেপের জন্য কি ইহারা বৃথা উপদিষ্ট? ইহারা কি স্বধর্ম্মের কুসংস্কার? যদি কুসংস্কারই না হইবে, তবে কেন তুমি আজ এ সকল ত্যাগ করিয়া ভগীরথের ন্যায় সপ্তপুরুষ উদ্ধার করিয়াছ বলিয়া এত আস্ফালন করিবে?

ওহে নবযুগের নব্যসম্প্রদায়গণ! তোমরা কি একবার সন্ধ্যা, আহ্নিক ও হরিনামজপের উদ্দেশ্যটুকু বুঝিতে চেষ্টা পাইবে? না ইহাদিগকে স্বধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া চিরদিন উড়াইয়া দিবে? দেখ, এই অপকৃষ্ট কলি-যুগে অল্পায়ু, ক্ষীণবীর্য্য ও শিশ্নোদরপরায়ণ মানব যোগাভ্যাস ও তপস্যাদি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গগুলি অবলম্বন করিতে পারেন না। এজন্য হিন্দুধর্ম্মও যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া ঐ সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথম সোপান জপ প্রাণায়ামাদি উত্তম-রূপ শিক্ষা দেয়। এখন ঐ সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আজীবন অনুষ্ঠিত হওয়ায়, অভ্যাসবশতঃ মানবমন সাধনপথে কতদূর অগ্রসর হয় ও ইহার একাগ্রতা কতদূর লাভ হয়, তাহা কি কেহ একবার ভাবিতে চেষ্টা করেন? মনে কর, শাস্ত্র যে উপদেশ দেয়, আজীবন জপমালা লইয়া হরিনাম জপ করিলে, অন্তিমকালে হরিনামবলে মোক্ষপদ পাওয়া যায়, মনে কর, শাস্ত্রের এ উপদেশ সর্ব্বৈব অলীক, তথাচ হরিনাম জপ করিয়া মন ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ করে ও অনন্তসাধনপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়, এ কথাও কি তোমাদের বিশ্বাসযোগ্য হয় না? যদি না হয়, তবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা শ্রবণ কর। চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া রীতিমত সংযত হইলে, শরীরের অযথা ক্ষয় নিবারিত হয়, আয়ুবল বর্দ্ধিত হয় এবং অনেক সময়ে উৎকট রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অতএব যে জপ ও প্রাণায়াম দ্বারা আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া রীতিমত সংযত, তাহা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের কত মহোপকারক! পুরাকালে যোগিগণ যে দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেন, তাহা এ বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, সেই সকল ক্রিয়াযোগের প্রথম সোপান অবলম্বন করিলে, যদি তোমরা ষাটি বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ুলাভ করিতে পার, তাহাও কি তোমাদের পরমলাভ নহে? মনে কর, মনের একাগ্রতালাভ ধর্ম্মের ভ্রান্তি, তথাচ যদি তোমরা ঐ সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদ্বারা কিঞ্চিৎ পরমায়ু বর্দ্ধন করিতে পার, বা কোন উৎকট পীড়া হইতে অব্যাহতি পাও, তাহাও কি তোমাদের পরমলাভ নহে? তবে কেন তোমরা নিজ বুদ্ধিদোষে ঐ সকল পরম কল্যাণকর ক্রিয়াগুলি ত্যাগ করতঃ

দিনে দিনে অল্পায়ু হইতেছে? জপ প্রাণায়াম করা তোমাদের যতই কেন ক্লেশকর হউক না, অভ্যাসবশতঃ স্বল্পদিনে উহারা সহজ ও সুখকর হইবে। তখন তোমরা ভালরূপ বুঝিতে পারিবে, সংসারের অশেষ জ্বালা ও যন্ত্রণার মধ্যে ঐ সকল ধর্ম্মাচরণ করাতে তোমরা কিরূপ সুখী হও ও কিরূপ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও?

সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি অশেষযন্ত্রণাদায়ক শারীরিক ক্রিয়াকে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গস্বরূপ তপ-সাধন নামে উপদেশ দেয়। সকলেই বলেন, ধর্ম্ম মনের বিশ্বাসমাত্র; শরীরকে অশেষ যন্ত্রণা ও ক্লেশ দিয়া জীর্ণ ও শীর্ণ করিলে কিরূপ ধর্ম্মসাধন হয়? ইহার জন্য কি মহাত্মা বুদ্ধদেব তপস্বিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সামাজিক ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া জগৎ বিখ্যাত হন নাই? দেখ, ধর্ম্ম মানবের সুখের জন্য রচিত, এখন যদি সে ধর্ম্ম নিজের ভ্রমবশতঃ অশেষ যন্ত্রণা দেয়, তাহার উপর কি প্রকারে লোকের আস্থা বর্দ্ধিত হইতে পারে? অসহ্য গ্রীষ্মে কোথায় খস্‌খসের টাট্টি ও টানা পাখা, না কোথায় পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থিতি? দুরন্ত শীতে কোথায় হর্ম্ম্যমধ্যে কম্বললেপাদি ব্যবহার, না কোথায় আকণ্ঠ জলাশয়বাস? ওহে প্রপিতামহ মহর্ষিগণ! তোমরা কেন এমন নিষ্ঠুর বিধান করিয়া গিয়াছ, যাহা ভাবিলেও এখন আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? তোমরা ধর্ম্মকে কেন এমন কঠোর ও সুদুর্লভ করিয়া গিয়াছ?

স্থূলের উপর সূক্ষ্মের প্রকৃত জয়লাভের জন্য, বর্দ্ধিষ্ণু আধিভৌতিকতার পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিকতার স্ফূর্ত্তির জন্য, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ঐ সকল কঠোর বিধান করিয়া মানবের স্থূলদেহকে এত ক্লিষ্ট করিতে উপদেশ দেয়। স্থূলদেহকে এইরূপে কষ্ট দিয়া জীর্ণ ও শীর্ণ না করিলে, স্থূলদেহ-নিবদ্ধ সূক্ষ্ম আত্মার স্ফূর্ত্তি কিরূপে হয়? স্থূলদেহের স্থূলত্ব ও জড়ত্বনাশ করিলে, আত্মার অনন্তশক্তি বিকশিত হয়। অতএব জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতার স্ফূর্ত্তির জন্যই হিন্দুধর্ম্মে তপস্যাদি লোমহর্ষণ ব্যাপার উপদিষ্ট।

হিন্দুধর্ম্মের এইটি মহৎ গুণ, যাহা আত্মা, মন, শরীর ও সমাজের অশেষ কল্যাণকর, সে বিষয়ে এ ধর্ম্ম চূড়ান্ত উপদেশ দেয় এবং অন্যান্য ধর্ম্ম স্বপ্নেরও ততদূর ভাবিতে পারে না। দেখ, সতীত্বধর্ম্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলদায়ক, সতীত্বধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্য কোন্ ধর্ম্ম সতীদাহরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার উপদেশ দেয়?

যাহা হউক. তপস্যাদি অপকৃষ্ট কলিযুগের ধর্ম্ম নয়; হিন্দুধর্ম্মও এখন উহাদের পরিবর্ত্তে শারীরিক, মানসিক ও বাঙ্ময় তপ নামক তিনপ্রকার তপ উপদেশ দেয় এবং উপবাসাদি ব্রত পালন বিধিবদ্ধ করে। গীতায় লিখিত—

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।
মনঃপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ
ভাবশুদ্ধিরিত্যেত্তপো মানসমুচ্যতে।

"দেবগণ, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞলোকের পূজন, সরলতা, বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধি, ব্রহ্মচর্য্যা ও অহিংসা এ গুলি এখন শারীরিক তপ। সত্য, প্রিয় ও হিতকথা বলা, মর্ম্মভেদী কথা না বলা, পাঠাভ্যাস এগুলি এখন বাঙ্‌ময় তপ। মনের আত্মপ্রসাদলাভ, অক্রূরতা, মৌনাবলম্বন, ইন্দ্রিয়সংযম, মানসিকভাবের বিশুদ্ধতা এ গুলি এখন মানসিক তপ।" অতএব গীতার উপদেশানুসারে পুরাকালীন তপশ্চর্য্যার পরিবর্ত্তে উপরোক্ত ত্রিবিধ তপসাধন করিয়া তোমরা এখন ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হও। আরও দেখ, অন্নগতপ্রাণ মানব পুরাকালের ন্যায় তপ-স্যার জন্য মাসাবধি উপবাস করিতে পারেন না। হিন্দুধর্ম্মও এখন তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে এক একবার উপবাস করাইয়া তাঁহার ধর্ম্মসাধন করায়। ওহে আয়াসপ্রিয়, ভোগবিলাসী বঙ্গবাসিগণ! এখন অনভ্যাসবশতঃ ঐ সকল উপ-বাসও তোমাদের দুর্ব্বহভার ও অশেষ ক্লেশকর। তোমরা কি বুঝিতে পার, ঐ সকল ত্যাগ করায় তোমরা এখন দিনে দিনে কত অসহিষ্ণু ও অল্পায়ু হইতেছ?

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত, যুগধর্ম্মানুসারে মানব এখন অধঃপতিত। এখন সেই অধঃপতিত মানবের উদ্ধারের প্রকৃত উপায় কি? যে সনাতনধর্ম্ম যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া প্রচলিত, সে ধর্ম্ম কি একটা সামান্য মানবকে ক্রুসে বিদ্ধ করাইয়া তাঁহার শোণিতপাত করতঃ তোমার উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া তোমার সম্মুখে ধরিতে পারে? যে সনাতন ধর্ম্ম আবহমানকাল যোগেশ্বরগণকর্ত্তৃক অনুশীলিত ও পরিবর্দ্ধিত, সে ধর্ম্ম কি তোমায় মধ্যে মধ্যে এক একবার ঈশ্বরের নাম করাইয়া ধর্ম্মের একটা অসার পথ দেখাইতে পারে? এস্থলে সেই শ্রেষ্ঠ

ধর্ম্ম তোমায় যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক করিবার জন্য, তোমার আধ্যাত্মিকতার স্ফূর্ত্তির জন্য তোমার জীবনের যাবতীয় কর্ম্মের উপর স্বীয় স্নিগ্ধ অনুশাসন চিরদিন সমভাবে চালায় এবং শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে তোমায় ধর্ম্মপথে চালায়। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম ধর্ম্মভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় মনে যে কতদূর বিমল আনন্দ উদয় হয়, এই দুঃখের জীবন কতদূর ধর্ম্মময় ও শান্তিময় হয় এবং তুমিও ধর্ম্মপথে, আধ্যাত্মিকপথে, কতদূর অগ্রসর হও, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার ? যদি তুমি এ সকল বুঝিতে, তুমি কি আজ এ সকল ত্যাগ করতঃ পৈতা পোড়াইয়া ব্রহ্মচারী হইতে ?

জ্ঞানমার্গ।

যেরূপ ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ করাতে মানবজীবনের শ্রেয়োলাভ করা যায়, সেইরূপ আবার পরব্রহ্ম ও জীবাত্মা সম্বন্ধে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিবিধ জ্ঞানানুশীলন দ্বারা সংসারে প্রকৃত বৈরাগ্যাবলম্বন করাতেও ততোধিক শ্রেয়োলাভ করা যায়।

লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তাময়ানঘ
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। (গীতা)

"হে অনঘ! আমি তোমায় পূর্ব্বে উপদেশ দিয়াছি, এ সংসারে দুই প্রকারে শ্রেয়োলাভ করা যায়। প্রকৃত জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগ অনুশীলন করিয়া এক প্রকার সিদ্ধিলাভ করেন, আর একনিষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমিগণ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া অন্য প্রকার সিদ্ধিলাভ করেন।" বস্তুতঃ পৌরাণিক ভক্তিযোগ প্রকটিত হইবার পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে কেবল কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ অনুশীলিত হইত; তন্মধ্যে জ্ঞানমার্গটি সাধু সন্ন্যাসী ও জ্ঞানিদিগের জন্য বিহিত, আর কর্ম্মমার্গটি সাধারণ গৃহস্থাশ্রমিদিগের জন্য বিহিত।

পরব্রহ্ম মায়াতীত ও গুণাতীত, তিনি মায়ামুগ্ধ মানবমনের কদাচ ভাব্য-নন। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা এ সংসারে অতীব দুঃসাধ্য। আমাদের জীবাত্মা মায়ায় মুগ্ধ ও সংসারের মায়াজনিত মিথ্যা জ্ঞান লইয়া সদা বিব্রত; ইহা জগতের ও পদার্থের বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু

যে ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান মহাত্মাগণদ্বারা পূর্ব্বে অনুশীলিত ও এখন সমাজে গুপ্ত, যাহার মহাসত্যগুলি সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি নানা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত, সেই মহাবিদ্যার মহাসত্য পাইবার জন্য দিবারাত্র বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করিলে তত্ত্বজ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করা যায়। এই প্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলন করিতে করিতে ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। ইহাই হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত জ্ঞানমার্গে সম্যক প্রদর্শিত।

এখন "ব্রহ্মজ্ঞান" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? অনেকেই জানেন, মানবরচিত-শাস্ত্রবিশেষ আয়ত্ত করা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান অতি সহজ ও অনায়াসলভ্য। আমরা ত বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করি, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, তিনি আমাদের পিতা স্বরূপ ও আমরা তাঁহার পুত্রস্বরূপ, তিনি জগতে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তিনি অন্তর্যামী ও তিনিই আমাদের একমাত্র সুখদুঃখের নিয়ন্তা। ইহাতেও যদি তোমার মনে ঈশ্বরজ্ঞান ভালরূপ উপলব্ধি না হয়, সাতদিন অন্তর একবার গির্জ্জায় বা সমাজে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত কর, ব্রহ্মজ্ঞান তোমার মনে স্বতঃ প্রকটিত হইবে। এখন তুমি আরও জান, কতকগুলি বেদান্তোল্লিখিত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই, ব্রহ্মজ্ঞানে তোমার মন উদ্ভাসিত হয়, যথা :—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।"

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।"

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।" ইত্যাদি

তুমি আরও বলিয়া থাক, আজকাল ব্রহ্মদর্শন অতীব সহজ। অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য নিমীলিতাক্ষ হইয়া ঈশ্বরকে এক প্রাণে, এক মনে ও এক ধ্যানে ডাকিলে, তিনি তোমার হৃদয়ে জ্যোতিস্বরূপ প্রকাশ পান এবং তুমিও সেই ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া অপার ব্রহ্মানন্দে অভিষিক্ত হও। এইরূপে আজকাল অনেকে ব্রহ্মদর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

মায়াতীত পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যদি তোমার এইরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তুমি ত প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী নও, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের ক, খ, গ বুঝিতে পার নাই, তুমি একজন প্রকৃত ব্রহ্মদ্রোহী। এস্থলে তুমি নিজের বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অবমাননা কর মাত্র। তুমি কি জান না, দেহধারী মানব এ মায়াময় জগতে, এ কলিযুগে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না? যদি একদিনে বা এক মুহূর্ত্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, অনন্তকাল ব্যাপিয়া জীবাত্মা কোন্ জ্ঞান লাভ করে, বল? বিশ্ব ব্রহ্মময় বা ব্রহ্ম বিশ্বময়, এ কথা জানাতেই তুমি ব্রহ্মের কি জান, বল? সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম মায়াযোগে এই বিশ্ব প্রপঞ্চে পরিণত, এ কথা জানাতেই তুমি ব্রহ্মের কি জান, বল? তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম এবং সকলেই ব্রহ্ম, এ কথা বলাতেই তুমি ব্রহ্মের কি জান, বল? ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, এরূপ ভাবাতেই বা তুমি ব্রহ্মের কি জান, বল? মায়াময় অসম্পূর্ণ মানবমনের কতকগুলি অসম্পূর্ণ গুণাবলি পরব্রহ্মে আরোপিত করিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বর নাম প্রদান পূর্ব্বক অসীম ও সগুণ ভাবাতেই তুমি ব্রহ্মের কি জান, বল? তুমি কি বুঝিতে পার না, তোমার মায়াময় মনের প্রকৃত্যনুযায়ী ঈশ্বর গঠিত করিয়া তুমি নিজ হৃদয়ে স্থাপন কর মাত্র? তুমি যেমন করিয়া ভাব না কেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে তুমি যে তিমিরে, চিরদিন সেই তিমিরে থাক।

আর যিনি প্রকৃত মহাত্মা, যিনি মায়াময় সংসার হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া পরমহংসমার্গ প্রাপ্ত হন এবং নিয়মসংযমাদি সাধনোপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বহুকাল যোগাভ্যাস করিতে করিতে স্থূলদেহের স্থূলত্ব ও জড়দেহের জড়ত্ব-নাশকরতঃ সমাধিস্থ হন ও চব্বিশ তত্ত্বের সহিত নিজ মনকে মূলপ্রকৃতিতে লীন করেন, তিনি স্বীয় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পান। এ সংসারে তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু যদি তিনি এতদূর উৎকর্ষলাভ করতঃ স্পর্দ্ধার সহিত আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অনন্ত নরকে পতিত হন; এক কথায় তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যে ব্রহ্মজ্ঞান স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শত বৎসর তপ করিয়াও প্রাপ্ত হন নাই, সেই ব্রহ্মজ্ঞান কলিযুগের যে অধমাধম মানব লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহার পক্ষে নরকবাসই শ্রেয়ঃ।

যেমন অধ্যাত্মবিজ্ঞান সকল বিদ্যার সার, ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমার্থজ্ঞানও সেইরূপ যাবতীয় জ্ঞানের সার। এই পরমার্থ জ্ঞানলাভেই অবিনশ্বর জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি। কতকাল ব্যাপিয়া অসাধারণ সাধনাবলে জীবাত্মা

এই পরমার্থজ্ঞান লাভ করে, তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন ? যখন জীবাত্মা জন্মজন্মান্তর বাদ, কল্প কল্পান্তর বাদ ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্নরূপ মায়াজ্ঞান লাভ করিতে করিতে ক্রমোন্নত হয় এবং আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তিবশতঃ পরব্রহ্মের সন্নিকটস্থ হয়, তখনই ইহা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।

স্থূলসূক্ষ্ম বা দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় জগৎ কি প্রকারে উদ্ভূত, যাবতীয় ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাবলিদ্বারা উহারা কি প্রকারে চালিত, উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য কি প্রকার, উহাদের অধিবাসিগণ কিরূপ, যে কর্ম্মফল দ্বারা তাঁহারা সকলে চালিত, উহার নিয়মাবলি কি প্রকার, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় জানিতে পারিলে পরমার্থজ্ঞান লাভ করা যায়। এই পরমার্থজ্ঞান লাভে জীবাত্মার অনন্তকাল ব্যয়িত। এখন ভাব দেখি, এই পরমার্থজ্ঞানের সমক্ষে পার্থিব জ্ঞান কিরূপ অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ! যাঁহারা অসাধারণ সাধনবলে যোগসিদ্ধ হন, তাঁহারাই এ সংসারে পরমার্থজ্ঞানের আভাস পান।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে,
তৎ স্বয়ং যোগসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। (গীতা) •

"পরমার্থজ্ঞানের ন্যায় এমন পবিত্র বস্তু ইহসংসারে আর দ্বিতীয় নাই। যিনি বহুকালে যোগসিদ্ধ হন, তিনিই নিজ আত্মায় এই পরমার্থজ্ঞান লাভ করেন।"

ইহ সংসারে পরমার্থজ্ঞান লাভ করা যায় না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পরমার্থজ্ঞানানুশীলনের উপায় ও ফলকে প্রকৃত জ্ঞান বলেন, যথা :—

অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনং।
আসক্তি রনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোৎপত্তিষু।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতি জনসংসদি।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।

"মানাপমান জ্ঞান না থাকা, দম্ভশূন্য হওয়া, কোন জীবজন্তুর হিংসা না করা, সদা ক্ষমাশীল হওয়া, সদা সরলচিত্ত হওয়া, কায়মনোবাক্যে আচার্য্যের সেবা করা, বাহ্যাভ্যন্তর বিশুদ্ধ হওয়া, ধৈর্য্যবান হওয়া, ইন্দ্রিয়গুলির প্রকৃত সংযম করা, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করা, অহঙ্কারশূন্য হওয়া, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে যে সকল দুঃখ উৎপন্ন, তাহাতে কোনরূপ দোষ না দেখা, (অর্থাৎ সে সকল অম্লানবদনে সহ্য করা,) স্ত্রীপুত্র গৃহ প্রভৃতি সাংসারিক বস্তুতে আসক্তিশূন্য হওয়া এবং উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করা, ইষ্ট হউক বা অনিষ্ট হউক সকল অবস্থায় সমভাবে থাকা, অনন্যা ও অচলাভক্তির সহিত আমার উপাসনা করা, নির্জ্জন স্থানে বসবাস করা, লোকের সভায় যাইতে অনিচ্ছুক হওয়া, পরমার্থজ্ঞান পাইবার জন্য সদা নানা উপায় অবলম্বন করা এবং যতটুকু পরমার্থজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হওয়া— এই সকলই প্রকৃতজ্ঞান এবং এতদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু বর্ত্তমান, তৎসমুদায় অজ্ঞান।" যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে যে সকল অমৃতময় সত্য বিনিঃসৃত, উহাদের তাৎপর্য্য বুঝা সকলের কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরমার্থজ্ঞান লাভের জন্য হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত জ্ঞানমার্গ অনুশীলন করেন, তাঁহারা উপরোক্ত উপায়গুলি ও সদনুষ্ঠানগুলি সর্ব্বান্তঃকরণে অবলম্বন করেন এবং এই মার্গ বহুদিবস অনুসরণ করিতে করিতে উপরোক্ত বিবিধ সুফলও তাঁহাদের জীবনে স্বতঃ প্রকাশিত হয়।

হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানমার্গ ধর্ম্মসাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্গ। মহর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ ও অন্যান্য মহাত্মাগণ সকলেই এই জ্ঞানমার্গের অনুশীলন করতঃ নিজ জীবন পবিত্র করেন ও আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হন। উপরে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা লিখিত হইল, সে সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন করিলেই মানব প্রকৃতই ইহসংসারে দেবতা হন। তাঁহাদেরই জীবন সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। আমাদের ভিতর একজন পরমযোগী পরমহংস, যিনি আজীবন জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করতঃ নিজ জীবন পবিত্র করেন এবং যোগবলে সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হন, তাঁহার সহিত কি খৃষ্টানদিগের একজন ধর্ম্মাত্মা পাদরীপুঙ্গবের তুলনা হইতে পারে? সত্য বটে, সেই পরমহংস জনসাধারণের নিকট উন্মত্তপ্রায় বলিয়া বোধ হন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শত কহিনুর প্রজ্জ্বলিত এবং উহাদের প্রভা তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া বহির্গত।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতিভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।

(গীতা)

"যে বিষয়ে সকলে নিদ্রিত, সে বিষয়ে যোগী জাগ্রত এবং যাহাতে সকলে জাগ্রত, তাহাতে তত্ত্বদর্শী যোগী নিদ্রিত।" ইহারই জন্য তিনি সকলের নিকট এখন পাগল; কিন্তু তিনি স্বর্গরাজ্যে মহোচ্চ আসন অধিকার করেন।

পুরাকালে আর্য্যসমাজে জ্ঞানমার্গের অনুশীলন দ্বারা জীবাত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তির জন্য বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম উপদিষ্ট। যৌবনকাল গৃহস্থাশ্রমে অতিবাহন করিয়া জীবনের অন্তিমভাগ পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ক্ষেপণ করায়, জীবাত্মার যে কত উপকার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। তৎপরে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে হিন্দুসমাজে সন্ন্যাসিকুল প্রবর্ত্তিত হইলে পর, সাধুসন্ন্যাসিগণ আজীবন জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করেন এবং এ মার্গের সম্যক উন্নতি সাধন করিয়া যান।

জ্ঞানমার্গের অনুশীলন দ্বারা পরমার্থজ্ঞান ক্রমশঃ লাভ করা যায় এবং এই পরামার্থজ্ঞানবলে ব্রহ্মজ্ঞানও হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। কিন্তু ইহা অনেক সাধনসাপেক্ষ।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ
তেষামাদিত্যবদ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং। (গীতা)

"যাঁহাদের আত্মার মায়াজন্য অজ্ঞানতা পরমার্থ-জ্ঞানলাভ দ্বারা দূরীভূত, তাঁহাদের নিকট পরমাত্মা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত।" কিন্তু কত জন্মবাদ এরূপ জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে?

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। (গীতা)

"অনেক জন্মের পর মানব প্রকৃতজ্ঞানলাভ করতঃ আমাকে প্রাপ্ত হন।"

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। (গীতা)

"সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান হন এবং সহস্র সহস্র সিদ্ধলোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার যথার্থ তত্ত্ব অবগত

হইয়া আমাকে জানিতে পারেন।" ইহাতেই বুঝা উচিত, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা কিরূপ অসাধ্য?

মোক্ষলাভই পরমার্থজ্ঞানের চরম ফল।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জন
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। (গীতা)

"যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ পরমার্থ জ্ঞানরূপ মহাগ্নি জীবাত্মার অখিল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়।"

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, জীবাত্মার অখিল কর্ম্মফল নষ্ট হয়, ইহাকে পুনরায় কোন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, ইহা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের ন্যায় অনন্ত ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিরাজমান হয়। এমন কত জন্মজন্মান্তরবাদ ও কিরূপ সাধনবলে জীবাত্মার পরমার্থজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন না। এ সংসারে পরমার্থজ্ঞান-লাভ দুঃসাধ্য বলিয়া কি আমরা এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব? তাহাতে কি জীবাত্মার অধোগতি হইবে না? অতএব সাধনবলে আমরা এখন পরমার্থ-জ্ঞানের যতটুকু লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত; তাহাই আমাদের পরমলাভ এবং তাহাই আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করিবে। পুণ্যবলে আমরা যে মানবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, এস তাহারই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতঃ আমরা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হই।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাই জ্ঞানমার্গ চিরদিন হিন্দুসমাজে অনুশীলিত। যাঁহারা ঘোর সাংসারিক, তাঁহাদের জন্য এ মার্গ উপদিষ্ট হয় নাই। পূর্ব্বে জনকাদি রাজর্ষিগণ সংসারাশ্রমে থাকিয়াও জ্ঞানমার্গের সম্যক অনুসরণ করেন এবং ইহাতেই শ্রেয়োলাভ করেন। কিন্তু তুমি, আমি এখন কলিযুগের মানব, সংসারজালে একান্ত জড়িত ও মোহান্ধ; এখন আমরা যোগবলে নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অতএব আইস, আমরা পরব্রহ্মের কোন মায়ারূপ ধ্যান করিয়া মনের একাগ্রতালাভে যত্নবান হই, কোন সহজ ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করতঃ ক্রমশঃ জ্ঞানমার্গের দিকে অগ্রসর হই। এখন কলিযুগে ইহাতেই আমাদের যথার্থ শ্রেয়োলাভ।

এখন যে পরমার্থজ্ঞান ধর্ম্মজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া পূজিত, যাহার

আভাস পাইবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম নানা অসাধ্য সাধনবিধি উপদেশ দেয়, সেই পরমার্থজ্ঞানের উপর আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান বিদ্রূপ করিয়া বলে "রে অবোধ! কেন তুমি অর্দ্ধোন্মত্ত, বিকৃতমস্তিষ্ক, ধর্ম্মধ্বজিগণের প্রলাপবাক্যে কর্ণপাত কর? তুমি কি বুঝিতে পার নাই, সমাজের এই সকল অপোগণ্ডক-গণ এতকাল নিজ বুদ্ধির দোষে কল্পনা বলে একটি অপরূপ জ্ঞানব্যূহ রচনা করতঃ আপনাদিগকে উহাতে জড়ীভূত করে? কেন তুমি উহাদের স্তোক-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া চাক্ষুষ জ্ঞান উপেক্ষা করতঃ কতকগুলি কাল্পনিক জ্ঞানে বিভোর ও উন্মত্ত হও? কোথায় বা তোমার পরব্রহ্ম! কোথায় বা তোমার আত্মা! কোথায় বা তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি! এ সকল কেবল ভ্রান্ত ধর্ম্মের প্রলাপ! চক্ষু নিমীলিত করিলে, সবই অন্ধকার! তবে কেন ঐ সকল ছাই ভস্ম জানিতে তুমি এত ব্যগ্র? অহহ! তোমার কি দুর্ব্বুদ্ধি! কি বুদ্ধিভ্রংশ! আমি যে এতকাল এমন সমুজ্জ্বল আলোক জগতে বিতরণ করিতেছি, সে আলোক হইতে তুমি কি এখনও বঞ্চিত? বিংশ শতাব্দীর এমন অত্যুজ্জ্বল আলোকের মধ্যেও লোকে এখনও ধর্ম্মের ঐ সকল প্রলাপবাক্যে বিশ্বাস করে?" "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!" এখন তুমি তোমার প্রকৃত শ্রেয়ঃ বুঝিতে চেষ্টা কর। কোম্‌ত, মিল, স্পেন্সার, ডারউইন, হাক্‌স্লী, ফ্যারেডে প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাগণের প্রতিমূর্ত্তি আমার যশোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁহারা আজ জ্ঞান-জগতে ষোড়শোপচারে পূজিত, তাঁহাদেরই উপদেশ শ্রবণ কর, তুমি ইহ-সংসারে প্রকৃত শ্রেয়োলাভ করিবে ও জ্ঞানবলে পরমেষ্ঠীপদ প্রাপ্ত হইবে। এখন বিজ্ঞানের কথা বিজ্ঞানের নিকট থাক্। উহাতে আমাদের কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই।

ভক্তিমার্গ।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত, পুরাকালে হিন্দুধর্ম্মে কেবল কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ উপদিষ্ট; পরিশেষে ইহার ভক্তিমার্গটী রামানুজপ্রমুখসংস্কারক বৃন্দদ্বারা পূর্ণ-ভাবে প্রকটিত। এই মার্গ উপদেশ দিয়া হিন্দুধর্ম্ম আজকাল সাধারণ মানব-মনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করে। এই কলিযুগের মানবকে

যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক করিবার জন্য, তাঁহার অশেষ সাত্ত্বিকভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য, এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মার্গ শাস্ত্রে উপদিষ্ট এবং যাবতীয় পুরাণ ও উপ-পুরাণে ইহা পূর্ণভাবে বিকশিত।

ভক্তিমার্গ উপদেশ দেওয়াতে হিন্দুধর্ম্ম পার্থিব হইলেও সংসারে স্বর্গীয় ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট হইলেও এখন ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের চূড়ান্ত সময়। ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনবিধি। এমন সুগম ও সহজ আরাধনাপদ্ধতি কোন ধর্ম্ম কোন কালে ভাবিতে পারে নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকলধর্ম্ম পর্য্যালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে, ধর্ম্মের এমন সুমনোহর দৃশ্য, এমন সহজ সাধনবিধি কোথাও তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। কলিযুগের শিশ্নোদর-পরায়ণ মানবকে যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ভক্তিমার্গ যেমন সুকর, এমন আর কিছুই নয়। এই অশেষপাপতাপপূর্ণ সংসারে তাঁহাকে যথার্থ ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল করিবার জন্য ভক্তিমার্গ যেমন সুকর, এমন আর কিছুই নয়। সংসা-রের অশেষ জ্বালা ও যন্ত্রণার মধ্যে মনের যথার্থ উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তাঁহাকে ভবপারাবারে সাহায্য করিবার জন্য ভক্তিমার্গ যেমন সুকর, এমন আর কিছুই নয়। ভক্তিমার্গই সাধনবিধির চরমোৎকর্ষ, ঈশ্বরের প্রতি পরাপ্রেম ও পরা-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

সত্য বটে, জ্ঞানমার্গ ধর্ম্মসাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধি, কিন্তু জনসাধারণ ইহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হয় না। অজ্ঞ মূর্খ লোকেরা জ্ঞানমার্গ আদৌ বুঝিতে পারে না; তবে তাহারা এ মার্গ কি প্রকারে অনুসরণ করিতে পারে? তাহারা যতই কেন চেষ্টা করুক না, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা তাহাদের বিড়ম্বনা মাত্র; ইহাতে তাহারা কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ করে না। আবার যে যোগাভ্যাসদ্বারা ইহাতে ভালরূপ উপকার পাওয়া যায়, তাহাই সাধারণের নিকট দুঃসাধ্য। যাহা সাধারণের নিকট এত আয়াসসাধ্য ও কঠিন, তাহাতে সমাজের কি উপ-কার? যে হিন্দুসমাজে পুরাকাল হইতে অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য কর্ম্মমার্গ ও প্রাজ্ঞদিগের জন্য জ্ঞানমার্গ উপদিষ্ট, কালক্রমে সে সমাজে উভয়প্রকার সাধন-বিধি দ্বারা লোকবর্গ উপকৃত হয় না। বেদের কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা বা যাগযজ্ঞাদি-কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের সমাজবন্ধন উদ্দেশ্যটি যেরূপ সংসিদ্ধ হয়, উহা দ্বারা সাধারণ মানবমনের তদনুরূপ উৎকর্ষ সাধন হয় না। আবার বেদের

জ্ঞানকাণ্ডটী জনসাধারণের নিকট চিরদিন অবরুদ্ধদ্বার থাকে। এজন্য পুরাকালে বৈদিকধর্ম্ম দ্বারা সাধারণ-মানবমনের উৎকর্ষসাধন হয় না এবং সাধারণ মানবহৃদয়ের ভাবাবলির কোনরূপ উন্নতিসাধন হয় না। পৌরাণিক ধর্ম্মই হিন্দুসমাজে উপরোক্ত অভাব পূরণ করে এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে এ ধর্ম্ম পরব্রহ্মের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন ও গুণকীর্ত্তন করতঃ সাধারণ লোকবর্গকে যথার্থ ভক্তিযোগ উপদেশ দেয় এবং তাহাদের মনের সম্যক উৎকর্ষসাধন করিতে চেষ্টা পায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস-নারদ-সম্বাদে উল্লিখিত, মহর্ষি ব্যাসদেব বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ইতিহাস ও পুরাণ রচনা করিয়া কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, ধর্ম্মের চতুর্বর্গফল প্রভৃতি বর্ণন করিয়াও মনে কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ করেন না; এতদূর ধর্ম্মবর্ণন করিয়াও তাঁহার মন অকৃতার্থ হয়। পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশানুযায়ী-ভক্তিযোগ উপদেশ দেওয়াতে তাঁহার মন কৃতকৃতার্থ হয়। এ শাস্ত্রোক্ত কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানযোগ অনুশীলন করিয়াও জ্ঞানিব্যক্তিগণ প্রকৃত তৃপ্তি বোধ করেন না। এজন্য হিন্দুসমাজে এ মার্গের বিশেষ অবনতি সঙ্ঘটিত হয়! ইহার অবনতি পূরণ করিবার জন্য শাস্ত্রে অশেষ উন্নতিসাধক ভক্তিমার্গটী প্রকটিত। কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলের জন্য ভক্তিমার্গ উপদিষ্ট। অতএব কলিযুগে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনবিধি; ইহাতেই সমাজস্থ যাবতীয় লোকের মানসিক ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা সম্যক চরিতার্থ হয়।

অনেকে বলেন, যে বৈদিকধর্ম্মে নির্গুণব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট, যাহাতে পৌত্তলিকতার নাম গন্ধ নাই, তাহাই আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা যে সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু কলিযুগে বৈদিকধর্ম্ম সমধিক অবনত হওয়ায়, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হয়। এখন যে পৌরাণিকধর্ম্ম ভক্তিমার্গ প্রকটন করতঃ বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাস্ত করে, সে ধর্ম্ম কি কলিকালে বৈদিকধর্ম্ম অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন? তবে কেন লোকে পৌরাণিকধর্ম্মের নিন্দা করে?

যে পৌরাণিকধর্ম্ম ভক্তিযোগ প্রকটিত করায় এমন সমুন্নত, একেশ্বরবাদিগণ

এখন সে ধর্ম্মের বিস্তর নিন্দাবাদ করেন এবং ইহাকে অপদার্থ পৌত্তলিকতা-জ্ঞানে অবজ্ঞা করেন। তাঁহারা ইহার মহোচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়াই ইহার এত নিন্দা করেন। দেখ নির্গুণ মায়াতীত পরব্রহ্ম মায়াময় মানবমনের ভাব্য নন; তিনি কদাচ মানবমনের আয়ত্ত হইতে পারেন না এবং তাঁহার প্রতি কোনরূপ ভক্তি দেখান যায় না। তৎপরিবর্ত্তে সগুণ নিরাকার ঈশ্বরে মানবীয় গুণরাশি আরোপ করতঃ তাঁহার গুণানুবাদ ও গুণ-কীর্ত্তন করিলেও মানবমন প্রকৃত তৃপ্তি বোধ করে না। তুমি যদি তোমার ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময় ও সর্ব্বমঙ্গলময় বলিয়া ভাব, ইহাতেই কি তোমার মন সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ ও কৃতকৃতার্থ হয়? অজ্ঞ জনসাধারণ কি ঈশ্বরকে এইরূপে ভাবিয়া নিজ নিজ মনের উৎকর্ষসাধন করিতে পারে?

খ্রীষ্ট, মুসলমান, ও বৌদ্ধধর্ম্ম কেন ঈষা, মহম্মদ ও বুদ্ধদেবের লোকাতিগ গুণ-রাশি বর্ণনা করে এবং রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চার্চ্চ সম্প্রদায় কেন ঈষার প্রতিকৃতি সকলের সম্মুখে ধারণ করে? যদি উহারা কেবল নিরাকার ভজনা করিয়া তৃপ্তি বোধ করিত, সাকারদিকে উহাদের মন কি এত স্বল্পপরিমাণেও ধাবিত হইত? এস্থলে হিন্দুধর্ম্ম উহাদের অপেক্ষা আরও একপদ অগ্রসর হইয়া আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য, আমাদের ভক্তিপ্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য পরব্রহ্মের কয়েকটি মায়ারূপ দেখায় ও তাঁহাদের লীলা বর্ণন করতঃ তাঁহাকে আমাদের অসম্পূর্ণ মনের সম্যক্ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পায়। মনের প্রকৃত শিক্ষার জন্য ব্রহ্মকে যে ভাবে ভাবা যায়, তাহাতেই আমাদের অশেষ মঙ্গল, তাহাতেই আমাদের জীবাত্মার অশেষ উন্নতি।

মানবহৃদয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট ও সাত্ত্বিক ভাব অহরহঃ উত্থিত, সে গুলি সম্যক স্ফুরিত হইলে, উহারা অশেষ সুখের আকর হয়। এই সকল সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য হিন্দুধর্ম্ম নিজ পুরাণে মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়াময় সাত্ত্বিকরূপ বিষ্ণুকে দেখায় এবং সেই সাত্ত্বিকরূপের কয়েক অবতার বর্ণন করিয়া সকলের মনে সাত্ত্বিকভাব স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পায়। এই সকল সাত্ত্বিকভাবের মধ্যে ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভাগবতাদি পুরাণে ভক্তিযোগ সম্যক বর্ণিত।

যেমন মানবহৃদয়ে বিভিন্নভাবের সমাবেশ দেখা যায়, হিন্দুধর্ম্মও সেইরূপ

পরব্রহ্মের বিষ্ণুরূপের বিভিন্ন অবতার দেখাইয়া, উহাদের নানাপ্রকার লীলা বর্ণন করতঃ ভাববিষয়ে সকলকে ভালরূপ শিক্ষা দেয়। যখন এই সকল ভাব ঈশ্বরে অর্পিত হয় ও ঈশ্বরোন্মুখ করা হয়, তখনই ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শিত হয়। ভক্তি ব্যতীত মনের প্রকৃত শিক্ষা ও প্রকৃত উন্নতি হয় না। নিরাকার ঈশ্বরকে তুমি অন্তরের সহিত ভক্তি কর, অথবা তাঁহার কোন সাকারমূর্ত্তির উপর অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন কর, যে মার্গ দিয়া যাও না কেন, ভক্তিপ্রদর্শন ব্যতীত তোমার মন কিছুতেই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। ভক্তিপ্রকাশই মানবমনের প্রকৃত উন্নতির প্রথম ও চরম সোপান।

সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শিত; কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্ম চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করে। মুখে কতকগুলি অসার বাক্যসমন্বয় উচ্চারণ করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করায় তাঁহার প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শিত হয় তাহা যৎসামান্য; আর তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া ষোড়শোপচারে উহার পূজা করায়, অথবা সংসারের বিবিধ মনোরম বস্তু একত্রিত করিয়া উহার পূজা করায়, তাঁহার প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা অলৌকিক ও অসাধারণ। কথা কথা মাত্র, কাজ কাজই। অন্য ধর্ম্মের লোকেরা যে ভক্তি সামান্য কথায় প্রকাশ করেন, ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ষোড়শোপচারে প্রতিমূর্ত্তিপূজন করিয়া সেই ভক্তি কাজে দেখান। এ জন্য ভাবপ্রিয় ভাবুক হিন্দু ঈশ্বরের প্রতি নিজ মনের যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্যই চিরদিন নিরাকার ঈশ্বরের মৌখিক উপাসনাকে অবজ্ঞা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তিপূজন অবলম্বন করেন। অতএব যাহার জন্য অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা হিন্দু-ধর্ম্মের যথার্থ ভাব বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে অসার পৌত্তলিকতা জ্ঞানে ঘৃণা করে, তাহাতেই ইহার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত, তাহাতেই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত।

এস্থলে সাহঙ্কারে ও সদর্পে বলা উচিত, যাঁহারা সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করেন, তাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি যেরূপ স্ফুরিত, নিরাকারোপাসকদিগের সেরূপ হওয়া ততদূর সম্ভব নয়। তাহার সাক্ষ্য, ভক্তির ইংরাজী প্রতিবাক্য (devotion) লইয়া বিচার করিয়া দেখ, "ভক্তি" কথায় আমাদের মনে যে সকল ভাবোদ্রেক হয়, ইংরাজি কথায় তাহার শতাংশের কি একাংশ হয়?

আমরা গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে যেরূপ অপার ভক্তিভাবে প্রণত হই, একজন ম্লেচ্ছ খৃষ্টান কি সেরূপ ভক্তি কদাচ অনুভব বা প্রকাশ করিতে পারেন? হয়তঃ তিনি সামান্যরূপ টুপি উত্তোলন, মস্তক অবনমন বা জানুর উপর উপবেশন করিয়া মনের অস্ফুট-ভক্তি অস্ফুট-ভাবে ব্যক্ত করেন; কিন্তু ভক্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন না।

কায়মনোবাক্যে দেবদেবীকে আন্তরিক ভক্তি করায় আমাদের ভক্তি-প্রবৃত্তি কিরূপ স্ফুরিত! পিতামাতা গুরুজন, রাজা ও সমাজনেতৃ ব্রাহ্মণগণ আমাদের কিরূপ ভক্তির পাত্র! আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ অপার ভক্তি প্রদর্শন করি! কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আজ কুশিক্ষাবশতঃ আমাদের সে ভক্তিভাব কোথায়? "কোথায় সেদিন এবে গিয়াছে চলিয়া!" এখন আমরা ইংরাজদিগের অসদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া পিতামাতা গুরুজনের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হই। কি পরিতাপের বিষয়! কি আক্ষেপের বিষয়! এখন আমরা অন্তরের ভক্তি প্রদর্শনকেও ধর্ম্মের একটা কুসংস্কার মনে করি। হায়! হায়! সমাজের কি হৃদয়বিদারক অধঃপতন!

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা না থাকিলে মনের প্রকৃত উন্নতিসাধন হয় না। হৃদয়ের সকল ভাবগুলি ভক্তিদ্বারা চালিত হইলে, হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভূত হয় এবং মনও ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হয়। যাঁহার প্রতি মনের প্রগাঢ় ও আন্তরিক ভক্তি জন্মায়, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে ও গুণানুকরণে ইহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। গুণানুকীর্ত্তনে মনের যেরূপ অপার আনন্দ, গুণানুকরণেও তেমনি ইহার অপার উন্নতি। মানবমনে যথার্থ ঈশ্বরভক্তি উদ্রেক করিবার জন্যই শাস্ত্রে অবতারদিগের এত গুণকীর্ত্তন দেখা যায় এবং সেই গুণানুকীর্ত্তন পাঠ বা শ্রবণ করায় মন কিরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হয় ও কতদূর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহা কি সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়গণ একবার ভাবেন? তাঁহারা ত ভালরূপ জানেন, শাস্ত্র অতিরঞ্জিত ও অলীক উপকথায় পূর্ণ এবং হিন্দুধর্ম্ম লোকবর্গকে ভগবৎলীলা শ্রবণ করাইয়া কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, কাল্পনিক হউক, অকাল্পনিক হউক, শাস্ত্রের যে

সকল অমৃতময় কথা শ্রবণে ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবগুলি মানবমনে শতধারে উথলিয়া পড়ে, তাহা কি ধর্ম্মের কুসংস্কার? আর তাহাই যদি কুসংস্কার হয়, তবে সংসারে কোন্‌টি সুসংস্কার? যে সকল ভগবৎ কথা শ্রবণে কোটী কোটী মানবমণ্ডলী এতকাল আনন্দাশ্রু ও শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মনের সাত্ত্বিকভাব স্ফুরণ করেন ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন, আজ কিনা তোমরা সেই সকল ভগবৎ কথার উপর উপহাস কর! তোমাদের বিদ্যাশিক্ষায় শত ধিক্!

বিশ্বাস, ভক্তি ও সাধনা, এই তিনটি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ইহাদের ভিতর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে একের অভাবে অপরটি স্ফূর্ত্তি পায় না। ইহাদের ভিতর আবার বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। বিশ্বাস হইতেই ভক্তি, ভক্তি হইতেই সাধনা ও সাধনা হইতেই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ। যখন উপরোক্ত তিনটি অঙ্গ একাধারে মিলিত হইয়া সম্যক অনুষ্ঠিত হয়, তখনই প্রকৃত ধর্ম্মভাব হৃদয়ে স্ফুরিত হয় এবং বহু দিবস ধরিয়া উহাদের সম্যক অনুশীলনে মনের একাগ্রতা লাভ ও হৃদয়ে ক্রমশঃ বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই প্রকারেই ভক্তিমার্গানুশীলন দ্বারা মানব জীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করা যায়।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পদ্মপলাশলোচন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুর যে মোহনমূর্ত্তি তোমার নয়ন সমক্ষে ধারণ করে, অগ্রে সেই মূর্ত্তির উপর আন্তরিক বিশ্বাস কর ও অপার ভক্তি প্রদর্শন কর, তবে তুমি সেই মূর্ত্তির ধ্যান ও ধারণা করিবার উপযুক্ত হও এবং সেই মূর্ত্তির ধ্যান ও ধারণা করিয়া তুমি ক্রমশঃ নিজ মনের একাগ্রতা লাভ করিতে শিক্ষা কর। আর যদি তোমার এমন বিশ্বাস হয়, যে এ মূর্ত্তি কাল্পনিক, তোমার মনের বিশ্বাস, ভক্তি ও সাধন সকলই এক কালে প্রনষ্ট হয় এবং তুমিও ধর্ম্মপথে পশ্চাৎপদ হইয়া যাও। অতএব ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম বিশ্বাস ও ভক্তি একান্ত আবশ্যক।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

সুদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম
দেবা অপ্যস্যরূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিনঃ।
নাহং বৈদৈর্নতপসা ন জ্ঞানেন চেজ্যয়া
শক্যং একবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবং বিধোঽর্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমোমদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।

"হে অর্জ্জুন! তুমি আজ আমার যে মনোরম বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলে, দেবতারাও সেই মূর্ত্তি দেখিতে নিত্য অভিলাষী! লোকে বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও এ মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। কেবল মাত্র অনন্য ভক্তিদ্বারা তাহারা আমাকে এইরূপে জানিতে, দেখিতে ও নিগূঢ়তত্ত্ব জানিয়া আমাতে প্রবেশ করিতে বা তন্ময়ত্ব লাভ করিতে সক্ষম। আমারই কর্ম্মপরায়ণ হও, মদগত প্রাণ হও, আমায় একান্ত ভক্তি কর, সকল জীব-জন্তুতে অহিংসাপর হও, তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" অপার ও অনন্ত ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরোপাসনা বা দেবার্চ্চনা কদাচ সম্ভব নয়। অতএব অনন্য ভক্তিই সকল ধর্ম্মসাধনের মূলাধার।

ভক্তিমার্গ গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্গ। ইহা সকলের পক্ষে সহজ ও সুগম। ইহাতে দেহপাত করিতে হয় না; কোনরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না; বন জঙ্গলে যাইতে হয় না; কোনরূপ কষ্টকর সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হয় না; কেবল হরিনাম জপ, হরিরূপ ধ্যান, হরিগুণ গান, হরি-সঙ্কীর্ত্তন, হরি-কথা-শ্রবণ ও হরি-কথা-পাঠ। এইরূপে অহোরাত্র হরিপ্রেমে মজিয়া সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করা ও তন্ময়ত্ব লাভ করাই ভক্তিযোগের চরম ফল।

দেখ, ভক্তিযোগ শাস্ত্রে কিরূপ বিশদভাবে বর্ণিত! ধর্ম্মাত্মা হিন্দুকবিগণ পঞ্চমবর্ষীয় দুগ্ধপোষ্য বালক ধ্রুবের মুখারবিন্দ হইতে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা উল্লেখ করাইয়া অথবা পরমভক্ত প্রহ্লাদের অপার হরিভক্তি বর্ণন করিয়া আমাদিগকে যেরূপ পরাপ্রেম ও পরাভক্তি উপদেশ দেন, তাহা ধর্ম্মজগতের অমূল্যনিধি। বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, সে সকল ধর্ম্মনিধি আমাদের জাতীয় জীবনের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত। এ সকল অমূল্য কথা শ্রবণ করিয়া চিরদিন আমাদের হরিভক্তি শতধারে উথলিয়া পড়িবে।

ভক্তিযোগ যেমন সহজ, তেমনি ইহা পরম প্রীতিকর ও অপার আনন্দ-

দায়ক। ইহাতে আমরা আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দময়রূপ দর্শন করিয়া কেবল আনন্দনীরে অভিষিক্ত হই। ইহাতে আমরা ত্রিভঙ্গ মুরারির নর্ত্তন দর্শন করতঃ আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া ত্রিভঙ্গে নর্ত্তন করি। যত দিন না তুমি হরিপ্রেমে মজিয়া সম্পূর্ণরূপ তন্ময়ত্বভাব হৃদয়ে স্ফুরণ করিতে পার, ততদিন তোমার হরি-ভক্তি অসম্পূর্ণ, ততদিন তোমার হরিভজনও অসম্পূর্ণ। কোথায় হে প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবকুলতিলক, পূজ্যপাদ চৈতন্যদেব! তুমি বঙ্গবাসীজনকে কিরূপ হরিপ্রেমে মাতাইয়াছ। ধন্য তোমার অসীম হরিভক্তি! ধন্য তোমার অসীম কৃষ্ণপ্রেম! এমন ভক্তি কে কোথায় দেখেছে, বল? কে কোথায় শিখেছে, বল?

আহা! ভক্তের হৃদয় কিরূপ স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ! ভক্তের হৃদয় ভক্তবৎসল হরির গুণ কীর্ত্তনে কিরূপ আনন্দ ভোগ করে! সে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখিলে কাহার না হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া পড়ে? যেমন হরির নাম সুমধুর, ভক্তের জীবন তেমনি সুমধুর। তিনি দিবারাত্র হরিগুণ গাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তিনি শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে আপনার চতুর্দ্দিকে হরিমূর্ত্তি দেখেন, কখনও বা তিনি হরিনাম করিয়া রোদন করেন, কখনও বা হাস্য করেন। হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয়-চকোর আহ্লাদে নৃত্য করে। হরিসুধা পান করিয়া তাঁহার জীবন কিরূপ অমৃতময় হয়? পুত্র কলত্র লইয়া তিনি ঘোর সংসারী বটে, কিন্তু হরিপ্রেমে মগ্ন হওয়ায়, তিনি সংসারে প্রকৃত বৈরাগী। সংসারের যেরূপ জ্বালা যন্ত্রণা আসুক না কেন, যেরূপ আপদ বিপদ আসুক না কেন, তিনি সকল অবস্থায় নির্ব্বিকার। হরিভক্তির গুণে তাঁহার মন যেরূপ বৈরাগ্যে পূর্ণ, তাহাতেই তিনি সংসারের মাঝে অনন্ত সুখে সুখী।

যেদিন তোমার হৃদয়ে প্রকৃত হরিভক্তি উদয় হয়, সেই দিন হইতে তোমার নবজীবন আরম্ভ হয়। তুমি জগৎ হরিময় দেখ, সকল কর্ম্ম কেবল হরির নামে কর। হৃদয়ে ও চতুর্দ্দিকে তুমি কেবল হরি দর্শন কর। সংসারের সকল জ্বালা ও যন্ত্রণা তোমার নিকট অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন তোমার জীবন প্রকৃত ব্রহ্মময় হয়।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে,
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। (গীতা)

"যিনি আমাকে অচলা ভক্তির সহিত সেবা করেন, তিনি মায়ার ত্রিগুণ

অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব পাইবার উপযুক্ত।" অতএব আইস সকলে হরিপ্রেমে মগ্ন হও, ও হরি সুধা পান কর।" জগতে হরিনামই একমাত্র সত্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

এখন ভাব দেখি, যে ধর্ম্ম হরির মোহনমূর্ত্তি নয়ন সমক্ষে ধরাইয়া, আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি অনন্ত প্রেমে ও অনন্ত ভক্তিতে মজায়, সে ধর্ম্ম কি জগতে অপকৃষ্ট ধর্ম্ম? সে ধর্ম্ম কি অর্দ্ধসভ্যদেশের অসার পৌত্তলিক ধর্ম্ম? সে ধর্ম্ম কি জগতে একমাত্র সত্য, সনাতন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নয়? নিরাকারোপাসকদিগের সামান্য ঈশ্বরভক্তি কি আমাদের সেই পরাপ্রেম ও সেই পরাভক্তির সহিত তুলনা হইতে পারে?

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অমৃতময় উপদেশ বিনিঃসৃত। ভাষামাত্রেই কত কত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত! কিন্তু গীতার ন্যায় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। সকল গ্রন্থই অল্লাধিক সাম্প্রদায়িকভাবে পরিপূর্ণ; কিন্তু গীতোক্তধর্ম্ম সকল মানবধর্ম্মের সার ও সর্ব্বাপেক্ষা মহোচ্চ। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ধনবান, কি দরিদ্র, কি রাজাধিরাজ, কি পথের ভিখারী, সকলের জন্য এ ধর্ম্ম উপদিষ্ট এবং সকলের নিকট ইহার সুবিমল জ্যোতি সমভাবে বিকীর্ণ। ইহাতে কোনরূপ ভেদজ্ঞান নাই, বাগ্‌বিতণ্ডা নাই, তর্কবিতর্ক নাই, আছে কেবল একমাত্র সকল ধর্ম্মের সার নিষ্কাম ধর্ম্ম। কি ক্রিয়াযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, সকল যোগের সার একমাত্র নিষ্কামধর্ম্ম; তাহাই ইহার ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত। সেই অমূল্যনিধি ভাগবদ্গীতা পাঠ করিয়া সকলে জীবন সার্থক করুন।

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তু মিচ্ছতি যো নরঃ
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ। (গীতামাহাত্ম্য)

"যিনি ঘোর সংসারসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া সুখে পার হন।"

এখন নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি? সংসারে অশেষ কর্ম্মের মধ্যে, সকল বিষয়ে কামনাশূন্য বা নিস্পৃহ হইয়া কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। দেখ, সকলে সংসারে কোন না কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন। সকল কর্ম্মেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে। ফললাভ ব্যতীত কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। তুমি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন কর, সংসারে পুত্র কলত্র লইয়া সুখে থাকিবার জন্য। তুমি অগাধ পরিশ্রম করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন কর, অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসারে গণ্য ও মান্য হইবার জন্য। তুমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা কর ও নানা ধর্ম্মকর্ম্ম কর, পরলোকে সুখী হইবার জন্য। সেইরূপ কোন না কোন ইষ্টলাভের জন্য সকলেই বিবিধ কর্ম্ম করেন। এখন ফললাভের বাঞ্ছা ত্যাগ করতঃ কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। যে কর্ম্ম কর না কেন, উহাতে কিছুমাত্র অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, এ সব চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, যাহাই হউক না কেন, ফললাভের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া এক মনে, এক ধ্যানে কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। (গীতা)

"কর্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। ফললাভের জন্য যেন তোমার কোন কর্ম্ম করা না হয়। এবং অকর্ম্মে বা কর্ম্মের অননুষ্ঠানেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।"

দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সংসারে ফললাভের জন্য কোন কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের অনেক সময়ে ঈপ্সিত ফললাভ হয় না এবং মনে নানারূপ কষ্ট উপস্থিত হয়। যে কর্ম্মে যিনি যত অধিক আশা করেন, তিনি সেই কর্ম্মে তত অধিক নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হন। অতএব ফললাভের বাঞ্ছা বা বাসনা ত্যাগ করতঃ কর্ম্ম করিলে মনের শান্তি দূর হয় না।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ;
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। (গীতা)

"যে পুরুষ সকল বিষয়ে স্পৃহা, মমতা ও অহঙ্কারকে জলাঞ্জলি দিয়া মন হইতে যাবতীয় বাসনা দূর করেন, তিনিই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।"

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।

(গীতা)

"যাঁহার মন প্রকৃতরূপ বশীভূত, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ও সংযত হইয়া স্ব স্ব বিষয়োপভোগে আসক্তও নয়, অথচ বিদ্বেষবশতঃ একেবারে অনাসক্তও নয়, তিনি সেই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাদের বিষয় উপভোগ করতঃ আত্মপ্রসাদ বা প্রকৃত শান্তিলাভ করেন।"

এ সংসারে বিষয়বাসনা বা ফললাভের স্পৃহা আমাদিগকে বিবিধ সুখ দুঃখের ভাগী করে! ঈপ্সিত ফললাভ হইলে আমরা যেমন সুখার্ণবে ভাসমান হই, সেই ফললাভ না হইলে আমরা তেমনি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হই। অতএব মন হইতে বাসনা বা ফললাভের স্পৃহা দূর করিতে পারিলে, সংসারের ক্ষণস্থায়ী অসার সুখদুঃখে আমাদিগকে অভিভূত হইতে হয় না এবং সকল বিষয়ে স্পৃহা-শূন্য হওয়াই প্রকৃত শান্তি বা সন্তোষলাভের উপায়। যিনি বাসনাকে একেবারে দূরীভূত করিয়া বিবিধ কর্ম্ম করেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা এবং তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ।
সম শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ।

(গীতা)

"যিনি ইষ্টলাভে আহ্লাদিত নন, অথচ কোন বিষয়ে বিদ্বেষভাব রাখেন না, যিনি অনিষ্টোৎপত্তিতেও দুঃখিত নন ও সংসারের কোন বিষয়ে অভিলাষ [illegible] না, যিনি যাবতীয় শুভাশুভ নিজ মন হইতে দূর করেন এবং যিনি [illegible] পরমভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি আসক্তিশূন্য হইয়া [illegible] মানাপমান, সুখদুঃখ ও শীতোষ্ণে অবিকৃত থাকেন, যিনি [illegible] উভয়কে সমভাবে দেখেন, যিনি মৌনাবলম্বন করেন, যিনি [illegible]

যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই সন্তুষ্ট হন এবং যিনি আমার পরম ভক্ত ও আমাতেই একাগ্র, তিনিই আমার প্রিয়।"

যেমন প্রকৃত শান্তিলাভ নিষ্কাম ধর্ম্মের একটী মহৎ গুণ, তেমনি ইহা দ্বারাও সংসারের সকল বিষয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যাবলম্বন করাতে মনের একাগ্রতা লাভ করা যায়। কি ক্রিয়াযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি জ্ঞানযোগ, সকল সাধনবলে সংসারে প্রকৃত বৈরাগ্যাবলম্বন করতঃ মনের একাগ্রতা লাভ করা উচিত ও ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হওয়া উচিত। অতএব যে মার্গ দিয়াই ধর্ম্মাচরণ কর না কেন, সকল মার্গেই নিষ্কাম ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত এবং ইহাতেই মনের প্রকৃত উন্নতিলাভ ও শ্রেয়োলাভ। ইন্দ্রিয়াদির সংযম করতঃ ব্রহ্মে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হইতে হইলে, নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণের একান্ত আবশ্যক। সকল বিষয়ে নিষ্কাম না হইতে পারিলে, ব্রহ্মে একনিষ্ঠ বা হরির প্রতি অনন্যভক্তি প্রদর্শন করা যায় না। অতএব সংসারে নিষ্কাম ধর্ম্মই সকল ধর্ম্ম সাধনার সার।

এখন দেখা যাউক, নিষ্কাম ধর্ম্ম দ্বারা অবিনশ্বর জীবাত্মা কিরূপ উপকৃত। বিষয়বাসনা প্রবল বলিয়া মানবমন অনুক্ষণ বিষয়ানুচিন্তনে রত এবং ইহাতেই জীবাত্মা কর্ম্মবন্ধনসূত্রে অধিক জড়িত। বিষয়বাসনা মনে যত মন্দীভূত হয়, জীবাত্মার কর্ম্মবন্ধনও তত শিথিল হয়। বিষয় বাসনাকে মন্দীভূত করিবার জন্য সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হওয়া উচিত এবং ইহাতেই নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। অতএব যাঁহারা নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণে তৎপর, তাঁহাদের জীবাত্মা অশেষ প্রকারে উপকৃত।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। (গীতা)

"যে সকল মহাত্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া কর্ম্মফলের স্পৃহা ত্যাগ করেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন।"

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে। (গীতা)

"যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বজ সুখদুঃখে নির্ব্বিকার ও সকল বিষয়ে মৎসরশূন্য এবং কার্য্যসিদ্ধি হউক বা না হউক, যিনি সকল অবস্থায় সমভাবে অবস্থিত, তিনি সংসারের অশেষ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে আবদ্ধ নন।"

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যং সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি না কাঙ্ক্ষতি
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎপ্রমুচ্যতে। (গীতা)

"যিনি সংসারের কোন বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ রাখেন না, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। তিনি দ্বন্দ্বাতীত বলিয়া অনায়াসে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন।"

হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিছত্রে অলস্তাক্ষরে লিখিত, বিষয়বাসনা মন্দীভূত করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অবিনশ্বর জীবাত্মার অশেষ শ্রেয়োলাভ ও মঙ্গললাভ হয়। কিন্তু কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে আমাদের বিষয় বাসনা এত প্রবল, যে ইহাকে সংযত করিয়া মনের একাগ্রতা স্থাপন করা এখন নিতান্ত দুরূহ। সেজন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নিষ্কামধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্মের এত প্রশংসা করিয়া আমাদের মনে বৈরাগ্যভাব স্ফুরণ করিতে বিশেষ প্রয়াসী। যিনি সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত সহজ বটে, কিন্তু তিনি মানবজীবনের মহৎ উদ্দেশ্যের কিয়দংশ সংহার করেন; কারণ যে আধিভৌতিক উন্নতিসাধন আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা তিনি নষ্ট করেন। বস্তুতঃ যিনি সংসারের অশেষ প্রলোভনের মধ্যে নিজ মনে প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক অশেষ কর্ম্ম করেন, তাঁহারই বৈরাগ্য অধিক প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে, সংসারে এমন কয়জন দেখা যায়?

যিনি বাহ্যদর্শনে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী নন। কিন্তু যিনি সংসারে থাকিয়া সকল বিষয়ে বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক সন্তুষ্ট থাকেন ও সকল প্রকার কর্ম্ম করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাঁহারই সন্ন্যাসাবলম্বন অধিক প্রশংসনীয়।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে। (গীতা)

"কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়েতেই শ্রেয়োলাভ করা যায়; তন্মধ্যে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ অধিক প্রশংসনীয়।" সংসারের অশেষ পাপ ও প্রলোভনের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করাতে জীবাত্মার যেরূপ শিক্ষা হয়, সংসার হইতে বিরত হইয়া আজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ইহার কি সেইরূপ শিক্ষা

হয়? সংসারের অ তাপরাশি ও ক্লেশরাশির শিক্ষা হয়, সংসার ত্যাগ করিয়া ঐ সকল হইতে অব্যাহতি পাইলে, ইহার কি সেইরূপ শিক্ষা হয়? ত্রয়োদশবর্ষীয়া অক্ষতা কুমারীর যোনিদেশ উদ্ঘাটিত পূর্ব্বক উহাতে মহেশ্বরীমূর্ত্তি ধ্যানকরতঃ মাতৃবৎ পূজা করিয়া যে লতাসাধন করা যায়, তাহা সাধনার পরাকাষ্ঠা; এত প্রলোভনের মধ্যে দুর্ব্বল মনকে নির্ব্বিকারকরতঃ কামপ্রবৃত্তির সমূলে ধ্বংসসাধন করিয়া, সে স্থলে যে পরমার্থ-ভাব প্রকটন করা যায়, তাহাই সাধনার চরমোৎকর্ষ। সেইরূপ সংসারের অশেষ প্রলোভনের মধ্যে যে ধর্ম্মাচরণ করা যায়, তাহাতেই জীবাত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন। অতএব সংসারত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থে বনে গমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নয়।

এক নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণদ্বারা মানব ঘোর সংসারী হইলেও জীবনের প্রধান শ্রেয়োলাভ করেন। এ বিষয় যিনি যত স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও একাগ্রচিত্ত, তিনি ধর্ম্মপথে তত অগ্রসর। সত্য বটে, নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণ সাংসারিকের পক্ষে কষ্টকর, কিন্তু যিনি যথাসাধ্য পরোপকার ব্রতে ব্রতী, পরের হিতসাধনে একান্ত-তৎপর, পরের জন্য সদা স্বার্থত্যাগী, যিনি শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে হরিনাম স্মরণপূর্ব্বক সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করেন, তিনিও নিষ্কাম ধর্ম্মে বলীয়ান। এইরূপে সকল কর্ম্মে আত্মাভিমান ত্যাগ করতঃ ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করা হয়।

যৎ করোসি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্। (গীতা)

"যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপ কর, তৎসমুদায় আমাতে অর্পণ কর।"

ইহাতেই তোমার প্রকৃত শ্রেয়োলাভ এবং ইহাই তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম। এইরূপে সংসারের সকল কর্ম্মে হরিনাম স্মরণপূর্ব্বক সম্পাদন করিলে প্রকৃত হরিভক্তি তোমার মনে উদয় হয়। ইহাতে তুমি যেমন পাপপথ হইতে বিরত থাক, তেমনি তুমি ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হও। কলিকালে ইহাই তোমার প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম। এরূপ ধর্ম্মসাধন কাহারও নিকট দুষ্কর নহে।

নিষ্কাম ধর্ম্মের গুণ অনন্ত। ইহাতে যেমন মনে অশেষ শান্তিলাভ ও

তাপের সন্তোষলাভ হয়, জীবনও তেমনি মধুর ও শান্তিময় হয়। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা, বাধাবিঘ্ন, আপদবিপদ, আধিব্যাধি, সকলই ইহার নিকট অনুক্ত হয়। যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণে তৎপর, তিনি যে অবস্থায় অবস্থিত হউন না কেন, যেরূপ বিপদে পতিত হউন না কেন, সকল অবস্থায় তিনি অবিকৃত ও দ্বন্দ্বাতীত, কিছুতে তাঁহার মনের শান্তিভঙ্গ হয় না; তাঁহারই জীবন এ সংসারে প্রকৃত অমৃতময় ও স্বর্গোপম।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে। (গীতা)

"হে পুরুষর্ষভ! ইহ সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখ যাঁহাকে কোনরূপ যন্ত্রণা দেয় না, যিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাবলে যাবতীয় সুখদুঃখে অবিকৃত, তাঁহারই জীবন অমৃতময়।"

যখন মনে নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্যক স্ফুরিত, তখন কি লোষ্ট্রকাঞ্চন, কি শত্রুমিত্র, কি ব্রাহ্মণশূদ্র, কি সুখদুঃখ, কি বিষ্ঠাচন্দন, কিছুতেই কোনরূপ ভেদাভেদ থাকে না; তখন একজন অনিকেতবাসী হইয়াও সুরম্যহর্ম্ম্যে বাস করেন, সুরম্যহর্ম্ম্যে বাস করিয়া অনিকেতবাসী হন; স্থণ্ডিলশায়ী হইয়াও দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করেন এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও স্থণ্ডিল-শায়ী হন; তখন তিনি চীরবাস হইয়াও দুকূলধারী হন এবং দুকূলধারী হইয়াও চীরবাস হন; তখন তিনি শরীরে বিষ্ঠা, পূঁজ ও রক্ত মাখিয়া পমেটম মাখেন এবং শরীরে পমেটম মাখিয়া বিষ্ঠা মাখেন; তখন তিনি বিপদে পতিত হইয়া সহাস্যবদনে বিপদ আলিঙ্গন করেন, পুত্রশোকে কাতর হইলেও করুণাময় ঈশ্বরকে ডাকেন। আহা! নিষ্কাম ধর্ম্মের কত গুণ! এমন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কোন দেশের কোন ভাষায় দেখা যায় না! মহাত্মা ঈশা বাইবেলে উপদেশ দেন, যদি কেহ তোমার দক্ষিণ গণ্ডস্থলে আঘাত করেন, তুমি তাঁহার দিকে বাম গণ্ডস্থল ফিরাইয়া দেও। এই উপদেশ শ্রবণে আজ অনেকে Christian Charityর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বল দেখি, গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মে যাহা উপদিষ্ট, তাহার সঙ্গে কি ইহার তুলনা হইতে পারে? ইহা নিষ্কাম ধর্ম্মের শতাংশের একাংশও নয়। যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকে ... প্রহার করিলেও, তাঁহার ক্রোধোদয় হয় না; তিনি কেবল ...

কারীর দুর্ব্বুদ্ধির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

শাস্ত্রে দুর্ব্বাসাদি মুনিগণের অভিসম্পাত দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিও না। ব্রাহ্মণজাতি হিন্দুসমাজের মঙ্গলোদ্দেশেই আপনাদের সামাজিক প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য ঐরূপ লিখিয়া যান। যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার মুখ হইতে কি অভিসম্পাত নিঃসৃত হয়? তিনি কি জানেন না, যদি জিহ্বার স্খলনবশতঃ অভিসম্পাতবাণী তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ মহাপাতকে পতিত হন?

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্মের মূলবিশ্বাস ও ত্রিমূর্ত্তি।

ধর্ম্মের মৌলিক মতামত লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য জগৎ আদৌ মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্ম বুঝে না, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে মায়াময় মানবমনের আদর্শানুযায়ী সগুণ, নিরাকার ঈশ্বর বুঝে। দ্বিতীয়তঃ যে ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ত্তা, তিনি বিশ্বের অন্তরালে বসিয়া, উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকিয়া, ঐ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তৃতীয়তঃ তিনি মানবমনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত, এজন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বমঙ্গলময়, দয়াময়, ন্যায়বান ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত। চতুর্থতঃ প্রকৃতি দ্বিগুণাত্মিকা, সৎ ও অসৎ; সতের রাজা ঈশ্বর ও অসতের রাজা সয়তান বা আহিরমন; সয়তান সংসারের অমঙ্গলরাশির কর্ত্তা ও ঈশ্বর ইহার মঙ্গলরাশির বিধাতা। যাহা হউক খৃষ্টাদি ধর্ম্ম একদেশ-দর্শী; ইহারা ঈশ্বরকে কেবল দ্বৈতভাবে দেখে। ইহাদের মতে বিশ্ব ও ব্রহ্ম পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ।

প্রাচ্যজগৎ প্রথমতঃ বিশ্বের আদিকারণ নির্গুণ পরব্রহ্ম ভালরূপ বুঝে এবং ইনিই আত্মাশক্তি মায়াযোগে বর্দ্ধিত হইয়া এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত। দ্বিতীয়তঃ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পরব্রহ্মের মায়াদেবীর ত্রিগুণের লীলামাত্র; বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ত্রিগুণের ক্রিয়ামাত্র; এজন্য মায়াতীত, গুণাতীত [illegible] ত্রিগুণানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে মায়াজগতে [illegible]।

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে প্রাক্সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাৎ ভেদমুপেয়ুষে। (কুমার সম্ভব)

"[illegible]ষ্টির পূর্ব্বে তুমি একাত্মা, পরে গুণত্রয়ের বিভাগের জন্য ত্রিমূর্ত্তিধারী [illegible] তোমায় নমস্কার।"

তৃতীয়তঃ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা এবং সংসারের যাবতীয় মঙ্গলামঙ্গল মায়ার ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন ; কিন্তু মায়াতীত পরব্রহ্ম মায়ার ত্রিগুণে নির্লিপ্ত ; তিনি সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা নন, তিনি ইহাদের জন্য দায়ী নন। চতুর্থতঃ পরব্রহ্ম কলিযুগে মানবমনের বোধগম্য না হওয়ায় ইহার স্থানে ইহার মায়া-শক্তি বা ইহার মায়াময় ত্রিরূপের কোন না কোন রূপ সম্প্রদায়বিশেষে পূজিত। শৈবদিগের ভিতর শিবই পরাৎপর পরব্রহ্ম ; তাঁহারই আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন ও বিষ্ণু ইহা পালন করেন। বৈষ্ণবদিগের ভিতর বিষ্ণুই পরাৎপর পরব্রহ্ম ; তাঁহারই আজ্ঞায় ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও শিব ইহার সংহার করেন। শাক্তদিগের ভিতর মায়াশক্তি বা মায়াদেবীই পরব্রহ্ম ; তাঁহারই আজ্ঞায় ব্রহ্মা বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু ইহার পালনকর্ত্তা ও শিব ইহার সংহারকর্ত্তা। আবার কেহ কেহ বলেন, মায়াতীত পরব্রহ্ম মায়াময় ব্রহ্মারূপ ধারণ করিয়া বিশ্ব রচনা করেন, মায়াময় বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বপালন করেন এবং মায়াময় শিবরূপ ধারণ করিয়া ইহার সংহার করেন। মায়াতীত পরব্রহ্ম এখন মায়াময় মানবমনের ভাব্য না হওয়ায়, তাঁহারা ঐরূপ ভাবিতে বাধ্য।

পাশ্চাত্য জগৎ কেন নির্গুণ পরব্রহ্ম বুঝিতে অক্ষম ? যে ধর্ম্ম সবে মাত্র সে দিন জগতে উত্থিত, সে ধর্ম্ম যুগধর্ম্মানুসারে মানবমনের আধ্যাত্মিক অপগমনবশতঃ কি প্রকারে নির্গুণ পরব্রহ্ম বুঝিতে পারে ? কিন্তু প্রাচ্যজগতে অতি প্রাচীনকাল হইতে, এমন কি জলপ্লাবনের বহু পূর্ব্ব হইতে যোগসিদ্ধ মহর্ষিদিগের মানসপটে নির্গুণ পরব্রহ্ম চিরদিন প্রতিভাত এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান মহাত্মামণ্ডলীর ভিতর চিরদিন নিবদ্ধ। দ্বাপরযুগে বা জাতীয় দ্বাপরযুগে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ব্রহ্মজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস বেদান্তে ও উপ-নিষদে প্রচার করেন। তদবধি নির্গুণ পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রাচ্যজগতে প্রকৃত জ্ঞানিদিগের ভিতর প্রচলিত। কিন্তু আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম বা পৌরাণিকধর্ম্ম যুগধর্ম্মানুসারে নির্গুণ পরব্রহ্মের স্থানে ইহার মায়াময় ত্রিমূর্ত্তি ভালরূপ বুঝে এবং লোকের মনে সাত্ত্বিকভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য ইহার সাত্ত্বিকরূপের পূজা বহুপ্রচলিত করে। যেমন খৃষ্টাদি ধর্ম্ম ঈশ্বরে মানবমনের শ্রেষ্ঠগুণাবলি আরোপিত করিয়া উহাদের সম্যক অনুশীলনে চেষ্টা পায় ; সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মও পরব্রহ্মের সাত্ত্বিকরূপের পূজার্চ্চনা বিধিবদ্ধ করিয়া লোকের মনে সাত্ত্বিক-

ভাবের স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পায়। এস্থলে প্রাচ্য ও পাশ্চত্য জগতের উদ্দেশ্য একরূপ। অতএব পাশ্চত্য জগতের ঈশ্বর ও আমাদের বিষ্ণু বা হরি, ইহাদের ভিতর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

প্রথমভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত, বিজ্ঞানের মতে ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের সহজ জ্ঞান বা নৈসর্গিক সংস্কার নহে। এখনও জগতে অনেক অসভ্য মানবমণ্ডলী বর্ত্তমান, যাহারা, ঈশ্বর কি, তাহা আদৌ অবগত নয়। জীব-জগতে এক মনুষ্য ব্যতীত অপরাপর জীবজন্তু, ঈশ্বর কি, তাহা একেবারে অনবগত। বাল্যকালে অন্যান্য সংস্কারের সহিত আমরা ঈশ্বরজ্ঞানপ্রাপ্ত হই। খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সহিত তথা-কথিত উন্নত একেশ্বরবাদ জগতে প্রচলিত। অতএব বলা উচিত, লোকপ্রখ্যাত ঈশ্বর বা লৌকিক ঈশ্বর (personal anthromorphic God), যিনি অন্তরালে বসিয়া জগৎ সৃষ্টি ও পালন করেন, তিনি মনঃকল্পিত। তুমি অবলম্বন ব্যতীত, আধার ব্যতীত এই দুস্তর ভবসাগর পার হইতে অসমর্থ বলিয়াই, ধর্ম্ম তোমার মনের প্রকৃত্য-নুযায়ী তোমার ভেলাস্বরূপ ঈশ্বর দেখায়। এই পাপতাপপূর্ণ-সংসারে দুর্ব্বল মানবের গত্যন্তর নাই বলিয়া, তিনি প্রায় সকল দেশে নিজ মনের অভিমত ঈশ্বর অবলম্বন করেন। কিন্তু বিশ্বসম্বন্ধে বিজ্ঞানের অজ্ঞেয় আদিকারণ ও বেদান্তের নির্গুণ পরব্রহ্ম, যিনি বাক্, মন ও ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অগোচর, যিনি আদ্যাশক্তি মায়াযোগে বর্দ্ধিত হইয়া মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত, তিনিই এ সংসারে মহাসত্য। কস্মিনকালে এ মহাসত্যের খণ্ডন হইবার নয়। যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর এ মহাসত্য জগতে দেদীপ্যমান। "ওঁ তৎসৎ" যে পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া অসংখ্য অসংখ্য যোগী, ঋষি, মহাত্মা ও পরমহংস নিজ জিহ্বা চিরদিন পবিত্র করেন, তাহাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য। আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান লৌকিক ঈশ্বরের উপর খড়্গহস্ত; কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানপ্রতি-পাদিত পরব্রহ্মের নিকট ইহাও চিরদিন নতশির। কেন আজ সভ্যতম আমেরিকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ খৃষ্টধর্ম্মের অনাদর করিয়া আমাদের বেদান্ত-প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম সাদরে গ্রহণ করেন? কেন, যে দিন পূজ্যপাদ বিবেকা-নন্দস্বামী দুন্দুভিস্বরে চিকাগোসহরে বেদান্তের পরব্রহ্মের বার্ত্তা প্রচার করেন, সকলেই তাঁহার মত আগ্রহাতিশয় সহকারে আলিঙ্গন করেন?

আমরা এ জগতে মায়াজ্ঞানে অভিভূত বলিয়া পরব্রহ্ম বুঝিতে অক্ষম। সেজন্য আমরা অনন্যগতি হইয়া নিজ মায়াময় মনের আদর্শে পরব্রহ্মের স্থলে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহাকেই ডাকিয়া থাকি। বস্তুতঃ তোমার ঈশ্বরে ও পরব্রহ্মে বিস্তর প্রভেদ। তোমার ঈশ্বর তোমার নিকট, তোমার মায়াময় মনের অভিমত কতকগুলি শ্রেষ্ঠগুণে বিভূষিত, অর্থাৎ মায়াগুণে গুণান্বিত। কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম, তিনি মায়াতীত, গুণাতীত ও মায়াগুণে নির্লিপ্ত; তিনি তোমার মায়াময় মনের কদাচ ভাব্য নন। তিনি জগতের চিৎশক্তির আধার এবং ইহার উপাদান সমষ্টি; তাঁহারই একাংশ, স্থূলসূক্ষ্ম জগতের উপাদান সমষ্টি, তাঁহারই অপরাংশ চিৎশক্তিযোগে বিবর্দ্ধিত ও বিকশিত। তিনি নিরুপাধি বা উপাধিশূন্য; অধ্যাত্ম জগৎস্থ দেবগণই তাঁহার চিৎশক্তির উপাধি এবং স্থূলসূক্ষ্ম জগতের উপাদানসমুচ্চয় তাঁহার অপরাংশের উপাধি। অদ্বৈতবাদিমতে সাংখ্যকারদিগের মূলপ্রকৃতি ও পুরুষ, পৌরাণিকদিগের প্রধান ও পুরুষ, বৈজ্ঞানিকদিগের জড় ও শক্তি, সেই নিরুপাধি ব্রহ্মের উপাধি মাত্র এবং ব্রহ্ম ও বিশ্ব এক পদার্থ। কিন্তু দ্বৈতবাদিমতে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বর্গের একদেশবাসী বা জগতের অন্তরালবাসী এবং উপাদান ও নির্ম্মাতা, বা বিশ্ব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন পদার্থ। খৃষ্টাদি ধর্ম্ম ঈশ্বরকে কেবল দ্বৈতভাবে দেখিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে মহৎভ্রমে পতিত। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই যে, ইহা ঈশ্বরকে সকলভাবে দেখে, অদ্বৈতভাবে যেরূপ দেখে, দ্বৈতভাবেও সেইরূপ দেখে। এজন্য পরব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশে এ ধর্ম্ম অনান্য ধর্ম্মাপেক্ষা এত অধিক অগ্রসর।

ঈশ্বরের স্বরূপনির্দ্দেশে পাশ্চাত্য জগৎ মহৎ বিভ্রাটে পতিত। তাঁহারা অসম্পূর্ণ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন মানবমনের অসম্পূর্ণ ও বিরুদ্ধ গুণাবলি ঈশ্বরে আরোপিত করিয়া পরব্রহ্মের প্রকৃত অবমাননা করেন। তাঁহাদের ঈশ্বর তাঁহাদের নিকট সর্ব্বশক্তিমান অথচ মঙ্গলময়, দয়াময় অথচ ন্যায়বান। এইরূপে মানবমনের বিরুদ্ধগুণাবলি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি একপ্রকার বিদ্রূপ করেন। তাঁহাদের মহৎ ভ্রমবশতঃ তাঁহাদেরই পূজ্যতম আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞান এখন তাঁহাদের সেই ঈশ্বরের স্বরূপ অস্তিত্ব প্রকাশ্যভাবে খণ্ডন করে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত

এই যে, এ ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ মানবের কতকগুলি অসম্পূর্ণ গুণ পরব্রহ্মে আরোপ করিয়া তাঁহার অবমাননা করে না। হিন্দুর নিকট এ জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামহিম, তাহাই ব্রহ্মের বিভূতিজ্ঞানে চিরদিন পূজিত।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজাংশসম্ভবম্। গীতা।

"এ সংসারে যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাববলে শ্রেষ্ঠ, তাহাই আমার তেজাংশে জাত জানিবে।"

এ কারণ হিন্দুধর্ম্ম লোকশিক্ষার জন্য অলৌকিকগুণসম্পন্ন মানবকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা করে এবং তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট আদর্শ স্বরূপ দেখায়। যে স্থলে খৃষ্টাদি ধর্ম্ম লোক শিক্ষার জন্য অসম্পূর্ণ মানবগুণ অনন্তগুণিত করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করে, সে স্থলে হিন্দুধর্ম্ম লোকবিশেষে অসাধারণ গুণের বিকাশদর্শনে তাঁহার গুণরাশি সম্যক প্রকাশ করতঃ সাধারণের নিকট তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া দেখায়। এ স্থলে সমাজের মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম্ম যে পথ দেখিতে পায়, সে ধর্ম্ম সেই পথে সকলকে চালায়। এ স্থলে সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক বটে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, ইহার প্রদর্শিত পথটী সহজ ও সুগম।

সেইরূপ যে স্থলে নিরাকারবাদী খৃষ্টাদি ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ মানবমনের কতকগুলি অসম্পূর্ণ গুণাবলি লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্ত্তি নিজ মনের আদর্শে নির্ম্মাণ করে ও তাঁহাকে মনোগ্রাহ্য করে, সে স্থলে সাকারবাদী হিন্দুধর্ম্ম জড়জগতের কতকগুলি মনোরম বস্তু লইয়া ঈশ্বরের সাকারমূর্ত্তি নিজ শরীরের আদর্শে নির্ম্মাণ করে ও তাঁহাকে সম্যক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে। এ স্থলেও সমাজের মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম্ম যে পথ বুঝিতে পারে, সে ধর্ম্ম সেই পথে সকলকে লইয়া যায়। এ স্থলেও সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক বটে; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, ইহার প্রদর্শিত পথটী সকলের নিকট সহজ ও সুগম।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত, পাশ্চাত্যজগতে প্রকৃতি দ্বিগুণাত্মিকা, মঙ্গলের রাজা ঈশ্বর ও অমঙ্গলের রাজা সয়তান। সয়তান ঈশ্বরের চিরশত্রু ও উভয়ে চিরদিন ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত; পরিশেষে সয়তান ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হয় এবং এই পৃথিবীতে পাপতাপ আনয়নপূর্ব্বক ঈশ্বরের

শান্তিরাজ্য ধ্বংস করে। বোধ হয়, সয়তানের ভয়ে ঈশ্বর বেচারি চিরদিন ভীত ও ত্রস্ত। সংসারের অমঙ্গলরাশি অধিক; সুতরাং সয়তান ঈশ্বর অপেক্ষা অনেক স্থলে অধিক বলবান ও ক্ষমতাশালী। জগতে ধর্ম্মই পরিশেষে জয়লাভ করে; ইহাতে বোধ হয় ঈশ্বর বেচারি দীন হীন ধার্ম্মিকের ন্যায় অতি সন্তর্পণে ও অতি সাবধানে চলেন, তাহাতেই তিনি পরিশেষে জয়লাভ করেন। বোধ হয়, সয়তানের দুষ্কর্ম্মবশতঃ ঈশ্বর বেচারির শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, আরাম নাই; চিরদিনই তিনি সয়তানকে পরাস্ত করিবার জন্য অশেষ চিন্তায় চিন্তিত। * যাহা হউক, সয়তানের অস্তিত্ব মানাতে পাশ্চাত্যজগৎ ঈশ্বরের যে কিরূপ অবমাননা করে, তাহা এ স্থলে বর্ণনাতীত।

অপরপক্ষে প্রাচ্যজগৎ (হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম), এ বিষয়ে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপ বিভ্রাটে পতিত হয় নাই। বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ পরব্রহ্ম মায়াতীত ও গুণাতীত; মায়ার ত্রিগুণবশতই এ সংসার এমন মঙ্গলামঙ্গলে পূর্ণ; পরব্রহ্মের সহিত এ সকল মঙ্গলামঙ্গলের কিছুমাত্র সংস্রব বা সম্বন্ধ নাই।

> নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ
> অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। গীতা।

"ঈশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। সকলে মায়াজ্ঞানে অভিভূত, তজ্জন্য তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে মোহান্ধ।"

যাহা হউক, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরব্রহ্মসম্বন্ধে যে সকল মহা সত্য প্রকাশ করে, তাহা ধর্ম্মজগতের অমূল্যনিধি। জ্ঞানশক্তি থাকে, স্বধর্ম্মের ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া জ্ঞানশক্তি চরিতার্থ কর। বোধশক্তি থাকে, স্বধর্ম্মোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া মানবজন্ম সার্থক কর। এখন দেখ, তোমার হেয়, অপদার্থ, পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম জগতে কতদূর শ্রেষ্ঠ! কি পরিতাপের বিষয়! লোকে এখন স্বধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষম!

হিন্দুধর্ম্মে যে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর পরব্রহ্মের মায়াময় ত্রিমূর্ত্তি দেখা যায়, ইহা-

* এ স্থলে পাঠকবর্গ আমাদিগকে মাপ করিবেন. খৃষ্টধর্ম্মের দোষ দেখাইবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি ঐরূপ ব্যঙ্গোক্তি করা হইল।

য়াও কি সত্য ? পরব্রহ্ম যেমন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য, ইহার মায়াশক্তি এবং মায়ার ত্রিগুণও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য। খৃষ্টাদি একদেশদর্শী ধর্ম্ম ইহাদিগকে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া ইহারা যে মিথ্যা, তাহা কদাচ হইতে পারে না। মায়াতীত পরব্রহ্ম ইহার আত্মাশক্তি মায়াযোগে এ সংসারে বর্দ্ধিত ও বিবর্ত্তিত। মায়াশক্তি আবার ইহার ত্রিগুণানুসারে ত্রিশক্তিতে বিভক্ত। সৃষ্টি-স্থিতিসংহার এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই সংসারের চরমাস্থ ও প্রধান ক্রিয়া। এই ত্রিবিধ ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া জগতে আর নাই। এই ত্রিবিধ ক্রিয়া-সাধনে পরব্রহ্মের বা মায়ার ত্রিশক্তি সদা নিযুক্ত। তন্মধ্যে জগতের সৃষ্টিতে পরব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি, ইহার পালনে তাঁহার স্থিতিশক্তি ও ইহার বিনাশে তাঁহার সংহারশক্তি নিযুক্ত। আবার ইহার সৃষ্টিতে মায়ার রজোগুণ, ইহার পালনে মায়ার সত্বগুণ ও ইহার বিনাশে মায়ার তমোগুণ প্রকাশিত। অতএব রজঃ-প্রধান, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পরব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তির প্রতিনিধি, অথবা যে সকল দৈবশক্তি বা দেবতা সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত, উহাদের সমষ্টিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা; সত্বপ্রধান পালনকর্ত্তা বিষ্ণু পরব্রহ্মের স্থিতিশক্তির প্রতিনিধি, অথবা যে সকল দৈবশক্তি বা দেবতা বিশ্বপালনে নিযুক্ত, উহাদের সমষ্টিই পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; সেইরূপ তমঃপ্রধান সংহারকর্ত্তা শিব পরব্রহ্মের সংহারশক্তির প্রতি-নিধি, অথবা যে সকল দৈবশক্তি বা দেবতা সংহারক্রিয়ায় নিযুক্ত, উহাদের সমষ্টিই সংহারকর্ত্তা শিব। উপরোক্ত ত্রিশক্তির কার্য্যবশতঃ সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম মায়াতীত পরব্রহ্মকে মায়াময় ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত করিয়া মায়াময় মানব-মনের ধেয় করে। একেশ্বরবাদিগণ উপরোক্ত ত্রিশক্তির ক্রিয়া একাধারে একেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত বটে; কিন্তু তাঁহারা ঐশ্বরিক গুণপ্রকাশে সময়ে সময়ে মহৎ বিভ্রাটে পতিত।

সকল ধর্ম্মেই ত্রিমূর্ত্তি দেখা যায় যথা :—

হিন্দুধর্ম্ম	ব্রহ্মা,	বিষ্ণু ও	মহেশ্বর।
খৃষ্টধর্ম্ম	পিতা-পরমেশ্বর,	পুত্র-পরমেশ্বর	ও কপোতেশ্বর।
	God The Father,	God The Son	Holy Ghost.
বৌদ্ধধর্ম্ম	বুদ্ধ,	ধর্ম্ম	ও সঙ্ঘ।

প্রকৃতি ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত।

প্রকৃতি	পুরুষ	ও	বিশ্ব।
মাতা	পিতা	ও	পুত্র।
শব্দব্রহ্ম	পরব্রহ্ম	ও	বিরাজ।

মানবদেহ ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত।

স্থূলশরীর,	লিঙ্গশরীর,	ও	সূক্ষ্মশরীর।
দেহ	মন	ও	আত্মা।

অতএব পরব্রহ্মও এ জগতে ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত।

The Deity is one, because it is infinite. It is triple, because it is ever manifesting.

Secret Doctrine.

"পরব্রহ্ম অনন্ত, এজন্য তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং, তিনি সদা প্রকাশমান ও পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য তিনি ত্রিমূর্ত্তিধারী।"

প্রত্যেক ধর্ম্ম নিজ নিজ উপাস্য ত্রিমূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করে। কিন্তু যখন ত্রিমূর্ত্তি সকল ধর্ম্মে দেখা যায়, তখন ইহা যে জগতের অবিনাশি মহাসত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তিও পরব্রহ্মের ন্যায় জগতের মহাসত্য।

এস্থলে একেশ্বরবাদী বলেন, এ জগতে এক ঈশ্বর সত্য, তদ্ভিন্ন সকল দেবতাই অলীক; অতএব হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তিও অলীক। যিনি প্রকৃত হিন্দু, তিনি প্রত্যুত্তর দেন, এ জগতে যেমন পরব্রহ্ম সত্য, তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ দেবগণ ও তেমনি সত্য; অতএব ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না। পাশ্চাত্যজগতের ঈশ্বর ও সয়তান যেরূপ সত্য, প্রাচ্যজগতের ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরও সেইরূপ সত্য। যেমন পাশ্চাত্যজগতে লোকে ঈশ্বর ও সয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া উহাদিগকে জীবন্ত ও জাগ্রত জ্ঞানে সত্য ভাবে; সেইরূপ প্রাচ্য জগতেও লোকে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া উহাদিগকে জীবন্ত ও জাগ্রত জ্ঞানে সত্য ভাবে। কিন্তু যথার্থ বলিতে কি, এই পাঁচরূপ সেই মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়ারূপ মাত্র, অথচ ইহারা এই মায়াময়সংসারে মায়ামুগ্ধ মানবমনের নিকট মহাসত্য।

যাহা হউক, খৃষ্টানদিগের ঈশ্বর ও সয়তান তাঁহাদিগের নিকট যেরূপ সত্য, আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আমাদের নিকটও সেইরূপ সত্য। তাঁহাদের ঈশ্বর তাঁহাদের নিকট যেরূপ সত্য, আমাদের পরব্রহ্ম সকলের নিকট তদপেক্ষা অধিক সত্য। তাঁহাদের সয়তান যদি আমাদের নিকট মিথ্যা হয়, আমাদের ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরও তাঁহাদের নিকট মিথ্যা। যদি একজন খৃষ্টান বলেন, আমাদের ঈশ্বর ও সয়তান সত্য, আর তোমাদের ত্রিমূর্ত্তি মিথ্যা, তখন আমরা সাহঙ্কারে ও সগর্ব্বে বলিব, আমাদের পরব্রহ্ম ও ইহার ত্রিমূর্ত্তি সত্য, আর তোমাদের ঈশ্বর ও সয়তান কল্পনাপ্রসূত। যদি খৃষ্টান বলেন, এ জগতে সকলেই ঈশ্বর মানেন, ঈশ্বর কদাচ মিথ্যা হইবার নয়; তখন আমরা প্রত্যুত্তর দিব, লোকে মায়াতীত পরব্রহ্ম বুঝিতে পারে না বলিয়া ইহার পরিবর্ত্তে ঈশ্বর মানে এবং ত্রিমূর্ত্তিও সকল ধর্ম্মে দেখা যায়, তবে ইহাও কদাচ মিথ্যা হইবার নয়।

ধর্ম্মজগতে বিশ্বাস সকল বিষয়ের মূলাধার। অন্ধ বিশ্বাসই চিরদিন ধর্ম্মজগৎ চালিত করে। যাঁহার মনের যেরূপ বিশ্বাস, তিনি তদনুসারে চালিত। ইহাতে তোমারও কথা খাটে না, আমারও কথা খাটে না। লোকে বৃথা ধর্ম্মের মতামত লইয়া বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত। যথার্থ বলিতে কি, সকলেই এক পথের পথিক এবং এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তৎপর; কেবল মাত্র তাহারা বিভিন্নমার্গ অবলম্বন করিয়া, গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে চেষ্টা করে।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ।

ঈশ্বরসম্বন্ধে পৃথিবীতে উপরোক্ত দুইটি মত চিরদিন প্রচলিত। এস্থলে ইহাদের গুণাগুণ বিচার করা অত্যাবশ্যক। প্রথম মতটি খৃষ্টান প্রভৃতি নিরাকারবাদিগণের ও দ্বিতীয় মতটি হিন্দু প্রভৃতি সাকারবাদিগণের। দ্বৈতবাদি-দিগের মতে ঈশ্বর বা স্রষ্টা, বিশ্ব বা সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তিনি বিশ্বের অন্তরালে বসিয়া ইচ্ছা ও বুদ্ধিযোগে কতকগুলি উপাদান লইয়া বিশ্ব রচনা করেন। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকাদি লইয়া ঘটাদি প্রস্তুত করে, সেইরূপ ঈশ্বরও কতকগুলি উপাদান লইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহাদের

মতে ঈশ্বরের সহিত বিশ্বের কদাচ তুলনা হইতে পারে না। কোথায় বুদ্ধিবিশিষ্ট, অনন্তগুণান্বিত ও অনন্তজ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বর, আর কোথায় একটা সামান্য হেয়, অপদার্থ, অচেতন জড়পদার্থ! ইহাদের তুলনা কি কদাচ সম্ভব? তাহার সাক্ষ্য দেখ, কোথায় অশেষ কৌশলোদ্ভাবিনী মানব-বুদ্ধি, আর কোথায় সেই বুদ্ধিবিরচিত একটা যৎসামান্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম যন্ত্রবিশেষ! যেমন দেহনিবদ্ধ আত্মা ও স্থূলদেহ, উভয়ই সম্পূর্ণ পৃথক; একটি অবিনশ্বর, অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যস্বরূপ; আর অপরটি নশ্বর, স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সামান্য জড়পদার্থে নির্মিত; সেইরূপ পরমাত্মার সহিত এ স্থূল-জগতের সম্বন্ধও তদনুরূপ। যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এক সামান্য কটাক্ষপাতে এমন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতে পারেন, তাঁহার সহিত কি এই নগণ্য পৃথিবীর একখণ্ড শিলার তুলনা হইতে পারে? অথবা একখণ্ড শিলা দিয়া কি তাঁহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে? যে চৈতন্যময় ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান থাকিয়া ইহাকে এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত ও এমন সামঞ্জস্যে চালান, তাঁহার সহিত কি একটা অচেতন জড়পদার্থের তুলনা হইতে পারে? অতএব একখণ্ড জড়পদার্থকে সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ভাবিয়া পূজা করা কি মূর্খতার কর্ম্ম, কি অজ্ঞতার কর্ম্ম? যাঁহারা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ ঐরূপ পূজা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কতদূর অবমাননা করেন, তাঁহার ঐশীশক্তি কতদূর খর্ব্ব করেন! এ কারণ দ্বৈতবাদিগণ-চিরদিন নিরাকারোপাসক এবং তাঁহারা সাকারোপাসনাকে অপদার্থ পৌত্তলিকতা জ্ঞানে চিরদিন অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন।

অপর পক্ষে যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মে ও বিশ্বে, স্রষ্টায় ও সৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই; একই ব্রহ্ম বর্দ্ধিত হইয়া বা প্রপঞ্চীকৃত হইয়া বিশ্বরূপে পরিণত। তাঁহাদের মতে অনন্ত বিশ্বই পরব্রহ্মের বিরাটরূপ, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই অব্যক্ত, অনির্দ্দিশ্য, নির্গুণ পরব্রহ্মের অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট দেহ। জগতের প্রত্যেক পদার্থে ও প্রত্যেক জীবে পরব্রহ্মের চিৎশক্তির কণা যে কেবল অন্তর্নিহিত, তাহা নহে; জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে ও প্রত্যেক জীবাণুতে যে কেবল ঐশীশক্তির পূর্ণ বিকাশ, তাহা নহে; কিন্তু জগতের প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক জীব সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মের ব্যক্তরূপ বা ব্যক্তমূর্ত্তি। অতএব তাঁহাদের মতে একটা যৎসামান্য

জড়পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করায় কিছুমাত্র দোষ নাই; অথবা যে বস্তুতে, জীবে বা মানবে ঐশীশক্তির অধিক বিকাশ, তাহাকে পরব্রহ্ম ভাবিয়া পূজা করায়ও কিছুমাত্র দোষ নাই। দ্বৈতবাদিগণ আপনাদের বুদ্ধি ভ্রংশ-বশতঃই ভাবেন, এরূপ করাতে পরব্রহ্মের অবমাননা করা হয় ও তাঁহার ঐশীশক্তি খর্ব্ব করা হয়।

এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত,—উপরোক্ত দুই মতের মধ্যে কোন্ মতটি অধিক প্রশস্ত ও যুক্তিসঙ্গত। অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন সংসারে অদ্বৈতবাদ প্রচার করে এবং দ্বৈতবাদকে লৌকিক মত বলিয়া উপেক্ষা করে। ইহার প্রিয়শিষ্য বেদান্তদর্শনও চিরদিন অদ্বৈতবাদেরই সম্যক পোষকতা করে। বিজ্ঞান যেমন লৌকিক ঈশ্বরের উপর খড়্গহস্ত, যে লৌকিক দ্বৈতবাদ হইতে লৌকিক ঈশ্বর উদ্ভূত, তাহার উপরও ইহা তেমনি খড়্গহস্ত।

মানবমনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সচরাচর ভাবিয়া থাকি, মন ও শরীর স্বতন্ত্র বস্তু; মন সূক্ষ্ম ও চৈতন্যময়, আর শরীর স্থূল ও অচেতন। চৈতন্যময় মন বা আত্মা যতদিন জীবদেহে বর্ত্তমান, ততদিন দেহ চৈতন্যময় ও নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত। যে দিন আত্মা শরীর হইতে বিচ্যুত, শরীরও সেই দিন জড়পদার্থের ন্যায় অচেতন। এই লৌকিক বিশ্বাস অনুসরণ করতঃ আমরা সচরাচর ভাবিয়া থাকি, যে স্থূল ও অচেতন জড়জগৎ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ, শরীরস্থ আত্মার ন্যায় ইহারও এক চৈতন্যময় অধিষ্ঠাতা বর্ত্তমান, তিনিই ইহার পরমাত্মা পরমেশ্বর, ইহার স্রষ্টা ও পাতা। যেমন মন শরীর হইতে পৃথক, পরমাত্মাও সেইরূপ জগৎ হইতে পৃথক। অতএব দ্বৈতবাদী ভাবেন, পরম পিতা পরমেশ্বর জগতের অন্তরালে বসিয়া ইহার সৃষ্টি ও পালন করেন এবং তাঁহাকে তিনি স্বীয় মনের প্রকৃতি অনুসারে ভাবিয়া আপনাকে প্রবোধ দেন। এজন্য তাঁহার ঈশ্বর তাঁহার নিকট সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময় ও সর্ব্বমঙ্গলময়।

এখন জিজ্ঞাস্য, মন ও শরীর পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, বস্তুতঃ উহারা কি পৃথক? প্রকৃতি-পুস্তক অধ্যয়ন করিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি জগতে জড় ও শক্তি অবিভাজ্যরূপে সম্মিলিত ও একত্রী-

কৃত; জড় ব্যতীত শক্তির অস্তিত্ব নাই, বিকাশ নাই এবং ইহারা কদাচ পৃথকভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। সেইরূপ জীবদ্দশায় মন ও দেহ অবিভাজ্যরূপে ও অভিন্নভাবে জড়িত ও মিলিত; দেহ ব্যতীত মনের অস্তিত্ব নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, বিকাশ নাই, স্থূল মস্তিষ্কই সূক্ষ্ম মনের যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক হইতেই ইহা উপজাত। অতএব বলা উচিত, বিশ্ব ও ব্রহ্ম অবিভাজ্যরূপে মিলিত ও একত্রীকৃত। যদি বিশ্ব ব্রহ্মের উপাদান সমষ্টি ও ব্রহ্ম বিশ্বের চিৎশক্তির সমষ্টি হয়, উভয়েই পরস্পর অবিভাজ্যরূপে মিলিত ও জড়িত। সুতরাং দ্বৈতবাদ অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ যে অধিক যুক্তিসঙ্গত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আরও দেখ, জগতের যাবতীয় পদার্থ অন্তর্নিহিত শক্তিবলে বিবর্ত্তিত, বিকশিত, পরিবর্ত্তিত ও স্ফুরিত, কদাচ বহির্দ্দেশস্থ চিৎশক্তি ইহাকে বহির্দ্দেশ হইতে পরিচালন করে না; অতএব আমাদের কদাচ ইহা ভাবা উচিত নয়, যে বহির্দ্দেশস্থ বা অন্তরালস্থ ঈশ্বর বহির্দ্দেশ হইতে জগৎ পরিচালন করেন। অতএব যে দ্বৈতবাদী ভাবেন, অন্তরালস্থ ঈশ্বর এ জগৎ সৃষ্টি ও পালন করেন, তিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ নন।

Extracosmic, anthromorphic God is what human Philosophy rejects.—*Secret Doctrine.*

"মানবের প্রকৃততত্ত্বজ্ঞান বহির্দ্দেশস্থ শরীরী ঈশ্বর অস্বীকার করে।"

অধ্যাত্মবিজ্ঞান উপদেশ দেয়, যিনি বর্দ্ধিত হইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত, তিনিই ব্রহ্ম; তিনি ইহার উপাদান সমষ্টি, তিনিই ইহার চিৎশক্তির আধার; তাঁহারই একাংশ বা উপাদান সমষ্টি তাহারই অপরাংশ বা চিৎশক্তি-যোগে বিবর্ত্তিত ও স্ফুরিত। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই; স্থূল বল, সূক্ষ্ম বল, জড় বল, শক্তি বল, জ্ঞান বল, অজ্ঞান বল, সকলই ব্রহ্ম। অতএব ইহার মতে ব্রহ্মে ও বিশ্বে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই এবং অদ্বৈতবাদই জগতের মহাসত্য। বেদান্তদর্শন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জ্যোতি পাইয়া অদ্বৈত-বাদই চিরদিন হিন্দু জগতে প্রচার করে। অদ্বৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মাহা সত্য বলিয়াই হিন্দু আপনাকে "সোঽহম্" এবং তোমাকে "তত্ত্বমসি" বলেন এবং যোগী আপনাকে "হংস" বা "অহংস" বলেন। অদ্বৈতবাদ

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহা সত্য বলিয়াই, হিন্দু যে স্থলে ঐশীশক্তির অধিক বিকাশ দেখেন, সেই স্থলেই তিনি ভক্তিভাবে প্রণত হন; যে মানবে ঐশীশক্তির অধিক বিকাশ দেখেন, তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে তিনি নিজ জীবনের আদর্শ করেন। অদ্বৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য বলিয়াই হিন্দু একখণ্ড শিলাকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করুন বা মৃত্তিকাদি লইয়া তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা করুন, কিছুতেই তিনি দোষের ভাগী হন না। ইহাতে নিরাকারবাদিগণ যতই কেন তাঁহার উপর উপহাস বা বিদ্রূপ করুন না, তিনি তাঁহাদের কথায় দৃক্পাত করেন না; কারণ তিনি বেশ জানেন যে তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা সত্যপথে অধিক অগ্রসর।

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত বলেন, দৃশ্য ও দ্রষ্টা পৃথক হইলেও বস্তুতঃ উহারা এক। দৃশ্যটি দ্রষ্টার চৈতন্যের বিকার বা রূপান্তর মাত্র; অধ্যাস-বশতঃ আমরা উহাদিগকে স্বতন্ত্র দেখি বটে, কিন্তু উহারা এক। যে বৃক্ষটি তুমি দর্শন করিতেছ, উহা তোমার চৈতন্যের রূপান্তর মাত্র; কিন্তু অধ্যাস বশতঃ তুমি উহাকে মন হইতে পৃথক্ দেখ। মায়ামুগ্ধ বলিয়া সকলে ঐরূপ দেখিতে বাধ্য। জগতের যাবতীয় বস্তুর এইরূপ অধ্যাস আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। এই প্রকৃতিসিদ্ধ অধ্যাসবশতঃ আত্মার আমিত্বজ্ঞান বৈশেষিক ও জগতের যাব-তীয় পদার্থের জ্ঞানও উহা হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রকারে আমাদের জ্ঞান জন্মে, আমি যেমন জগৎ হইতে পৃথক, ব্রহ্মও তেমনি বিশ্ব হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই প্রকারে দ্বৈতবাদ জগতে উদ্ভূত; কিন্তু যথার্থ ভাবিতে গেলে ব্রহ্ম ও বিশ্ব এক পদার্থ; উহাদের ভিতর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অতএব অদ্বৈতবাদই জগতের মহাসত্য।

যাহা হউক, অদ্বৈতবাদ সত্য হউক, দ্বৈতবাদ সত্য হউক, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই যে, এ ধর্ম্ম ব্রহ্মকে অদ্বৈত ও দ্বৈত, উভয়ভাবেই দেখে। একজন হিন্দু ঈশ্বরকে দ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া, পরব্রহ্মের সাত্ত্বিক-রূপ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠবাসী ও তাঁহার পূর্ণাবতার শ্রীহরি গোলকবাসী। তিনি ব্রহ্মকে অদ্বৈতভাব দেখেন বলিয়া, অন্তে নির্ব্বাণলাভই তাঁহার ধর্ম্মসাধনার চরমফল এবং জীবদ্দশায় তিনি অপার ভক্তিযোগে তন্ময়ত্বলাভে একান্ত প্রয়াসী।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

পৃথিবীতে এখন দুই প্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত; তন্মধ্যে খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম নিরাকারোপাসক এবং বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম সাকারোপাসক। এই দুই উপাসনা পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্ব্বে, উপাসনার উদ্দেশ্য কি, ইহাতে মানবমনের কি কি উপকার, তদ্বিষয় আলোচনা করা উচিত।

মানবমনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা যাঁহার নিকট কোনরূপ মহোপকারের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাঁহার নিকট আমরা মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর বা যে সকল দেবতা হইতে সংসারের অশেষ ভোগ্য বস্তু লাভ করতঃ আমরা পরমসুখে কালযাপন করি, তাঁহার নিকট বা তাঁহাদের নিকট আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ; মনের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই আমরা তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা বা তাহাদের পূজা ও অর্চ্চনা করি। এস্থলে যাঁহারা নিরাকারোপাসক, তাঁহারা নিজ মনের প্রকৃত্যনুযায়ী কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণাবলি লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ কতকগুলি ভক্তিব্যঞ্জক কথায় তাঁহার আরাধনা করেন; আর যাঁহারা সাকারোপাসক, তাঁহারা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে পূজ্য দেবতাদিগের মনোভিমত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন এবং সংসারের নানা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের আয়োজন করতঃ অপারভক্তির সহিত ঐ সকল নিবেদন করিয়া তাঁহাদের পূজা ও অর্চ্চনা করেন। এস্থলে উভয়েই নিজ মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু যিনি সামান্য কথা অপেক্ষা কার্য্যতঃ কৃতজ্ঞতা দেখান, তাঁহারই কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ প্রশংসনীয়। যাহা হউক, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশই উপাসনা বা পূজার প্রথম উদ্দেশ্য।

মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনই উপাসনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। যে মানব সংসারে চতুর্দ্দিকে অশেষ পাপতাপের মধ্যে অবস্থিত, যাঁহার দুর্ব্বল মন সদা পাপপ্রলোভনে প্রলোভিত ও সংসারের বিবিধ জ্বালা ও যন্ত্রণায় প্রপীড়িত, তিনি মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া নিজ মনকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান

করেন ও সংসারের পাপতাপের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। যিনি নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি এ বিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য, আর যিনি ঈশ্বরের সাকার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করতঃ শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সদা তাঁহাকে স্মরণ করেন, তিনিও সেইরূপ কৃতকার্য্য। নিরাকারোপাসনা দ্বারা ভক্তি প্রভৃতি মনের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির যেরূপ উন্নতি সাধিত, সাকারোপাসনা দ্বারাও উহাদের সেইরূপ উন্নতি সাধিত। কিন্তু কার্য্যতঃ সাকারোপাসনা দ্বারা এ বিষয়ে অধিক ফললাভ করা যায়।

যে সমাজে বসবাস করিয়া মানব এতদূর উন্নতিসাধনে সমর্থ, সেই সমাজের বন্ধনই উপাসনার তৃতীয় উদ্দেশ্য। পাঁচজনে ধর্ম্মমন্দিরে একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিলে, যেমন দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের মনে ধর্ম্মভাব সম্যক স্ফুরিত হয়, তেমনি ইহাতে সমাজও প্রকৃষ্টরূপ আবদ্ধ হয়। যে স্থলে খৃষ্টাদি নিরাকারবাদী ধর্ম্ম সপ্তাহে সপ্তাহে স্বসেবকদিগকে গির্জ্জাদিতে একত্রিত করতঃ ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনাদি করাইয়া উহাদের মনে ধর্ম্মভাব প্রকটিত করে এবং স্বসমাজকেও ভালরূপ বন্ধন করে; সেস্থলে হিন্দু প্রভৃতি সাকারবাদীধর্ম্ম বৎসরের মধ্যে সময়ে সময়ে পুরোহিত দ্বারা সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করাইয়া লোকের ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধন করে এবং সেই সঙ্গে স্বসমাজকেও দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। অতএব উভয়প্রথার উদ্দেশ্য এক।

কেহ কেহ মনে করেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিলে তাঁহার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় এবং তিনিও অনেক সময়ে আমাদের উপর সকরুণ দৃষ্টিপাত করেন; অতএব তাঁহার উপাসনা করা আমাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর যাঁহারা ভাবেন, ঈশ্বর অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাবলি দ্বারা জগৎ পালন করেন, তিনি সামান্য মানবের চাটুবাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি সদয় হন না, তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; দিবারাত্র তাঁহার প্রিয়কার্য্য কর ও ধর্ম্মপথে বিচরণ কর, ইহাতে সামান্য কথার উপাসনা অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু উপাসনার যে তিনটি মহৎ উদ্দেশ্য উপরে বর্ণিত, তাহাতে ইহা যে সংসারে একান্ত আবশ্যক, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য বটে, ঈশ্বর আমাদের

উপাসনা চান না, আমরাই কেবল আমাদের মনের উন্নতির জন্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি।

আবার কেহ কেহ বলেন, যখন ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন ও গুণানুবাদ করাই উপাসনার মহৎ উদ্দেশ্য, তখন সামান্য কথায় তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিবার কি প্রয়োজন? প্রকৃতিজগতে তাঁহাকে যথার্থভাবে অন্বেষণ কর এবং কোথায় তাঁহার কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল ও মহিমা প্রকাশিত, তাহারই সন্ধান লও, ইহাই তোমার প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা। এজন্য তাঁহারা বলেন,—

To write an Anatomy is offering the best hymn to God.

"একখানি শারীরস্থান পুস্তক লেখাই ঈশ্বরের যথার্থ স্তুতিবাদ।" কিন্তু উপাসনার যে তিনটি মহৎ উদ্দেশ্য উপরে বর্ণিত, তাহাতে আমরা সাকার বা নিরাকার ঈশ্বরের সাধারণপ্রচলিত উপাসনা ব্যতীত ইহার কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি না। অতএব এতকাল যে সকল উপাসনা-পদ্ধতি মানবসমাজে প্রচলিত, তাহাই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মানবমনের প্রকৃত উন্নতিসাধনের জন্য দুই প্রকার উপাসনাপদ্ধতি উপদেশ দেয়। তন্মধ্যে সগুণ সাকারোপাসনা জন-সাধারণের জন্য, আর নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা প্রকৃত জ্ঞানিব্যক্তিদিগের জন্য বিহিত। প্রথমটি দ্বিতীয়টির সোপানস্বরূপ বা পথদর্শকমাত্র। প্রথমে সাকার দেবদেবীর পূজার্চ্চনা দ্বারা তুমি নিজ মনে অপার ভক্তি ও প্রেমের স্ফুরণ কর, অথবা নিজ মনকে ক্রমশঃ সুসমাহিত ও একাগ্রচিত্ত কর, তবে তুমি বহুদিবসান্তে নির্গুণব্রহ্মোপাসনাপথে পদার্পণ করিতে যোগ্য হও। এই অপকৃষ্ট কলিযুগে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার পথ তোমার নিকট কণ্টকাবৃত ও দুর্লঙ্ঘ্যপর্ব্বতাকীর্ণ; মনে করিলেই যে তুমি এ পথে বিচরণ করিতে পার, এমন নহে; ইহা তোমার পক্ষে এখন একরূপ অসাধ্য। তোমার শরীর ও মনের স্থূলত্ব এখন যেমন পরিবর্দ্ধিত, তোমার আত্মার আধ্যাত্মিকতা সেইরূপ অপগত; তুমি এখন সংসারের অনন্তচিন্তায় যেরূপ প্রপীড়িত, তুমি কামাদিরিপুর তেমনি বশীভূত; তোমার পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা কেবল

বিড়ম্বনা মাত্র। এজন্য তোমার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, তোমার অশেষ মঙ্গলের জন্যই সাকার দেবদেবীর পূজা বিধিবদ্ধ করে এবং ইহা দ্বারাই তোমার চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ একাগ্র করিতে চেষ্টা পায় ও অনন্ত-ভক্তির উদয় দ্বারা ইহাকে ঈশ্বরের তন্ময়ত্বলাভে সাহায্য করে।

হিন্দুধর্ম্মের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা জগতে অতুলনীয়। ইহা দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক স্ফূর্ত্তি যেরূপ হয়, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। ইহার সহিত তুলনা করিলে, আধুনিক সভ্যযুগের নিরাকারোপাসনা সর্ব্বথা অসার ও অপদার্থ বলিয়া বোধ হয়। মায়াতীত ও গুণাতীত পরব্রহ্ম দুই প্রকারে জানা যায়, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ দ্বারা; তন্মধ্যে যখন যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ সমাধিবলে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে বুদ্ধির সহিত মূলপ্রকৃতিতে লীন করতঃ জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযোজিত করেন, তখন তাঁহারা পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রকৃতরূপ ব্রহ্মদর্শন করেন এবং তাঁহাদেরই আত্মায় অষ্টসিদ্ধি স্ফুরিত হয়। তাঁহারাই যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন হন। এখন এরূপ যোগসাধন কিরূপ দুঃসাধ্য!

আজকাল পরমহংসগণ সাধনবলে পরব্রহ্মের তটস্থ বা বাহ্যলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হন। যুগধর্ম্মানুসারে যদবধি মানবের তৃতীয় নয়ন অপগত, তদবধি তাঁহার সহজাত যোগবল লুপ্তপ্রায় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রহ্মদর্শনক্ষমতাও প্রণষ্ট। এখন এই কলিযুগে পরমহংসগণ ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি সংযম করতঃ ব্রহ্মে সুসমাহিতচিত্ত হইয়া ধ্যানাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনোপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করেন। তাঁহারা অঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম, ব্রহ্মমন্ত্র জপ, ধ্যানধারণা, মানসপূজা, ব্রহ্মস্তোত্র-পাঠ ও শ্রবণ, ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মার্পণ দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে সংসারে অবস্থিতি করেন। কলিযুগে তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারাই জনসাধারণ অপেক্ষা ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর; তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিকতা সমধিক স্ফুরিত।

অন্যান্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তিত নিরাকারোপাসনাপদ্ধতিকে হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করে। ইহার মতে ঐ প্রকার নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা বা আরাধনা কেবল অসার ও শূন্যগর্ভ। "অন্ধকার হইতে আলোকে

লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও," "Glory to thee, thy Kingdom is come" ইত্যাদি কতকগুলি অসার বাক্যসমুচ্চয় ঈশ্বরোদ্দেশে উচ্চারণ করিলে, মনের কি উন্নতিসাধন হয়? চঞ্চলমনের যে একাগ্রতালাভ ও বৈরাগ্যাবলম্বন দ্বারা জীবাত্মার অশেষ উন্নতি, ঐরূপ অসার উপাসনা দ্বারা মনের কি সেই একাগ্রতা ও বৈরাগ্য লাভ করা যায়? ঐ সকল বাক্য মুখ হইতে যেমন নিঃসৃত, তেমনি উহারা আকাশে বিলীন; মনের উপর উহাদের কোনরূপ স্থায়িচিহ্ন থাকে না। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম নিরাকারোপাসনাকে অসার ভাবিয়া মানবমনের প্রকৃত একাগ্রতা স্থাপনের জন্য হরির মোহনমূর্ত্তি সকলের সমক্ষে ধারণ করে এবং যোগসাধনার প্রথম সোপান জপপ্রাণায়ামাদি দেবারাধনায় ভালরূপ উপদেশ দেয়। ইহাতেই মন ক্রমশঃ একাগ্রতা ও বৈরাগ্য লাভ করে ও ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হয়।

নিরাকারোপাসনা যে কেবল অসার, তাহা নহে; ইহা অনেক সময়ে জনসাধারণের নিকট অতীব ক্লেশকর। যখন তুমি যথার্থরূপে নিরাকার ঈশ্বরের রূপ ধ্যান করিতে যাও, তখন তুমি মনোমধ্যে বিরাটশূন্য দর্শনে ব্যথিতচিত্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হও, তখন তুমি হৃদয়স্থ গাঢ়ান্ধকার দর্শনে অস্থিরচিত্ত হও। হৃদয়ের সেই গাঢ়ান্ধকার দূর করতঃ তোমার মনকে সুস্থির করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম তোমার হৃদয়মন্দিরে হরির মোহনমূর্ত্তি স্থাপন করে এবং তুমিও সেই মূর্ত্তি মন্দিরে ভক্তিভাবে দর্শন করিয়া, অথবা উহাকে মনের গভীরতম প্রদেশে সদা ধ্যান করিয়া একাগ্রচিত্ত হইতে সচেষ্ট হও। অতএব বলা উচিত, জনসাধারণের সুবিধার জন্য, সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য এ ধর্ম্ম দেবদেবীর আরাধনা বিধিবদ্ধ করে। ইহাই এখন সকলের পক্ষে সহজ ও সুগম।

হিন্দুধর্ম্মোপদিষ্ট নির্গুণব্রহ্মোপাসনা যে সাধনার পরাকাষ্ঠা, ইহা যে এ সংসারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনাপদ্ধতি, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার সহিত কোন ধর্ম্মের কোনরূপ উপাসনাপদ্ধতির তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা গৃহস্থাশ্রমের জন্য উপযুক্ত নয়। অতএব যে স্থলে অন্যান্য ধর্ম্ম অসার নিরাকারোপাসনা প্রবর্ত্তিত করে, সে স্থলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সাধারণ

মানবমনের প্রকৃত উন্নতিসাধনের জন্য সাকারোপাসনা বিধিবদ্ধ করে। এখন কৃতবিদ্য অনেকের বিশ্বাস যে, সাকারোপাসনা অপেক্ষা নিরাকারোপাসনা অধিক যুক্তিসঙ্গত ও অধিক উন্নত। তাঁহারা ভাবেন, যে উপাসনা দ্বারা সভ্যদেশ মাত্রেই অধিক উপকৃত এবং যাহা এখন সকল সভ্যদেশেই প্রচলিত, তাহাই নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠপদ্ধতি। সত্য বটে, যিনি নির্জ্জনে ও নিভৃতে নিরাকার ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক তদ্গতচিত্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার আরাধনা করেন এবং সংসারের অশেষ পাপের প্রলোভনের মধ্যে অতি সামান্য দুষ্কর্ম্ম করিলেই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া মনঃসংযমার্থ নিয়ত ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করেন, তিনি ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর হন; কিন্তু সংসারের কয়জন ব্যক্তি ঈশ্বরকে ঐরূপ ভাবে ভাবিয়া বা উপাসনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হন? অজ্ঞ জনসাধারণ কি নিরাকার ঈশ্বর ভালরূপ বুঝিতে পারে? তাহারা কি নিরাকারোপাসনা দ্বারা ধর্ম্মপথে পশ্চাৎপদ হয় না? উহাদেরই অশেষ মঙ্গলের জন্য হিন্দুধর্ম্ম সাকারোপাসনা বিধিবদ্ধ করে।

এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য আরও বিশদরূপে ব্যাখান করা আবশ্যক। মানবমন এতদূর অসম্পূর্ণ যে, ইহার দ্বারস্বরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত ইহা কোন বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। সত্য বটে, শিক্ষাবলে, অনুচিন্তনবলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত আমরা বস্তুবিশেষ ভাবিতে পারি অথবা উহার গুণগ্রাম প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু সেরূপ ভাবনা অনেক সময়ে কার্য্যকর হয় না এবং ইহাতে আমরা প্রকৃত তৃপ্তিবোধ করিতে পারি না। অসম্পূর্ণ মনের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য প্রত্যেক বিষয়কে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করা একান্ত আবশ্যক। ভূমণ্ডলের সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য, ছাত্রগণ কেন মানচিত্র দেখিয়া ভূগোল পাঠ করে? যেমন সুবিশাল ভূমণ্ডল সামান্য মানচিত্রে অঙ্কিত হওয়ায় ইহা তাহাদের প্রকৃতরূপ আয়ত্ত হয়; সেইরূপ অনন্তব্রহ্মকে সসীম সাকারে পরিণত করিয়া দেখিলে অনন্তব্রহ্ম অতিসহজে মানবের স্থূলমনের সম্যক আয়ত্ত হয়। সত্য বটে, অনুচিন্তন-বলে, শিক্ষাবলে, অভ্যাসবলে, তুমি নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকার মনের প্রকৃত্যনুযায়ী ভাবিতে পার, অথবা কতকগুলি ভক্তিব্যঞ্জক বাক্য সমন্বয় করিয়া তাঁহার অনন্তগুণগ্রাম কীর্ত্তন করতঃ উপাসনা করিতে পার; কিন্তু

ঈশ্বরকে এইরূপ অসম্পূর্ণ ভাবে ভাবাতে, যিনি তাঁহার প্রকৃত ভক্ত, তিনি কি প্রকৃত তৃপ্তিবোধ করেন ?

অনন্তব্রহ্মকে যথার্থরূপে ভাবিতে চাও, তবে অনন্তব্রহ্মের সঙ্গে অনন্ত বিশ্বকে ভাব। অনন্ত মহাশক্তিকে দেখিতে চাও, তবে অনন্তবৈচিত্র্যবিশিষ্ট, অনন্তগুণোদ্ভাসিত বিশ্বকে দেখ। অনন্ত বিশ্বকে লইয়া মানবের সান্তবুদ্ধি কি করিবে, বল ? তাঁহার সসীমবুদ্ধি অনন্তবিশ্বের ধারণায় সর্ব্বথা অসমর্থ; ধারণা করিতে চেষ্টা পায়, তবে ইহা পদে পদে বিঘূর্ণিত হয়। তবে অনন্ত বিশ্বের কথা ছাড়িয়া দেও। এখন অনন্ত বিশ্বের একখণ্ড লইয়া ব্রহ্মকে একবার ভাব দেখি, ইহাতেই তোমার মন সুস্থির হয়, ইহাতেই তোমার হর্ষোদ্রেক হয়। যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিরাটরূপ দর্শন করিয়া ব্যথিতচিত্ত হন, তিনি আবার তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুস্থির হন।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ। গীতা।

"হে জনার্দ্দন! এক্ষণে আমি তোমার প্রশান্ত মানবরূপ দর্শন করিয়া প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্নচিত্ত হইলাম।"

অতএব অনন্ত বিশ্বের একখণ্ড লইয়া অনন্ত ব্রহ্মের বিষয় ভাবা উচিত।

যেমন একজন ভূগোলবিৎ পণ্ডিত পৃথিবীর মানচিত্র দর্শনে উহার জ্ঞান নিজবুদ্ধির সম্যক আয়ত্ত করেন; সেইরূপ যিনি ব্রহ্মের প্রকৃতভক্ত, তিনি অনন্ত ব্রহ্মকে স্বীয় সসীম বুদ্ধির অধিগম্য করিবার জন্য তাঁহাকে স্বমূর্ত্তিতে গঠিত করেন; নিজ মনের সন্তোষার্থ তিনি বিশ্বসংসার অন্বেষণ করিয়া মনোভিমত আভরণে সেই ব্রহ্মমূর্ত্তিকে বিভূষিত করেন; ব্রহ্মে প্রগাঢ়ভক্তি-প্রদর্শনার্থ তদীয় মূর্ত্তির চরণারবিন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন বা তাঁহার শ্রীচরণকমলে স্বদেহ বিলুণ্ঠিত করেন। এই প্রকারেই ঈশ্বরের প্রতি মনের প্রগাঢ় ও আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শিত হয়। অতএব ঈশ্বরে প্রগাঢ় ও অপরিসীম ভক্তিপ্রদর্শনার্থ সাকারমূর্ত্তি পূজা একান্ত আবশ্যক।

যে সকল দেবদেবী এতকাল হিন্দুজগতে পূজ্য, যাঁহাদের মোহন বা ভয়াবহমূর্ত্তি শাস্ত্রে বর্ণিত, চিত্রে উদ্ভাসিত ও প্রতিমায় প্রতিফলিত, তাঁহারা কি বাস্তবিক ঐরূপ মূর্ত্তিধারী হইয়া অধ্যাত্মজগতে বর্ত্তমান, না তাঁহারা কবির

কল্পনাপ্রসূত? তাঁহারা যে মূর্ত্তিতে যোগিদিগের মানসপটে উদিত, এখন তাঁহারা কি সেই মূর্ত্তিতে জগতে প্রকাশিত, না শাস্ত্রকারেরা পৃথিবীর কতকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান একত্রিত করতঃ মনের কল্পনানুযায়ী তাঁহাদের অলীক প্রতিমূর্ত্তি গঠন করেন? পদ্মপলাশলোচন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ বিষ্ণু কি আজ কবির কল্পনা? নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, লোলজিহ্বা মহাকালীও কি আজ কবির কল্পনা? রে হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার! এ পাপকথা কদাচ মুখে আনিও না। তোমার জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইবে! তোমার মস্তকোপরি বজ্রপাত হইবে! তুমি কি নিজের অভূতপূর্ব্ববিদ্যার এতদূর আস্ফালন কর, যে অধ্যাত্মজগৎস্থ দেবগণকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিয়া উহাদিগকে বিশ্বাস করিবে? তোমার কি দুর্বুদ্ধি! এ স্থলে যোগেশ্বরপ্রকটিত শাস্ত্রই সকলের একমাত্র প্রমাণ! শাস্ত্র যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহাই তোমার অন্ধ বিশ্বাসের সহিত লওয়া উচিত। যদি শাস্ত্রের কথা অমান্য কর, তুমিই নিজ পাদমূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাক।

জগতের নিয়ম এই, যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া সমাজে চিরবদ্ধমূল, তদ্বিষয়ক সংস্কার বাল্যকাল হইতেই সকলের মন দৃঢ়ভাবে অধিকার করে এবং তাহা অবাস্তব হইলেও সকলের নিকট প্রকৃত বাস্তব। এই যে পাশ্চাত্যজগতে লোকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী সয়তানের অস্তিত্বে এককাল বিশ্বাস করে, তাহাই কি আমাদের নিকট বাস্তব? এই যে তাহারা এতকাল ঈষাকে আপনাদের মুক্তিদাতা জ্ঞান করে, তাহাই কি আমাদের নিকট বাস্তব? তবে আমাদের দেবদেবী কিপ্রকারে তাহাদের নিকট বাস্তব হইতে পারে? তবে কেন তুমি আজ তাহাদের কথাপ্রমাণ স্বধর্ম্মের দেবমণ্ডলীর উপর বীতশ্রদ্ধ বা সন্দিহান? ঐ সকল দেবদেবীর পূজা এতকাল হিন্দুসমাজে চলিত, আজ পর্য্যন্ত কেহ উহাদিগকে কাল্পনিক বলিতে সাহসী হয় নাই। তুমি কেবল আজ বিজাতীয় বিধর্ম্মীদিগের শাস্ত্রপাঠ করিয়া উহাদিগকে কাল্পনিক বলিতে সাহসী। কিন্তু তোমারই মূর্খ প্রপিতামহগণ ঐ সকল দেবদেবীর উপর অচলাভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক হিন্দুনামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়া যান। আজ কেবল কুশিক্ষাবশতঃ তুমি উহাদের উপর এতদূর বীতশ্রদ্ধ! বল দেখি, যদি একজন পাদরিপুঙ্গবকে বলা যায়, ঈষা ঈশ্বরপুত্র

নন, তিনি একজন অসামান্য ধর্ম্মাত্মা মানববিশেষ; তিনি কি তোমার কথা হাসিয়া উড়ান না? তিনি কি তোমার মূর্খতার জন্য দুঃখিত হন না? তবে তুমি কেন আজ পাশ্চাত্যমূর্খদিগের কথা শ্রবণে স্বধর্ম্মের দেবমণ্ডলী অবিশ্বাস কর?

মনে কর, ঐ সকল দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আদৌ কল্পনাপ্রসূত, তাহাতেই বা সমাজের কি ক্ষতি? যখন সমাজস্থ যাবতীয় লোক অতিপুরাকাল হইতে উহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রদর্শন করে, তখন তাহাদের নিকট উহারা কাল্পনিক হইলেও জ্বলন্ত সত্য, অবাস্তব হইলেও প্রকৃত বাস্তব। যে বিশ্বাস লোকপরম্পরায় সমাজে বহুদিন চালিত, তাহাই সকলের আপ্তবাক্য। এই যে অশ্বত্থবৃক্ষটী দর্শন করিয়া, তুমি ইহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া পরিচয় দাও, ইহাও তোমার নৈসর্গিকজ্ঞান নহে, লোকপরম্পরাগত বিশ্বাস মাত্র। সেইরূপ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু যে পরব্রহ্মের মায়ারূপ, তাহাও লোকপরম্পরাগত বিশ্বাস মাত্র। সেইরূপ জনসাধারণের ঈশ্বরজ্ঞানও লোকপরম্পরাগত বিশ্বাসমাত্র। তবে তুমি কেন আজ পাশ্চাত্যমূর্খদিগের কথাশ্রবণে স্বধর্ম্মের দেবমণ্ডলী অবিশ্বাস কর?

আরও দেখ, এই মায়াজগতে আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা আমাদের মায়াজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান; আমরা মিথ্যাজ্ঞান লইয়াই আজীবন মুগ্ধ। তখন বিশ্বের আদিকারণ সেই মায়াতীতপরব্রহ্মের যদি কয়েকটী মায়ারূপ আমরা কল্পনাবলে পার্থিব উপাদানে গঠিত করিয়া উহাদিগকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করি, তাহাতে কি আমাদের মনের উন্নতিসাধন হয় না? ওহে একেশ্বরবাদিগণ! তোমরা আজ আমাদের অশেষপূজ্য দেবমূর্ত্তি দর্শনে নাসিকা সঙ্কুচিত কর বটে; কিন্তু তোমরা যে নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া গগনভেদিরবে চীৎকার কর এবং যে ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তোমরা আজ বিস্ফারিতহৃদয়ে ভাব, "যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং" (স্বর্গের দ্বারদেশ তোমাদের নিকট এখন ভালরূপ উন্মুক্ত), সেই ঈশ্বরের জ্ঞান কি তোমাদের যথার্থজ্ঞান? সেই ঈশ্বরের স্বরূপ তোমরা কল্পনাবলে নিজ মনোমন্দিরে যেরূপ স্থির কর, তাহাই কি মায়াতীত পরব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ? তোমাদের অন্ধবিশ্বাসে সেই ঈশ্বরস্বরূপ তোমাদের

নিকট বাস্তব হইলেও, তোমরা কি প্রকারে জান, যে উহা মায়াজ্ঞান নহে এবং উহাই পরব্রহ্মের বাস্তবরূপ ? তবে কেন তোমরা আমাদের দেব-মূর্ত্তি দর্শনে অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর ? যে কালাগ্নিতে আমাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ, সেই কালাগ্নিতেও তোমাদের তপ্তকাঞ্চনবৎ মুখমণ্ডল আজ পরিদগ্ধ। ভাল-রূপ জান, যে স্থলে তোমরা অসম্পূর্ণ মানবমনের অসম্পূর্ণ গুণাবলি লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্ত্তি গঠন কর, সে স্থলে আমরা জগতের মনোরম বস্তু সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার মনোরম, সাকারমূর্ত্তি গঠন করি। হায়! এখন আমাদের কি দুর্ভাগ্য ! এই প্রকারে লিখিয়া আজ আমাদিগকে স্বধর্ম্মের দেবমণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিতে হইতেছে ? কোথা হে দুর্গতিনাশিনি মাতঃ দুর্গে ! আর আমরা কতকাল সেই অনর্থকরী বিদ্যার মোহে মুগ্ধ থাকিব ?

হে সুশিক্ষিত পাঠক ! যদি তোমার মনে এমন বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, সভ্যদেশোচিত নিরাকারোপাসনা অর্দ্ধসভ্যদেশোচিত সাকারোপাসনা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট, তথাচ স্বধর্ম্মের সাকারোপাসনাকে অবজ্ঞা করিবার কিছু-মাত্র কারণ নাই। তুমি ইহা বেশ জানিবে, স্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত সাকারদেব-দেবীর পূজার মূলে সেই সত্যসনাতন, নিত্যনিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা বা নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা নিহিত। যখন একজন হিন্দু দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহার পূজা করেন, তখন তিনি সেই জড়প্রতিমূর্ত্তিতে ঐশীশক্তি কল্পনা করিয়া তাহাতে হরিহরাদিরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবা-হন করেন এবং প্রতিমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। সত্য: বটে, জড়-মূর্ত্তিটি তাঁহার চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত, কিন্তু তিনি স্বহৃদ্‌পদ্মে বিশ্বাসানুযায়ী ঈশ্বরের রূপ সন্দর্শন করেন। এস্থলে তিনি নিজের অসম্পূর্ণ মনের সুবিধার জন্য নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের একটী স্থূলরূপ কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া অপারভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করেন। অতএব দেব-মূর্ত্তি বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, কাল্পনিক হউক, অকাল্পনিক হউক, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তুমি অনন্য বিশ্বাস ও অনন্য ভক্তির সহিত উহার পূজা কর, ইহাতেই তোমার অশেষ শ্রেয়োলাভ ও অশেষ পুণ্যলাভ। ইহা-তেই তোমার জীবাত্মার অশেষ উন্নতি ও অশেষ মঙ্গললাভ; ইহাতেই তোমার মনের একাগ্রতালাভ ও অশেষ উন্নতি।

শাস্ত্রমতে দেবদেবীর পূজা দ্বিবিধ, বাহ্যিক ও মানসিক। যখন ধর্ম্মাত্মা হিন্দু শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া উহার শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, তখন তিনি স্থূলমূর্ত্তির বাহ্যিক পূজা করেন বটে, কিন্তু সেই সময়েই আবার তিনি মনোমধ্যে কৃষ্ণরূপধারী ঈশ্বরের শ্রীচরণে ভক্তিরূপ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার প্রকৃত মানসিক পূজা করেন। যখন তিনি প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, তখন তিনি নিজ মনোমন্দিরপ্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের সমক্ষে যথার্থ ভক্তিভাবে প্রণত হন। দেবমূর্ত্তি লইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করার নাম বাহ্যিক পূজা; আর দেবমূর্ত্তি না লইয়া মনোমন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ধ্যানধারণাবলে তাঁহার পূজা করার নাম মানসিক পূজা। তন্মধ্যে যে মার্গটী যাঁহার পক্ষে যেমন সুকর, তিনি সেই মার্গে গমন করেন। কিন্তু উভয়প্রকার পূজাপদ্ধতিতে প্রায় একরূপ ফল পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্ম্ম পূজ্য দেবদেবীকে অপার ভক্তির সহিত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে উপদেশ দেয়।

জানুভ্যাঞ্চ তথা পদ্ভ্যাং পাণিভ্যামুরসা ধিয়া
শিরসা বচসা দৃষ্ট্যা প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।

"জানুদ্বয়, পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মন, শির, বাক ও দর্শনদ্বারা যে প্রণাম করা যায়, তাহার নাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।" এমন ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে লোকবর্গকে শিখায়, বল? এমন দেবভক্তির পরাকাষ্ঠা কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে ভাবে, বল?

তুমি অপারভক্তির সহিত দেবমূর্ত্তিকে যে দ্রব্য দিয়া পূজা কর না কেন, তাহাই ঈশ্বরের গ্রহণীয়।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যাপ্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। গীতা।

"যে সেবক যথার্থভক্তিভাবে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই পরমভক্তসেবকের প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করি।"

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ। গীতা।

"যাঁহারা আমার উপর যথার্থ মন সংযোজনপূর্ব্বক নিত্য উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার প্রতি পরমশ্রদ্ধান্বিত এবং তাঁহারাই সংসারে পরম যোগী।"

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ! গীতা।

"দৃঢ়ব্রত হইয়া যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক সদাসর্ব্বদা আমার গুণকীর্ত্তন করেন এবং ভক্তিভাবে আমায় নমস্কার করেন, তাঁহারাই যথার্থ মন সংযম করিয়া আমার উপাসনা করেন।"

অতএব ঈশ্বরের নিরাকারোপাসনা কর অথবা তাঁহার সাকারোপাসনা কর, তাঁহাকে অকপটচিত্তে অনন্যভক্তি ও অনন্যপ্রেমের সহিত পূজা কর, তোমার উপাসনা সার্থক হইবে এবং তোমার আত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন হইবে। যখন হৃদয়ের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি ও উন্নতিসাধন করাই উপাসনা, আরাধনা বা পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন তুমি ঈশ্বরকে যে ভাবে ভাব না কেন, তাঁহার প্রতি অপরিসীম প্রেম ও ভক্তি দেখাও, তোমার মনে প্রেম ও ভক্তি অপরিসীমভাবে স্ফুরিত হইবে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। গীতা।

"যাঁহারা আমাকে যে ভাবে প্রাপ্ত হন্, আমি তাঁহাদিগকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তী।" যিনি ঈশ্বরকে কৃষ্ণভাবে দেখেন, তিনি তাঁহাকে কৃষ্ণভাবে পান; যিনি তাঁহাকে রামভাবে দেখেন, তিনি তাঁহাকে রামভাবে পান; যিনি তাঁহাকে বুদ্ধভাবে দেখেন, তিনি তাঁহাকে বুদ্ধভাবে পান; যিনি তাঁহাকে ঈষাভাবে দেখেন, তিনি তাঁহাকে ঈষাভাবে পান; যিনি তাঁহাকে মহম্মদভাবে দেখেন, তিনি তাঁহাকে মহম্মদভাবে পান; যিনি তাঁহাকে চৈতন্যভাবে দেখেন, তিনি তাঁহাকে চৈতন্যভাবে পান; যিনি যশোদার ন্যায় তাঁহাকে বাৎসল্যভাবে দেখেন, তিনি বাৎসল্যভাবের ফল পান; যিনি অর্জ্জুন ও সুদামের ন্যায় সখ্যভাবে দেখেন, তিনি সখ্যভাবের ফল পান; যিনি তাঁহাকে রাধার ন্যায় প্রেমভাবে দেখেন, তিনি প্রেমভাবের ফল পান। ইহাতে কি বোধ হয় না,

যে সাকার ও নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি একই উদ্দেশ্যসাধন করে এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মই বস্তুতঃ এক পথের পথিক? যেমন স্রোতস্বতীগণ যে স্থল হইতে উদ্ভূত বা নিঃসৃত হউক না কেন, সকলেই একমাত্র লবণাক্ত অম্বুরাশিতে মিলিত ও পতিত; সেইরূপ যাবতীয় মানবধর্ম্ম, উহাদের উপাসনাপদ্ধতি ও মতামত যতই কেন বিভিন্ন হউক না, উহারা যতই কেন বিভিন্নদেশকালজাত হউক না, উহারা সকলেই এক ব্রহ্মের উপাসনা করে এবং তদ্দ্বারা মানবমনের উন্নতিসাধন করিয়া প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে।

তেত্রিশকোটী দেবতা।

যাবতীয় পুরাণাদিগ্রন্থে তেত্রিশকোটী দেবতার কথা উল্লিখিত। এখন জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম্মে তেত্রিশকোটী দেবতা কোথা হইতে আইসে? বেদের তেত্রিশটী দেবতা কি পুরাণাদিতে তেত্রিশকোটীতে পরিণত? ইহারা কি কবির কল্পনা? না সত্য সত্যই ইহারা দেবলোকে বর্ত্তমান? অসভ্যযুগে অশিক্ষিত মানব যে সকল দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আপনার দুর্ব্বল মনকে প্রবোধ দেন, ইহারা কি সেই অসভ্যযুগের কুসংস্কারের ভগ্নাবশেষ? না ইহারা সত্য সত্যই অধ্যাত্মজগতে অবস্থিতিপূর্ব্বক আমাদের সুখদুঃখের নিয়ন্তা?

সভ্যদেশের সুশিক্ষিত একেশ্বরবাদী আজকাল পুরাকালের কাল্পনিক দেবতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না। তিনি ভালরূপ জানেন, অদ্বিতীয় ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা ও পাতা এবং তিনিই আমাদের সুখদুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ঈশ্বর ও দেবতা কাহাকেও মানেন না; তিনি এখন কেবল জড় ও ভৌতিকশক্তির উপাসক। তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস, যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় সর্ব্বৈব অলীক। অতএব দেবতায় তিনি কি প্রকারে বিশ্বাস করেন? পুরাকালে যখন সমগ্র জগৎ ঘোরতমসাচ্ছন্ন, তখনই লোকে দেবতায় বিশ্বাস করিত। আজকাল সভ্যজনপদমাত্রেই দেবগণ সমাজ হইতে বিতাড়িত ও একেশ্বর পূজিত। এখন যে জড়-

বাদী জড়বিজ্ঞান সেই একেশ্বরে বিশ্বাস মন্দীভূত করিতে বিশেষ প্রয়াসী, সে বিজ্ঞান কি প্রকারে পুরাকালের ন্যায় দেবতায় বিশ্বাস করিতে পারে? বিংশ শতাব্দীর এমন উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের মধ্যে কি অসভ্যদেশোচিত দেবতাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যায়? তবে কেন দেবতাদিগের কথা উত্থাপন কর? যাহা বহুদিবস হইতে চলিল এক প্রকার অলীক বলিয়া সপ্রমাণিত ও স্থিরসিদ্ধান্ত, সে সকল উপকথা এখন উত্থাপন করিবার কি প্রয়োজন?

এস্থলে পাশ্চাত্য মূর্খদিগের বা ভ্রান্ত জড়বাদী জড়বিজ্ঞানের কথায় কর্ণপাত করিলে চলিবে না। এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ শিরোধার্য্য করাই কর্ত্তব্য। যে শাস্ত্র যোগেশ্বরপ্রকটিত, তাহারই কথা একমাত্র শ্রবণীয় ও পালনীয়। ওহে ভারতমাতার সুসন্তানগণ! তোমরা এখন যোগেশ্বরদিগের কথা বা ব্রহ্মার সেই অমরপুত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কথা শ্রবণ কর। যাঁহারা যোগবলে, সমাধিবলে, আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরণ করতঃ সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণ দিব্যচক্ষে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই কথায় কর্ণপাত কর। তাঁহারাই জানেন, দেবগণ মহেন্দ্রাদি দেবলোকে বা অন্যান্য সূক্ষ্মজগতে কিরূপে বিরাজমান! আমরা এখন কলিযুগের মানব, আমাদের দেহ যেরূপ স্থূলত্ব প্রাপ্ত, মনও সেইরূপ স্থূলত্বপ্রাপ্ত এবং জীবাত্মাও সেইরূপ অধোগত, আমরা এখন কি প্রকারে দেবগণকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতে পারি?

নতুমাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব চক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

গীতা।

"তুমি আমাকে এই চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতে পার না; আমি তোমায় দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি। সেই দিব্যচক্ষে তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।"

বস্তুতঃ কলিযুগে দেবগণকে এ চর্ম্মচক্ষে দর্শন করা যায় না; সে জন্য কি শাস্ত্রের কথা অমান্য করা উচিত?

এই প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান স্থূলজগতের মূলে সূক্ষ্মজগৎ বা অধ্যাত্মজগৎ বর্ত্তমান, অথবা ইহা অন্যান্য অদৃশ্য সূক্ষ্মজগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। দেবগণ সেই সকল অদৃশ্যলোকে অবস্থিতি করেন এবং তথা হইতে এই স্থূলজগতের যাবতীয়

ব্যাপার অতি পরিপাটীর সহিত, অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালন করেন। তাঁহারাই মায়াতীত পরব্রহ্মের চিৎশক্তির উপাধি বা প্রকাশক এবং তাঁহারই আজ্ঞাবহ দাস। তাঁহারাই স্থূল ও সূক্ষ্ম, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় জগৎ পরিচালন করেন। দিক্‌পালগণ, লোকপালগণ, গ্রহাধিষ্ঠাতৃ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য দেবগণ জগৎ পরিচালন করেন। যে সকল নৈসর্গিক জড়শক্তি আমাদের চতুর্দ্দিকে লীলাময় সংসারক্ষেত্রে অনন্তলীলা ও অনন্ত কেলি প্রদর্শন করে, উহাদেরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বর্ত্তমান। তাঁহারাই সকলে একচিত্ত হইয়া একই উদ্দেশ্য সাধনকরতঃ জগতে সার্ব্বজনিক সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। তাঁহারাই কর্ম্মফলানুসারে আমাদের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা; তাঁহারাই আমাদিগের আধিদৈবিক সুখদুঃখের বিধাতা; এজন্য দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি দৈব ঘটনার প্রকৃত কারণ আমরা নিরূপণ বা নিবারণ করিতে পারি না।

এখন সভ্যদেশের একেশ্বরবাদিগণ মানবমনের প্রকৃত্যনুসারে জগতের যাবতীয় ব্যাপার একেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত; তাঁহারা আর দেবতাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দেয়, যে বিশ্বের অজ্ঞেয় আদিকারণ মায়াতীত পরব্রহ্ম নিরুপাধি এবং দেবতাগণ তাঁহার চিৎশক্তির উপাধি; অতএব পরব্রহ্ম ও দেবতাগণ জগতের অবিনাশি সত্য, আর লৌকিক ঈশ্বর মনঃকল্পিত মাত্র। এ বিষয়ে যোগেশ্বরপ্রকটিত শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, তদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই। আমাদের দেহে ও মনে স্থূলত্বের পূর্ণবিকাশ হওয়ায় আমরা এখন সূক্ষ্মজগতের বিষয় ও সূক্ষ্মজগৎস্থ দেবগণের বিষয় কিছুই অবগত নহি। এখন ভাব দেখি, যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এমন জ্বলন্ত সত্য উপদেশ দেয়, তাহার সহিত কি সে দিনকার খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের তুলনা হইতে পারে? তবে কেন আজকাল অনেকে শিক্ষাদোষে স্বধর্ম্মের দেবমণ্ডলীর উপর এত বীতশ্রদ্ধ?

ধর্ম্মাত্মা হিন্দু চিরদিন আপনাকে দেবমণ্ডলীতে পরিবৃত করেন। তাঁহার নিকট চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, জীবজন্তু, সাগর, অগ্নি, পবন প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ সম্যক্ পূজ্য। এরূপ হইবার প্রকৃত কারণ কি? বাস্তবিক ঐ সকল জড়বস্তুর কি এক এক অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বর্ত্তমান? না ঐ সকল

পদার্থে ঐশী শক্তির পূর্ণবিকাশ দর্শনে উহারা ঋবিগণ কর্ত্তৃক দেবতা কল্পিত ? না ঐ সকল পদার্থ অসভ্যযুগে মানবমনে ভীতিসংবলিত বিস্ময় উৎপাদন করে বলিয়া এখনও উহারা দেবতাজ্ঞানে পূজিত ?

কেহ কেহ বলেন, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য ধর্ম্মাত্মা হিন্দু আপনাকে চতুর্দ্দিকে দেবমণ্ডলীতে পরিবৃত্ত করেন। এজন্ত তাঁহার গ্রাম্যদেবতা, গৃহদেবতা প্রভৃতি অনেক পূজ্য দেবতা এবং অশ্বত্থ, বট, বেল, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষগুলি, গাভী প্রভৃতি জীবগুলি ও নদী পর্ব্বত ইত্যাদি অনেক পদার্থ তাঁহার নিকট চিরদিন পূজ্য। এইরূপে চতুর্দ্দিকে নানা দেব-দেবী তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং সকলের প্রতি তিনি অপারভক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজ মনের উন্নতিসাধন করেন। চতুর্দ্দিকে পূজ্য দেবতাদিগের প্রতি অপারভক্তি প্রদর্শন করায় তাঁহার ভক্তিপ্রবৃত্তি এত অধিক স্ফুরিত।

কেহ কেহ বলেন, ভাবপ্রধান হিন্দু চিরদিন অতীতের উপর সমধিক শ্রদ্ধাবান্, তজ্জন্য জড়োপাসনার সময় যে সকল নৈসর্গিক দৃশ্যপটল বা পদার্থসমুচ্চয় তাঁহার অশিক্ষিত মনে ভীতিসংবলিত চমৎকার রস উৎপাদন করতঃ তাঁহার নিকট পূজ্য হয়, তাঁহারা চিরদিনই তাঁহার নিকট পূজ্য। এখনও তিনি উহাদিগকে পূজা করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করেন। অসভ্যযুগে হউক, সভ্যযুগে হউক, যে দেবতার পূজা যে সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ, তাহাই ধর্ম্মাত্মা হিন্দু চিরদিন সমভাবে পালন করেন। এইরূপে তাঁহার পূজ্য দেবতাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ; কিন্তু তিনি সকলের উপর সমানভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক চিরকাল ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে দেবমণ্ডলীতে পরিবৃত ও রক্ষিত হওয়ায় তাঁহার মনের শান্তি ও সন্তোষ কতদূর বর্দ্ধিত !

অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম্মের তেত্রিশকোটী দেবতা প্রকৃতির অনন্তত্বজ্ঞাপক। যে হিন্দু অনন্ত বিশ্বকে অনন্ত ব্রহ্মের বিরাটরূপ ভাবেন, যিনি অনন্ত বিশ্বের একটু সীমাবদ্ধ জড়পদার্থ লইয়া ব্রহ্মমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন ও তাঁহার পূজা করেন, তিনি আবার অনন্ত ব্রহ্মের অনন্তত্ব প্রকাশ করিবার জন্ত তাঁহার তেত্রিশকোটীরূপ কল্পনা করেন। যিনি ভালরূপ জানেন, অনন্তব্রহ্ম অনন্ত বিশ্বে অনন্তরূপে ও অনন্তশক্তিতে বিকশিত, তিনি কি অনন্তব্রহ্মকে সম্যক ব্যক্ত করিবার জন্ত

তাঁহার তেত্রিশকোটীরূপ কল্পনা করিবেন না ? যে প্রকৃতি সংসারলীলায় অনন্ত ও অগণ্য রূপ, গুণ ও শক্তি প্রদর্শন করে, সকল বিষয়ে কেবল অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকটিত করে, সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতাকে অনন্তরূপে, অনন্তগুণে ও অনন্তশক্তিতে বিভূষিত না করিয়া কি একটা সামান্যমূর্ত্তি গড়িয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ? যিনি প্রকৃত ভাবুক ও যথার্থ প্রকৃতির উপাসক, তিনি প্রকৃতির অনন্তত্ব দর্শনে অনন্ত ব্রহ্মের অনন্তরূপ কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। সেজন্য ধর্ম্মাত্মা হিন্দু যে স্থলে মহাশক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখেন, সেই স্থলেই দেবতা কল্পনা করিয়া তিনি ভক্তিভাবে নিজ মস্তক অবনত করেন, যে স্থলে কোন গুণের অদ্ভুত বিকাশ দেখেন, সেই স্থলে দেবভাব স্বীকার করতঃ তিনি ভক্তি-ভাবে নিজ মস্তক অবনত করেন। যাঁহারা আধুনিক একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী এবং অধ্যাত্মজগৎস্থ দেবগণের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দিহান, তাঁহারাই স্বধর্ম্মের তেত্রিশকোটী দেবতা সম্বন্ধে উপরোক্ত কারণ নির্দ্দেশ করেন।

তাঁহারা আরও দেবমণ্ডলীর উগ্র ও সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে বলেন, যেমন প্রকৃতি স্থলে সৌম্য, স্থলে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, ভাবপ্রধান হিন্দুও সেইরূপ পূজ্য দেবতাদিগের সৌম্য ও উগ্রমূর্ত্তি কল্পনা করেন। যিনি প্রকৃতিকে প্রকৃতরূপ অধ্যয়ন করেন, তিনি কি প্রকৃতির সর্ব্বস্থলে সৌম্য ও শান্তমূর্ত্তি দেখেন ? প্রকৃতিদেবী কি স্থলবিশেষে নিজমূর্ত্তি ভয়ানকের ভয়ানক দেখান না ? তিনি কি সর্ব্বত্র প্রেমময় ও শান্তিময় ভাব প্রকাশ করেন ? এই সুবিশাল ভারতভূমিতে কত জায়গায় প্রকৃতির কত ভয়াবহ রূপ প্রকটিত! উত্তরদেশে অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী চিরবরফাবৃত, অভ্রভেদি শৃঙ্গগুলি মস্তকে ধারণ করতঃ কত শত যোজন ব্যাপিয়া বিস্তারিত ? তদ্দর্শনে কাহার না শরীর আতঙ্কে কম্পমান ও রোমাঞ্চিত ? দক্ষিণদেশে অগাধ মহাসমুদ্রের ফেনিল নীলাম্বুরাশি কিরূপ উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত! তদ্দর্শনে কাহার না মন ভয়বিহ্বল ও বিস্ময়বিহ্বল ? কোথাও প্রভূত জলস্রোত গগনভেদিরবে দিগ্‌দিগন্ত আপূরণ পূর্ব্বক গ্রামের পর গ্রাম, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র ভাসাইয়া, বা কত জায়গায় ভূধরমধ্যে বিশালগর্ভে পতিত হইয়া কিরূপ অনন্তবেগে ধাবিত! কোথাও অসীম বালুকারাশি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণিত বায়ুবশে কিরূপ ব্যোমমার্গে উত্থিত ও তদ্দ্বারা দিঙ্মণ্ডল

কিরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোথাও অগাধ, নিবিড়, অন্ধকারাবৃত জঙ্গলরাশি শত শত যোজন ব্যাপিয়া কিরূপ বিস্তারিত ও তথায় কত শত শত ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক শ্বাপদকুল কালরূপ ধারণপূর্ব্বক লোলজিহ্ব হইয়া কিরূপ বিচরণ-শীল! কোথাও বেগবতী স্রোতস্বতীতে কালোপম মকরকুম্ভীরাদিগণের করালবদন লোকবর্গের ভীতি উৎপাদানার্থ কিরূপ ব্যাদিত! কোথাও অজগরাদি কালসর্পগণের বিশালফণা মানবকে কালসদনে প্রেরণার্থ কিরূপ উত্তোলিত! কোথাও অমিতবেগশালিনী ঝটিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে শত শত বিশালপাদপশ্রেণীকে ও সুরম্য হর্ম্ম্যবৃন্দকে ধরাতলশায়িনী করিবার জন্য কিরূপ ভয়ানক বেগে উত্থিত! কোথাও অশেষভীতিপ্রদ ভূমিকম্পদ্বারা মেদিনীমণ্ডল কিরূপ কম্পান্বিত ও তথায় সুরম্য জনপদ কিরূপ মরুভূমিতে, জল কিরূপ স্থলে ও স্থল কিরূপ জলে ক্ষণমাত্রে পরিণত! কোথাও নিবিড়, ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘাবলি বিশালগর্জ্জনের সহিত বারিবর্ষণপূর্ব্বক ক্ষণমাত্রে পৃথিবীকে জলাময়ী করণার্থ কিরূপ ভয়ঙ্করভাবে ব্যোমবার্গে উত্থিত!

এই সকল ভয়াবহ প্রাকৃতিক দৃশ্যপটল ভাবপ্রধান হিন্দু চিরদিনই দেখেন এবং ইহারা তাঁহার জাতীয় জীবনের গভীরতম প্রদেশ অধিকার করে। তিনি প্রকৃতির ভয়াবহ ও উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে পূজ্য দেবতারও উগ্রমূর্ত্তি কল্পনা করেন। কিন্তু গ্রীশ প্রভৃতি দেশে, যে স্থলে প্রকৃতি সৌম্য ও শান্তমূর্ত্তিতে সদা বিরাজিত, তথায় লোকে পূর্ব্বে দেবদেবীর কেবল সৌম্যমূর্ত্তি কল্পনা করিত।

যাহা হউক, যে সকল দেবমূর্ত্তি যোগিগণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে সমাধিবলে দিব্যচক্ষে দর্শন করেন, তাহাদিগকে আজ লোকে কাল্পনিক বলিতে সাহসী! বল দেখি, ঐ সকল দেবমূর্ত্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া তোমরা আজ যে নিরাকার ঈশ্বর অবলম্বন কর, তাহাতেই কি তোমরা মনের প্রকৃত শান্তি পাও? দেখ, তোমাদেরই পিতামহগণ ঐ সকল দেবদেবীর উপর অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া কিরূপ শান্তিসুখে জীবন অতিবাহিত করেন! আজ কি না তোমরা উহাদিগকে কাল্পনিক বলিতে সাহসী! তোমরা কি কোথাও শ্রবণ কর নাই, পাষাণমূর্ত্তি দোলায়মান হয়, শোণিত ও অশ্রুজল বর্ষণ করে? তবে কেন তোমরা আজ জাগ্রত ও জীবন্ত দেবমূর্ত্তির উপর এত সন্দিহান?

হিন্দুশাস্ত্রের নানাস্থলে উল্লিখিত, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে মনুপুত্রগণ সশরীরে স্বর্গে গমন করেন এবং দেবগণও সশরীরে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন। এ সকল কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথা? যখন স্বর্গ কোথায়, তাহাই কেহ জানে না, তখন কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়, মানব সশরীরে স্বর্গে গমন করেন? পঞ্চপাণ্ডব হিমালয়ে আরোহণ করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। এখন যদি হিমাদ্রিপর্ব্বতশ্রেণী ভারতের স্বর্গ বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে অনেকেই ত সিমলা শৈত্যাবাসে গমন করতঃ সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু সশরীরে স্বর্গারোহণের অর্থ অন্যরূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে যখন পৃথিবী এ মন্বন্তরের ন্যায় পূর্ণভাবে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তখন দেবরূপী বা অসুররূপী মনুপুত্রগণ অনায়াসে স্বর্গে বা সূক্ষ্ম জগতে গমন করেন। তৎকালে স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের মধ্যে প্রভেদ আজকালের ন্যায় এরূপ চিহ্নিত হয় নাই। সে জন্য দেবরূপী মানব অনায়াসে স্বর্গে গমন করেন এবং দেবগণও মর্ত্ত্যে অনায়াসে আগমন করেন। তৎপরে যুগধর্ম্মানুসারে যখন পৃথিবীর স্থূলত্ব পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ ও খিলীভূত হয়; তখন স্থূলত্বপ্রাপ্ত মানব সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন, সুমেরুস্থ দেশ যাহা এখন চিরবরফাবৃত, তাহাই দেবভূমি; তাহাই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস; পুরাকালে সকলেই তথায় গমনাগমন করেন। এজন্য হিন্দুশাস্ত্র নির্দ্দেশ করে, উত্তরদিকেই পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গারোহণার্থ গমন করেন।

পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ।

যে সকল স্তূপাকার গ্রন্থরাশি পুরাণ ও উপপুরাণাদি নামে হিন্দুসমাজে প্রচলিত, যাহাদের তথা-কথিত একমাত্র রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেব, ইহারাই হিন্দুধর্ম্মকে আধুনিক অবস্থায় আনয়ন করে এবং ইহার ভক্তিমার্গটি পূর্ণবিকশিত করে। সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় ভাবেন, যে পুরাণগুলি কেবল অলীক উপকথা ও কাল্পনিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, ইহাদের কিছুমাত্র সারবত্তা নাই, ইহারা মূর্খ, শ্রমজীবী ও মহিলাগণের একমাত্র শ্রবণীয় এবং উহারা সুধীসমাজে কদাচ আদরণীয় হইবার যোগ্য নয়।

এখন পুরাণগুলি উপকথায় পূর্ণ হউক, অতিরঞ্জিত হউক বা মার্জ্জিত-রুচির নিকট অপাঠ্য হউক, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, সত্যানুসন্ধিৎসুপাঠক ইহাদের ভিতর প্রচুর পরিমাণে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক সত্য দেখিতে পান। কল্পান্তরে, যুগান্তরে, অতি প্রাচীনকালে, অনৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক সময়ে জগতে যে সকল মহৎ মহৎ ঘটনাবলি সংঘটিত, সেই সকল ঘটনাবলি এবং দর্শনপ্রতিপাদিত মহাসত্যগুলি, যাহাতে জনসাধারণের নিকট সহজে বোধগম্য হয়, তজ্জন্য উহারা পুরাণাদিগ্রন্থে রূপকভাবে উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত। রূপক ভেদ করিয়া উহাদের অন্তঃপ্রবেশ করিতে চেষ্টা পাও, বুঝিতে পারিবে যে, অলীক উপকথার ভিতরও কত বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। পুরাণের যে সকল অসম্ভব ও অলৌকিক বিবরণ সামান্য উপকথা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহারা বস্তুতঃ উপকথা নয়, কিন্তু যোগেশ্বরপ্রকটিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্যে পূর্ণ। অতএব পুরাণগুলির অসম্ভব কথা শ্রবণে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহাদিগকে দূরে প্রক্ষেপ করা আমাদের আদৌ উচিত নয়।

ঐতিহাসিক সময়ের ঘটনা হউক, অনৈতিহাসিক সময়ের ঘটনা হউক, ধর্ম্মাত্মা হিন্দু সকল ঘটনাসহযোগে পূজ্য দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করেন এবং সকল ঘটনাতেই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইয়া যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ দেন। পূর্ব্বে সমাজস্থ মূর্খ জনসাধারণ কৃষিবাণিজ্যাদি নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত; যাহাতে তাহারা হিন্দুধর্ম্মের সত্য ও উপদেশ ভালরূপ বুঝিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের সুবিধার জন্য নানাকথা শাস্ত্রে উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত। এখন যাঁহারা কৃতবিদ্য ও উপাখ্যানে আদৌ বিশ্বাস করেন না, নানা পুষ্পের মধুসংগ্রহের ন্যায় তাঁহারা পুরাণোক্ত উপাখ্যানসমূহের সত্যসংগ্রহে সচেষ্ট হউন। কিন্তু যে পুরাণের আদ্যন্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, সে পুরাণের প্রকৃত অর্থ যোগেশ্বরগণই ভালরূপ বুঝেন। আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গুরুগণ সে বিষয়ে দন্তস্ফোট করিতে পারেন না। অতএব শাস্ত্রে যে বিষয়টী যেরূপভাবে বর্ণিত, এখন তাহাই আমাদের গ্রহণীয় ও বিশ্বসনীয়।

পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে বুঝা যায়, যে ইহাদের ভিতর তিনটী স্তর বর্ত্তমান

(১) আদিপুরাণ।
(২) মধ্যপুরাণ।
(৩) আধুনিক পুরাণ।

আদিপুরাণ নামক কোন গ্রন্থ এখন ভারতে প্রচলিত নাই। ইহাই আধুনিক পুরাণাদিগ্রন্থের আদ্যন্তর ও যোগেশ্বরপ্রকটিত। বোধ হয়, আদিপুরাণ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রথম সংগৃহীত ও প্রচারিত। তিনি স্বশিষ্য লোমপাদের নিকট ইহা প্রকাশ করেন। ইহাতে সৃষ্টি, মন্বন্তরাদি ও প্রাচীনকালের ঘটনাবলি বর্ণিত। এই সকল গূঢ় রহস্য প্রথমে যোগেশ্বর মহর্ষিদিগের হৃদয়ে যোগবলে প্রতিভাত। গঙ্গোত্রীনিঃসৃত পবিত্র গঙ্গোদকের ন্যায় ইহা তৎকালে অতীব নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ; কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক অপগমন বশতঃ ইহা কালক্রমে মলীভূত ও কলুষিত। বোধ হয়, যখন যোগেশ্বর ব্যাসদেব আদিপুরাণ স্বশিষ্য লোমপাদের নিকট প্রকাশ করেন, তখন তিনি ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া প্রকাশ করেন, অথবা কালসহকারে তাঁহার উপদিষ্ট সত্যের বিকৃত অর্থ হইয়া যায়। এ কলিযুগে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য সংগোপন করিবার জন্যই যাবতীয় শাস্ত্রকারেরা সাধ্যমত চেষ্টা পান। ইহার জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থলবিশেষ সাধারণের নিকট এত দুর্ব্বোধ্য। যাহা হউক, আদিপুরাণ কতদিন হিন্দুসমাজে প্রচলিত থাকে এবং কোন সময়ে ইহা লুপ্ত বা রূপান্তরিত হয়, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাকে আধুনিক পুরাণসমূহের অস্থিপঞ্জরস্বরূপ জ্ঞান করিলে ক্ষতি নাই।

মধ্যপুরাণগুলি পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। বোধ হয়, ইহারা খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে অমরসিংহের সময় বা তৎপুর্ব্বে হিন্দুসমাজে প্রচলিত। সর্গ, বিসর্গ, বংশবৃত্তান্ত, মন্বন্তর ও বিখ্যাত লোকের জীবনচরিত ঐ পুরাণগুলিতে বর্ণিত। বোধ হয়, হিন্দুসমাজে ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহারা ক্রমশঃ লুপ্ত বা রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক পুরাণে পরিণত। যখন মানবসমাজে মুদ্রাযন্ত্র অনুদ্ভাবিত, তখন অল্পায়াসেই বিবিধ গ্রন্থ অপ্রকাশিত বা রূপান্তরিত করা যায়।

আধুনিক পুরাণগুলি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর হিন্দুসমাজে প্রচলিত।

এখন অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বর্ত্তমান। ইহারা সম্প্রদায়বিশেষের দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথন, পূজার্চ্চনাবিধি, দেবোৎসব ও ব্রতনিয়মাদি নানা কথায় পূর্ণ। তদ্ভিন্ন পুরাকালের পুরাণগুলিরও নানাবিষয় ঐ সকল গ্রন্থে দেখা যায়। ইহারা এখন দশ লক্ষণাক্রান্ত। দশ লক্ষণ যথা,—সর্গ, বিসর্গ, স্থিতি, পোষণ, উতি, ঈশকথা, মন্বন্তর, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়।

যেমন অকৃত্রিম সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজে জ্ঞানোন্নতির সহিত, ধর্ম্মোন্নতির সহিত ক্রমবিকশিত ও স্তরে স্তরে নির্ম্মিত, ইহার পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থও সেইরূপ ক্রমবিকশিত ও স্তরে স্তরে রচিত। মহর্ষি বেদব্যাস ইহাদের একমাত্র রচয়িতা নন। কেবলমাত্র সমাজের মঙ্গলের জন্য, জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস উৎপাদনার্থ তিনি ইহাদের লেখক বলিয়া প্রখ্যাত। আদিপুরাণ মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক সময়ে পুরাণ পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত, অন্য সময়ে ইহা দশ লক্ষণাক্রান্ত হইবার একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন লেখনী হইতে বিনিঃসৃত এবং সমাজের সাধারণবিশ্বাসানুযায়ী ইহারা ক্রমশঃ কালক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত। দেখ, যে কপিল মুনি সাংখ্যমত প্রচার করিয়া জগদ্বিখ্যাত এবং যাঁহার সময়ে ভক্তিযোগ হিন্দুধর্ম্মে অপ্রকটিত, তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতে স্বীয় মাতা দেবহুতিকে সাংখ্যযোগ ও ভক্তিযোগ উপদেশ দেন। এ স্থলে জনসাধারণের মনে ভক্তিযোগ বদ্ধমূল করিবার জন্যই ভাগবৎ-রচয়িতা কপিলদেবের মুখারবিন্দ হইতে ঐ সকল অসাধারণ ভক্তির কথা নিঃসরণ করান। এইরূপে ধর্ম্মগ্রন্থের যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত। যে অকৃত্রিম ধর্ম্ম পুরাতন ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া নূতন মতামতের পোষকতা করে, সে ধর্ম্ম এই প্রকারেই ধর্ম্মগ্রন্থের পরিবর্ত্তন করে এবং ইহাকে স্তরে স্তরে রচিত করে। আর যে কৃত্রিম ধর্ম্ম পুরাতন ধর্ম্মের বিলোপসাধন করতঃ নূতন মতামত প্রচার করে, সে ধর্ম্ম পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থের সমূলোচ্ছেদসাধন করে। এই প্রকারে ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম জগতে প্রাচীন ধর্ম্মের ধ্বংস সাধন করে।

এখন পুরাণোক্ত কতকগুলি উপাখ্যানের রূপকভেদ করতঃ উহাদের বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রকাশে চেষ্টা করা যাউক।

(১) ভগবানের মৎস্যাবতার।

ভগবান মৎস্যাবতার গ্রহণ করিয়া হয়গ্রীব দৈত্য হইতে বেদ রক্ষা করেন এবং প্রলয়কালে পৃথিবী জলপ্লাবন দ্বারা বিনষ্ট হইলে, সত্যব্রত বা বৈবস্বত মনুকে সবংশে রক্ষা করেন। একটা সামান্য শফরী রাজা সত্যব্রত দ্বারা রক্ষিত হইয়া সমুদ্রে স্থাপিত; তথায় উহা ক্রমশঃ দীর্ঘকায় হইয়া যোজনব্যাপী দেহ ধারণ করে; প্রলয়ের সাত দিন পূর্ব্বে প্রাণদাতা রাজা সত্যব্রতকে প্রলয়ের বার্ত্তা জ্ঞাপন করে এবং পৃথিবী জলপ্লাবিত হইলে একখানি নৌকা পাঠাইয়া তাঁহাকে সবংশে রক্ষা করে। রাজর্ষি সত্যব্রত পুণ্যবলে পরমন্বন্তরে বৈবস্বত মনু হন। প্রলয়কালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিদ্রিত হইলে, হয়গ্রীব দৈত্য তাঁহার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করিয়া জলধিগর্ভে নিমগ্ন হয়; উহাকে সংহার করিয়া মৎস্যরূপী ভগবান বেদ উদ্ধার করেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এই পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিতর কি কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত নাই? ইহা কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথা? আমরা কি অন্ধবিশ্বাসের সহিত শাস্ত্রের এই সকল উপকথা ধর্ম্মের মহাসত্য জ্ঞানে পূজা করিব এবং ইহাদের কোনরূপ বৈজ্ঞানিক অর্থ করিতে চেষ্টা পাইব না? এখন আমরা যেরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, তাহাতে ইহাদের বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত অর্থ না করিলে ইহাদের প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস হয় না। অতএব ইহাদের বৈজ্ঞানিক অর্থ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যোগেশ্বরপ্রকটিত পুরাণের প্রকৃত অর্থ করা আমাদের সাধ্যাতীত। যাহা হউক, নানাশাস্ত্র পাঠ করিয়া এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝা যায়, তাহার আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইংরাজদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বে পৃথিবী জলপ্লাবিত হইলে, যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জ নষ্ট হয় এবং সেই জলপ্লাবনে নোয়া সবংশে রক্ষিত হন। তিনিই নিজ অর্ণবপোতে যাবতীয় উদ্ভিজ্জের বীজ ও অন্যান্য জীবজন্তুর এক একটি দম্পতি রক্ষা করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন। সেইরূপ পারসিকদিগের অবস্তভাষায় জরথুস সেই পৃথিবীব্যাপ্ত জলপ্লাবনে রক্ষিত। এখন ধরিত্রী কতবার জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট ও পুনরুত্থিত, বা কতবার খণ্ডপ্রলয়দ্বারা বিনষ্ট হইয়া আধুনিক আকারে পরিণত, তাহা নির্দ্দেশ করা

অসম্ভব। কিন্তু ইহা যে দুইবার জলপ্লাবনে বিনষ্ট, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্থ মূলজাতির সময় যখন আট্‌লাণ্টিস মহাদ্বীপ দৈত্যগণের সহিত জলমগ্ন হয়, তৎকালে ভাগবৎমতে পুণ্যাত্মা রাজর্ষি সত্যব্রত রক্ষিত হন। দ্বিতীয়বার জলপ্লাবন বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে আদিম আর্য্য-জাতির ভিতর সংঘটিত হয়। তিব্বতের উত্তরভাগে, যে স্থলে আজ গবী মরু-ভূমি বিস্তৃত, তথায় পূর্ব্বে আর্য্যজাতির বসবাস ছিল। ভৌতিক্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা সমপ্রদেশ প্রথমে সমুদ্রে, পরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। যে সকল পণ্ডিত গবী মরুভূমি দর্শন করেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করেন, পূর্ব্বে ইহা সমুদ্রগর্ভে ছিল। সেইরূপ আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিও এককালে জলধিগর্ভে ছিল। যাহা হউক, যে জলপ্লাবন দ্বারা সমপ্রদেশ জলমগ্ন হয়, তাহাতে আদিম আর্য্যজাতির অধিকাংশ লোক বিনষ্ট হয় এবং যাঁহারা রক্ষিত হন, তাঁহাদেরই বংশাবলি কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অভিব্যাপ্ত। এজন্য প্রায় সকল দেশে জলপ্লাবন সম্বন্ধে একপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত। ইহুদি-দিগের মতে নোয়া, পারসিকদিগের মতে জরযুস এবং হিন্দুদিগের মতে বৈবস্বত মনু সেই জলপ্লাবনে রক্ষিত হন এবং সকল জাতিই ঐ ঘটনাটি নিজ নিজ দেশের ঘটনা বলিয়া বর্ণন করেন।

সামান্য মৎস্য সমুদ্রে স্থাপিত হইয়া যোজনব্যাপী দেহ ধারণ করে, শাস্ত্রের এ কথায় আমাদের বুঝা উচিত, অতি প্রাচীনকালে ঐরূপ দীর্ঘকায় মৎস্য-জাতি পৃথিবীতে বিচরণ করে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণও যথেষ্ট আছে। ভগবান মৎস্যাবতারে হয়গ্রীব দৈত্যকে সংহার করিয়া বেদ রক্ষা করেন, শাস্ত্রের এ কথার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, যৎকালে আট্‌লাণ্টিস মহাদ্বীপ জলপ্লাবন দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তৎকালে মহাদ্বীপবাসী হয়গ্রীব নামক অসুর-জাতিও বিনষ্ট এবং প্রাচীনকালের বেদরূপ জ্ঞানভাণ্ডারও সেই সঙ্গে বিনষ্ট, কেবল ইহার কিয়দংশ দীর্ঘকায় মৎস্যজাতি কর্ত্তৃক রক্ষিত। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শিখায় যে, মৎস্যরূপী ভগবান হয়গ্রীব দৈত্যকে সংহার করিয়া বেদ রক্ষা করেন।

(২) ভগবানের কূর্ম্মাবতার।

পুরাকালে দেবাসুরগণ একত্রে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন। ইহাতে মন্দরপর্ব্বত মন্থনদণ্ডের কার্য্য করে, মহাসর্প বাসুকি মন্থনরজ্জু স্বরূপ হইয়া মন্থনদণ্ড বেষ্টন করে এবং ভগবান বিষ্ণু মহাকূর্ম্মরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বপৃষ্ঠোপরি মন্দরপর্ব্বত ধারণ করেন। সাগরমন্থনকালে পৃথিবী হইতে সপ্তরত্ন ক্রমশঃ উদ্ভূত; পরিশেষে যখন ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া উত্থিত, তখন অমৃত ভোজনার্থ দেবাসুরগণ মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলে, বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে ছলনা করেন; দেবগণ অমৃতপান করিয়া অমরত্বলাভ করেন, আর অসুরগণ তাহাতে বঞ্চিত হইয়া নশ্বর হয়।

এই সামান্য শ্রুতিমনোহর উপাখ্যানের ভিতরও অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। ইহা দ্বারা আমাদের বুঝা উচিত, কি প্রকারে তরলভূপৃষ্ঠ কালসহকারে ঘনীভূত হইয়া মৃত্তিকারূপ কঠিন ত্বকে আবৃত হয় ও পর্ব্বতাদি ধারণ করে, কি প্রকারে মহাকূর্ম্মাদি সরীসৃপগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, কি প্রকারে উভলিঙ্গ জীবসমূহ কালসহকারে স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়া সংসারে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে এবং কি প্রকারে ধরিত্রী অনন্তরত্নের আকর হয়।

বিজ্ঞানের মতে পৃথিবী এককালে বাষ্পময়ী; তখন ইহা জীবজন্তু বসবাসের অনুপযুক্ত। পরে ইহার অন্তর্নিহিত উত্তাপরাশি কথঞ্চিৎ শীতল হইলে, ইহা তরলপদার্থে পূর্ণ হয় এবং ইহার উত্তাপরাশি আরও যত শীতল হয়, ইহার উপরিভাগ দুগ্ধসরবৎ কঠিন ত্বকে আবৃত হয়; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরভাগ পূর্ব্বের ন্যায় তরল পদার্থে পূর্ণ থাকিয়া যায়। যৎকালে ভূপৃষ্ঠ জলে ও স্থলে বিভক্ত হইতে থাকে, তৎকালে তরল গলিতধাতু স্থানে স্থানে ঘনীভূত হওয়ায় পর্ব্বতাদি উৎপন্ন ও স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, মৎস্য প্রভৃতি উভলিঙ্গ জলচর জন্তুগুলি ক্রমশঃ আবির্ভূত এবং মৎস্যজাতির ক্রমবিবর্ত্তনে মহাকূর্ম্মাদি উভচর জন্তুগুলি কালক্রমে উদ্ভূত, অর্থাৎ উভলিঙ্গ মৎস্যজাতির কতকগুলি বংশধর কালক্রমে মহাকূর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হয় এবং পর্ব্বতসমাকীর্ণ কঠিন বাহ্যাবরণযুক্ত পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য ইহাদের পৃষ্ঠদেশও প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ত্বকে আবৃত হয়। তৎকালে ইহারা দীর্ঘকায়, কিন্তু ইহাদের অপগণ্ড বংশধরেরা (আধুনিক কচ্ছপগুলি) খর্ব্বকায়। সেই সময় সর্পাদি

অন্যান্য সরীসৃপজাতিও পৃথিবীতে আবির্ভূত। এখন সৃষ্টির এই সকল মহৎ মহৎ ঘটনাপরম্পরা সংঘটিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত, তাহা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান নির্দ্দেশ করিতে এখন অসমর্থ।

যাহা হউক, ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, উন্নত জড়বিজ্ঞান অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানাদিবলে যে সকল বিষয়ের আভাস পায়, সেই সকল বিষয় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এতকাল আমাদিগকে সামান্য উপকথাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। হিন্দুধর্ম্ম! বলিহারি তোমারি! এখন সাগরমন্থনের রহস্য উদ্ঘাটন করা যাউক। দেবাসুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন। দেবগণ কোথায়? অসুরগণ কোথায়? ক্ষীরোদসাগরই বা কোথায়? আর গোপকন্যার দুগ্ধমন্থনের ন্যায় যথার্থই কি দেবাসুরগণ মন্থনদণ্ড ও মন্থনরজ্জু লইয়া ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন? ধর্ম্মের প্রলাপ আর কাহাকে বলে?

লবণাক্ত নীলাম্বুরাশি আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবী ক্ষীরোদসাগরে পূর্ণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ আধুনিক জল ও স্থলে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবী গলিতধাতুমিশ্রিত তরলপদার্থে পূর্ণ। তজ্জন্য ইহার মহাসাগর শাস্ত্রে দুগ্ধবৎ ক্ষীরোদসাগর বলিয়া উক্ত। আধুনিক পৃথিবীতে বা জম্বুদ্বীপে, আধুনিক মানবজাতি বা বৈবস্বতমনুপুত্রগণ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে, তদানীন্তন পৃথিবীতে দেবরূপী ও অসুররূপী মনু পুত্রগণ বিচরণ করেন। ভূপৃষ্ঠ জল ও স্থলে বিভক্ত হইয়া আধুনিক আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহারাই বসুন্ধরা ভোগ করেন। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম উপদেশ দেয়, দেবাসুরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন। যেমন দুগ্ধমন্থনকালে নবনীত দুগ্ধোপরি ভাসমান হয়, সেইরূপ দেবাসুরদিগের সাগরমন্থনকালে, অথবা তাঁহাদের বিচরণকালে, যাহা উত্তরকালে ভূপৃষ্ঠে মৃত্তিকারূপে পরিণত, তাহা দুগ্ধসরবৎ ক্ষীরোদসাগরোপরি আবির্ভূত হয়। এইরূপে ভূপৃষ্ঠ জল ও স্থলে বিভক্ত। তৎকালে পর্ব্বতগণ ভূধরস্বরূপ আবির্ভূত হইয়া ভূপৃষ্ঠে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এবং সেই সঙ্গে বৃক্ষাদি, মহাসর্পজাতি ও মহাকূর্ম্মজাতিও ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে শিখায়, সাগরমন্থনকালে কূর্ম্মের উপর মন্দরপর্ব্বতরূপ মন্থনদণ্ড স্থাপিত এবং বাসুকিরূপ মহাসর্প ইহার রজ্জুস্বরূপ। তৎকালে উদ্ভিজ্জ জীবজন্তুগণ স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হওয়ায় আধুনিক মৈথুনধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তিত,

এজন্ত বিষ্ণুও তৎকালে মোহিনীরূপ ধারণ করেন। তৎকালে দৈত্য ও অসুর-দিগের ভিতর দৈত্যানী আবির্ভূত; দৈত্যগণ উহাদের রূপে মুগ্ধ হয়, এবং মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন দ্বারা যোনিসম্ভব মানব উৎপাদন করতঃ নশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দেবগণ মোহিনীরূপে মুগ্ধ না হওয়ায় অমরত্ব লাভ করেন। এজন্ত হিন্দু-ধর্ম্ম আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে শিখায়, সাগরমন্থনকালে দেব চিকিৎসক ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া উত্থিত হইলে পর, দেবাসুরগণ অমৃতপানার্থ মহা-সমরে লিপ্ত হন; কিন্তু বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যগণকে মোহিত করেন এবং দেবগণকে অমৃতপান করাইয়া উহাদিগকে অমর করেন। যত-কাল হইতে জগতে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, তত কাল যোনিসম্ভব মানব নশ্বর, যতদিন তিনি অযোনিসম্ভব, ততদিন তিনি দেবরূপে অমর। শাস্ত্রমতে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সংসারে স্থূলত্বের পরিবর্দ্ধন, মানবের জ্ঞানশক্তির স্ফুরণ ও তাঁহার মৃত্যুপ্রাপ্তি।

আরও দেখ, পর্ব্বতাদি অনন্ত রত্নের আকর ও পৃথিবী আমাদের নিকট চিরদিন বসুন্ধরা। পর্ব্বতগুলি বৃষ্টি-জলে ধৌত হইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরাশক্তি প্রদান করে ও তাহাতেই বিবিধ শস্য উৎপন্ন এবং ইহাদের গর্ভে বিবিধ ধাতু ও রত্ন জাত। এজন্ত হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে শিখায়, সাগরমন্থন কালে ক্ষীরোদসাগর হইতে সপ্তবিধ রত্ন উদ্ভূত। তন্মধ্যে প্রথম রত্ন সুরভি গাভী বা দেবগাভী; ইহাই গাভিকুলের আদিপুরুষ ও তৎকালে দীর্ঘকায়। দেবাসুরগণ এই জাতীয় গাভিদিগের দুগ্ধপান করেন। আধুনিক ক্ষুদ্রকায় গাভিকুল ইহাদেরই অপগত বংশধর। দ্বিতীয় রত্ন উচ্চৈঃশ্রবা বা মহাঘোটক, ইহা সুরভি গাভীর ন্যায় দীর্ঘকায় ও আধুনিক ঘোটকজাতির আদিপুরুষ। তৃতীয় রত্ন ঐরাবত হস্তী বা মহাহস্তী, ইহাও দীর্ঘকায় ও আধুনিক হস্তী-জাতির আদিপুরুষ। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক ও ঐরাবত হস্তী দেবগণ ভোগ করেন; এজন্য ইহারা হিন্দুশাস্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের চিরবাহন। চতুর্থ রত্ন কৌস্তভাদি মণি, এখনও মুক্তা প্রবালাদি নানাবিধ রত্ন সমুদ্রে পাওয়া যায়। পঞ্চম রত্ন দেবভোগ্য পারিজাত পুষ্প; আধুনিক পুষ্প ইহার অপগত বংশধর। ষষ্ঠ রত্ন অপ্সরা বা দেব বেশ্যা (যাঁহারা নৃত্যগীত প্রবর্ত্তন করেন)। সপ্তম রত্ন লক্ষ্মী বা ধনদৌলত। উপরোক্ত রত্নগুলি দেবাসুরদিগের সাগরমন্থন-

কালে বা তাঁহাদের অধিকার কালে জগতে আবির্ভূত এবং তাঁহারাই ঐ সকল ভালরূপ ভোগ করেন ; এজন্য হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সপ্তম রত্ন, লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর অর্দ্ধাঙ্গিনী করে এবং কৌস্তুভমণি তাঁহার বক্ষঃদেশে পরিধান করায়। সংসার ভালমন্দে মিশ্রিত বলিয়া সাগরমন্থনকালে একদিকে যেমন অমৃত উৎপন্ন, অপরদিকে গরলও উত্থিত ; কিন্তু মহাদেব সেই গরলরাশি পান করতঃ নীলকণ্ঠ হন, অর্থাৎ তমঃপ্রধান মহাদেব সংসারের তমোগুণ পান করতঃ ইহার যাবতীয় অশুভকে শুভে পরিণত করেন। *

---

(৩) ভগবানের বরাহাবতার।

হিন্দুশাস্ত্র মতে ভগবান বিষ্ণু মহাবরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমগ্না ধরিত্রীকে স্বীয় দন্তদ্বারা উত্তোলন করেন ও হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য বধ করেন। ইহাও কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথা ? এখন উন্নত জড়বিজ্ঞান কি বলে, তাহা একবার শ্রবণ কর দেখি। ইহার মতে বহুকাল পূর্ব্বে আধুনিক পৃথিবীর ভূভাগগুলি জলধিগর্ভে নিমগ্ন এবং ভৌতত্ত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহারা ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া আধুনিক মহাদ্বীপদ্বয়ে পরিণত। এখনও হিমালয়ের অত্যুচ্চশৃঙ্গগুলিতে শম্বুকাদি ও মহাকূর্ম্মের কঙ্কালরাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূ-বিদ্যা মতে আধুনিক পৃথিবীর বাহ্যস্তর জলধিগর্ভে গঠিত। কিন্তু কত ভৌতত্ত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা পৃথিবী আধুনিক আকারে পরিণত বা কতকাল ব্যাপিয়া ঐ সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত, তাহা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান এখনও স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যৎকালে পৃথিবী জলধিগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া আধুনিক আকার ধারণ করিতে থাকে, তৎকালে প্রকৃতিদেবী স্তন্যপায়ী মহাবরাহজাতি উৎপাদন করতঃ এ বিষয়ে সাহায্য করে ; সে জন্য ইহাদের আধুনিক ক্ষুদ্রকায় বংশধরেরা এখনও চিরাগত সংস্কারবশতঃ দন্তদ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন করে। এস্থলে কেহ যেন এমন মনে করেন না যে, বরাহদিগকে দন্তদ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন

---

* সাগর মন্থনের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এস্থলে প্রদত্ত, তাহা অনেকের মনে না লাগিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র ও হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

করিতে দেখিয়াই হিন্দুকবিগণ ঐরূপ কল্পনা করতঃ আমাদিগকে একটা সামান্য উপকথা শিখায় মাত্র।

এখন ধরিত্রীর উত্তোলন বিষয়ে জড়বিজ্ঞান মহাবরাহজাতির উৎপত্তির বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ করে না বলিয়া আমরা যে হিন্দুশাস্ত্রের কথা অমান্য করিব, তাহা কদাচ হইতে পারে না। বিজ্ঞানশাস্ত্র ভ্রমসঙ্কুল মানবরচিত; কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদ্যান্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্যে পূর্ণ। যাহা তুমি আজ সামান্য উপকথা জ্ঞানে অবজ্ঞা কর, তাহা-রই মহাসত্য সুদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে। অতএব হিন্দুধর্ম্ম বিষ্ণুকে জলশায়ী বরাহরূপ ধরাইয়া সৃষ্টিবিষয়ক যে মহৎ ঘটনা অবতারতত্ত্বে জলন্তা-ক্ষরে লেখে, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নয়।

মহাবরাহরূপে ভগবান হিরণ্যাক্ষ দৈত্য বধ করেন, এ কথারও প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? যৎকালে মহাবরাহ সকল ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া জলমগ্ন ধরি-ত্রীর উত্তোলনে সাহায্য করে, তৎকালে বোধ হয় তদানীন্তন পৃথিবীবাসী হির-ণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকুল উহাদের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শিখায়, বরাহরূপী ভগবান হিরণ্যাক্ষ দৈত্য বধ করেন।

(৪) ভগবানের বামনাবতার।

যৎকালে দৈত্যরাজ বলী দেবগণকে সমরে পরাস্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন ও ত্রিভুবনে একাধিপত্য স্থাপন করেন, তৎ-কালে বিষ্ণু দেবকার্য্যসাধনার্থ বামনরূপ ধারণ করিয়া দানশীল বলীরাজার নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ বলী ভিক্ষুক বামনকে ত্রিপাদভূমিদানে স্বীকৃত হইলে, বামনরূপী বিষ্ণু নিজ দেহ বর্দ্ধন করতঃ প্রথম-পাদ স্বর্গরাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পাদ মর্ত্ত্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার মর্ত্ত্যরাজ্য গ্রহণ করেন; তৎপরে বিষ্ণু কটিদেশ হইতে তৃতীয় পাদটী নিঃসরণপূর্ব্বক বলীরাজার মস্তকে তাহা স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে পাতাল দেশে লইয়া যান এবং তথায় চিরদিনের জন্য তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই প্রকারে বামনরূপী বিষ্ণু প্রবলপ্রতাপান্বিত, মহাদর্পী বলী রাজার রাজ্য নাশ করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই শ্রুতিমনোহর উপাখ্যানের কিরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতে পারে? অনেকে বামনের ত্রিবিক্রম লইয়া নানারূপ জল্পনা ও কল্পনা করেন। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্যদেবের প্রাতরুত্থান, অস্তগমন ও আকাশের মধ্যদেশাগমনই বামনের ত্রিবিক্রমরূপ রূপকে উল্লিখিত। যাহা হউক, এ স্থলে সে সকল কাল্পনিক কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রথমভাগে উল্লিখিত, প্রথমে দেবগণ, পরে দৈত্যাসুরগণ, তৎপরে খর্ব্বকায় মানবগণ নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া বসুন্ধরা ভোগ করেন। সুমেরু পৃথিবীতে দেবগণ, লিমুরিয়া ও আট্‌লাণ্টিস মহাদ্বীপে দৈত্যাসুরগণ ও আধুনিক পৃথিবীতে বা জম্বুদ্বীপে আধুনিক মানব আবির্ভূত ও ইহার অধীশ্বর। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শিখায়, দৈত্যরাজ বলী দেবগণকে সমরে পরাস্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং ভগবান বামনরূপ অর্থাৎ খর্ব্বকায় আধুনিক মানবরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ বলীর রাজ্যনাশ করেন। লিমুরিয়া ও আটলাণ্টিস মহাদ্বীপে দীর্ঘকায় দৈত্যাসুরগণ আবির্ভূত হইয়া দেবতাদিগের স্থানে বসুন্ধরা ভোগ করেন। প্রাকৃতিক কারণে ঐ সকল দৈত্য যুগধর্ম্মানুসারে খর্ব্বাকৃতি ধারণ করে; এজন্য তাঁহাদের বংশোদ্ভূত মানব তাঁহাদের সহিত তুলনায় বামনরূপী; কিন্তু তাঁহার মনে জ্ঞানশক্তি প্রস্ফুরিত হওয়ায় তিনি বুদ্ধিবলে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করেন। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শিখায়, ভগবান বামনরূপে দৈত্যরাজ বলীকে ছলনা করেন ও ধূর্ত্ততার সহিত তাঁহার রাজ্য নাশ করেন। দৈত্যদিগের আবাসভূমি আট্‌লাণ্টিস মহাদ্বীপ ভৌতত্ত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা দৈত্যগণের সহিত জলধিগর্ভে নিমগ্ন। এ জন্য হিন্দুধর্ম্মও আমাদিগকে শিখায়, দৈত্যরাজ বলী চিরদিনের জন্য পাতালপুরীতে নিবদ্ধ। জগতে মৈথুনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে দীর্ঘকায় অযোনিসম্ভব দৈত্যগণ দ্বিপাদবিশিষ্ট; পরে যখন তাঁহাদের দেহ যুগধর্ম্মানুসারে খর্ব্বাকৃতি ধারণ করে, তৎকালে তাঁহাদের কোটিদেশ হইতে তৃতীয়পাদস্বরূপ পুংজননেন্দ্রিয় আবির্ভূত হয় এবং এই প্রকারেই অযোনিসম্ভব মানব যুগধর্ম্মে যোনিসম্ভব হন। এ জন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শিখায়, ভগবান বামনরূপে দৈত্যরাজ বলির নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন এবং নিজ কোটিদেশ হইতে তৃতীয় পাদ নিঃসরণ পূর্ব্বক

দৈত্যরাজকে ছলনা করেন। যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্মের কি অপার মহিমা! সৃষ্টিবিষয়ক মহৎ ঘটনা ভগবানের অবতারতত্ত্বে অলঙ্কাক্ষরে লিখিয়া ইহা আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কি মহাসত্য শিখায়!

(৫) ভগবানের নৃসিংহাবতার।

ভগবান পরমভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য নৃসিংহরূপ ধারণ করতঃ তদীয় পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। দৈত্যযুগে অর্থাৎ চতুর্থ মূলজাতির সময় নৃসিংহরূপধারী মানব (অর্থাৎ যে মানবের দেহ অৰ্দ্ধমানবাকৃতি ও অর্দ্ধসিংহাকৃতি) আবির্ভূত হয় এবং এ জাতি দৈত্যদিগের ধ্বংস সাধন করে। এ জন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শিখায়, পরমভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান নৃসিংহাবতার গ্রহণ করতঃ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ইহাও সৃষ্টিবিষয়ক একটী মহৎ ঘটনা।

(৬) বিনতানন্দন গরুড়পক্ষী।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, বিষ্ণুবাহন গরুড়পক্ষী যে মহাহস্তী ও মহাকূর্ম্ম বহুদিবস ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, উভয়কে নিজ নখরে লইয়া ও একটা বিশাল বটবৃক্ষশাখা চঞ্চুপুটে লইয়া পর্ব্বতোপরি উপবিষ্ট হয় এবং তথায় মনোসুখে মহাহস্তী ও মহাকূর্ম্ম ভোজন করে। শাস্ত্রের এ কথাও কি কবির স্বকপোলকল্পনা? ইহাও কি সামান্য উপকথা? গরুড়পক্ষীর যে আলেখ্য সকলে দর্শন করেন, তাহাতে শাস্ত্রের কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এখন জড়বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এতৎ-সম্বন্ধে কি বলে; তাহা একবার শ্রবণ কর। ভূধরশায়ী কঙ্কালরাশি পর্য্যা-লোচনা করিয়া ভূবিদ্যা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বৃহদাকার জীবজন্তু বা পশুপক্ষী পৃথিবীতে আবির্ভূত। দীর্ঘকায় পতত্রবিশিষ্ট গোধা, মহাকূর্ম্ম, মহাহস্তী, মহাকুম্ভীর, মহাঘোটক প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে স্থায়ী নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন একমাত্র তিমি মৎস্য ব্যতীত সেরূপ বৃহদা-কার জন্তু কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। যাহা হউক মহাভারতের কথা যে

মহাসত্য,; তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন গরুড়পক্ষী চতুর্ভুজ বিষ্ণুর বাহন, শাস্ত্রের এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দীর্ঘকায় মনুপুত্রগণ আপনাদের গমনাগমনের সুবিধার জন্ত ঐ সকল দীর্ঘকায় পক্ষীদিগকে পালন করিতেন ও তাহাদিগের পৃষ্ঠারোহণে অন্যত্র গমনাগমন করিতেন। বিবিধ গল্পেও পক্ষীরাজ ঘোটকের কথা উল্লিখিত। ইহাতে বোধ হয়, পূর্ব্ব যুগের এই প্রকৃত ঘটনাটী প্রকাশ করিবার জন্ত হিন্দুধর্ম্ম গরুড়পক্ষীকে বিষ্ণুবাহন ও ময়ূরকে কার্ত্তিকবাহন করে।

কি উদ্ভিজ্জ জগৎ, কি প্রাণীজগৎ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সকলই বৃহদাকার; এখন যুগধর্ম্মে তদীয় বংশধরেরা সকল দেশে খর্ব্বকায়। সেইরূপ মানবও তৎকালে দীর্ঘকায়। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গের সহিত জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার জন্ত, প্রকৃতিদেবী নিশ্চয়ই তাঁহাকেও দীর্ঘকায় ও তদনুরূপবলে সুশোভিত করেন। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শিখায়, মানবদেহ সত্যযুগে একবিংশতিহস্তপরিমিত, ত্রেতাযুগে চতুর্দ্দশহস্তপরিমিত, দ্বাপর যুগে সপ্তহস্তপরিমিত ও কলিযুগে সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত।

(৭) শাস্ত্রোক্ত রাক্ষস ও বানর।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে শাস্ত্রোক্ত দৈত্য, দানব, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতবর্ষের আদিমনিবাসিপরিচায়ক। ভারতবর্ষের নানা স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া, আর্য্যজাতি যে সকল বর্ব্বর আদিম নিবাসিদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত উহারাই যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্রে ঐ সকল অবজ্ঞাসূচক উপাধিতে বিভূষিত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, কোন কোন মহাত্মা বলেন, যুগধর্ম্মে মানব আধুনিক খর্ব্বকায় ও সুন্দর গঠন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল দীর্ঘকায়, কিম্ভুতকিমাকার মানবজাতিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পৃথ্বীতলে বিচরণ করে। লঙ্কাদ্বীপ রাক্ষসদিগের বাস ভূমি। মনুষ্যখাদক বলিয়া উহারা রাক্ষস নহে; দেহাকৃতির বৈলক্ষণ্য বশতই উহারা রাক্ষস নামে অভিহিত। লঙ্কাদ্বীপ লিমুরিয়া মহাদ্বীপের অন্তর্গত। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জাবলি লিমুরিয়া মহাদ্বীপের

ভগ্নাবশেষ। পুরাতন লঙ্কাদ্বীপ রাক্ষসদিগের সহিত এখন সমুদ্রগর্ভস্থ; কেবল-মাত্র ইহার অংশবিশেষ আধুনিক লঙ্কারূপে ভূগোলে পরিচিত।

এখন মানব যদিও খর্ব্বকায়, কিন্তু তিনি গঠনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। গঠন ও আকৃতি বিষয়ে তাঁহার এইরূপ সৌন্দর্য্য পাইবার পূর্ব্বে প্রকৃতিদেবী অনেক মানবরূপ গঠন করেন ও ভগ্ন করেন। সে জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পৃথ্বীতলে রাক্ষস বানরাদি জন্মগ্রহণ করে। তাহার সাক্ষ্য, এখনও স্থলবিশেষে রাক্ষস (Monster) ভূমিষ্ঠ হয়; এ স্থলে প্রকৃতি প্রমাদবশতঃ পূর্ব্বাভিনয় করে মাত্র।

(৮) হরগৌরীর তৃতীয় নয়ন।

অনেকেই আলেখ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতে দেবতাদিগের তৃতীয় নয়ন দর্শন করেন। ইহাও কি কবির কল্পনা ও সামান্য উপকথা? তাঁহারা এখন মানব ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জীবজন্তুকে দ্বিনয়ন দেখেন, তাঁহারা কি প্রকারে দেবতা-দিগের ত্রিনয়নে বিশ্বাস করিতে পারেন? অতএব ইহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মের সামান্য কুসংস্কার বলিয়া তাঁহারা এখন সকল জঞ্জাল মিটান। আবার তাঁহাদের পূজ্যতম জড়বিজ্ঞান বলে, কপালাস্থি (Brontal Bone) জরায়ুগর্ভে দ্বিখণ্ডিত থাকিলেও শৈশবে সংযুক্ত হয় এবং কপালদেশে তৃতীয় অক্ষিগোলক থাকিবার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতএব যে স্থলে দেবতাদিগের মস্তকে তৃতীয় নয়ন অঙ্কিত, তাহা কবিদিগের স্বকপোলকল্পনা।

এখন মানবমস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা যায় যে, পিনিয়াল গ্লাণ্ড (Pineal gland) নামক একটী গ্রন্থী অপগতভাবে ইহার নিম্নদেশে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে কোন্ কর্ম্ম সম্পাদন করিত, তাহা শারীরস্থানবিদ্যা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কোন কোন মহাত্মার বিশ্বাস, ইহাই পূর্ব্বতন যুগের তৃতীয় নয়নের ভগ্নাবশেষ। এই তৃতীয় নয়ন মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র; মস্তকের বাহ্যদেশে ইহার অক্ষিগোলক থাকিবার আবশ্যকতা নাই।

এই তৃতীয় নয়নই যোগিদিগের দিব্যচক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু। যখন ইহা প্রকৃত অবস্থাপন্ন, তখন মানব সহজে যোগাভ্যাস করিয়া অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি

প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে বা যুগে দেবরূপী মানব ত্রিনয়নবিশিষ্ট এবং যোগবল তাঁহার সহজাত ও প্রকৃতি-সিদ্ধ। দৈত্যযুগে তাঁহার দিব্যচক্ষু এখন অপেক্ষা অধিক স্ফুরিত। যুগ-ধর্ম্মানুসারে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাওয়াতে তৃতীয় নয়নটী ক্রমশঃ অপগত। এখন তাঁহার বাহ্যনয়নদ্বয় যে পরিমাণে স্ফুরিত, তাঁহার অভ্যন্তরীণ তৃতীয় নয়ন সেই পরিমাণে অপগত। এখন তিনি বাহ্যস্থূলপদার্থ দর্শন করিয়া স্থূল জগতের যেরূপ জ্ঞানলাভ করেন, সূক্ষ্ম জগতের বিন্দুবিসর্গ তিনি চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতে পারেন না। তিনি কেবল অনুমান-বলে সূক্ষ্ম জগতের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ অবগত হন। এখন তিনি সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরস্থ ও অভ্যন্তরীণ কোন পদার্থ দর্শন করিতে পারেন না। এখনও যাঁহারা যোগবলে অতীন্দ্রিয়-দর্শন, অতীন্দ্রিয়—শ্রবণ, পরকায় প্রবেশাদি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের তৃতীয় নয়নটী বোধ হয়, যোগবল দ্বারা অল্পাধিক স্ফুরিত। জন্মানুসারে যাঁহাদের তৃতীয় নয়ন অল্পাধিক স্ফুরিত, তাঁহারাও সহজে ত্রিকালজ্ঞ হন। বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্যদেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের তৃতীয় নয়ন জন্মানুসারে স্ফুরিত; এজন্য তাঁহারা যোগসিদ্ধ এবং যোগবলেই সংসারে অত্যদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করেন।

ধ্রুবচরিত, সাবিত্রীসত্যবানের উপাখ্যান, নলদময়ন্তী, রাজা হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, শ্রীবৎস রাজা প্রভৃতি যে সকল রাজাদিগের উপাখ্যান পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা কেবল অশেষ ধর্ম্মোপদেশে পূর্ণ এবং সেই সকল ধর্ম্মোপদেশ পাঠ বা শ্রবণ করিলে, মন যে কতদূর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহা সকলেই জানেন।

পরিশেষে বক্তব্য, পুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য বিক্ষিপ্ত, তাহা কালে আবিষ্কৃত হইবে। তখনই সকলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের পূজ্যপাদ প্রপিতামহগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য কিরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন ও সামান্য উপকথাচ্ছলে আমাদিগকে কিরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান।

চতুর্থ অধ্যায়।

পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব।

হিন্দুশাস্ত্রমতে বিশ্বপালনকর্ত্তা বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ এই নয় অবতার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরক্ষাহেতু যুগে যুগে জগতীতলে অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন। শেষোক্ত চারি অবতার মানবসমাজে আবির্ভূত হওয়ায়, মনে হয়, অসাধারণ গুণের বিকাশ দর্শনে লোকবর্গ উহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে শিক্ষা করে। এখন জিজ্ঞাস্য, প্রথমোক্ত পাঁচ অমানুষিক অবতার নির্দ্দেশ করায়, শাস্ত্রে ঈশ্বরের কোন্ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শিত? সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কি-না জগতে অত্যদ্ভুত লীলা দেখাইবার জন্য অধমাধম মৎস্য, কূর্ম্ম বা বরাহ রূপ ধারণ করেন? শাস্ত্রকারদিগের কি অর্ব্বাচীনতা বা মূর্খতা? যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে স্বদুহিতার উপর প্রেমাসক্ত বর্ণন করেন, তাঁহারা সকল অঘটনই ঘটাইতে পারেন। তাঁহারা যে ঈশ্বরকে হেয় বরাহরূপ ধরাইবেন, ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই।

এখন যিনি পৌরাণিক অবতারতত্ত্বটী বিজ্ঞান সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনিই ভালরূপ বুঝিতে পারেন, ইহা দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কিরূপ বৈজ্ঞানিক মহিমা প্রকাশিত। একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্পষ্ট দেখিতে পান যে, হিন্দুশাস্ত্রের অবতারতত্ত্বে উচ্চ বিজ্ঞানের উচ্চ বিবর্ত্তবাদ নিহিত, অথবা মানবের জাতীয় ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তর নিহিত।

পাঠকগণ! আপনারা হয়ত একথা শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কোথায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন কবির স্বকপোলকল্পনা! আর কোথায় সহস্র সহস্র বিদ্বজ্জনের আজীবন পরিশ্রমের চরম ফল! কোথায় কল্পনাদেবীপ্রসূত অবাস্তবিক উপকথা! আর কোথায় বিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া পরিবর্দ্ধিত বিজ্ঞানরূপ কল্পদ্রুমের পারিজাত পুষ্প!

যে স্থলে জ্ঞানাভিমানে ও সভ্যতাভিমানে উন্মত্ত ইউরোপখণ্ডের উৎকৃষ্ট খৃষ্ট ধর্ম্ম ঈশ্বরকে সপ্তদিবসে বিশ্বরচনা করাইয়া ঐশ্বরিক ক্ষমতার খর্ব্ব করে, সে স্থলে অর্দ্ধ সভ্য, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের অপকৃষ্ট পৌত্তলিক ধর্ম্ম

কত যুগ যুগান্তর কল্পনা করিয়া প্রকৃত বিবর্ত্তবাদ প্রকাশ করতঃ বৈজ্ঞানিক সত্যের জয় ঘোষণা করে।

মানবের জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান. কর, অথবা মানববিশেষের জীবন বৃত্তান্ত জরায়ুগর্ভে প্রথম ভ্রূণের অঙ্কুরোদ্গম হইতে সাময়িক মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি পর্য্যালোচনা কর, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, মানবের জাতীয় জীবনে অতি পুরাকাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তর নিহিত। তন্মধ্যে কতকগুলি স্তর ভূপৃষ্ঠে মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রাণিজগতে বিদ্যমান এবং অপর কতকগুলি স্তর মানবসমাজে বিদ্যমান। প্রথমোক্ত স্তরগুলি দ্বারা জানা যায় অতি নিকৃষ্ট জীব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া কি প্রকারে ক্রমবিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠে আধুনিক স্থূলদেহবিশিষ্ট মানবে পরিণত এবং শেষোক্ত স্তরগুলি দ্বারা জানা যায়, নিকৃষ্ট জীবোৎপন্ন, অসভ্য. স্থূলদেহবিশিষ্ট মানব সামাজিক নির্ব্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া কি প্রকারে স্বীয় অবস্থা ক্রমোন্নত করতঃ আধুনিক যুগে অশেষ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মবলে বলীয়ান মানবে পরিণত।

পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব ভালরূপ বুঝিবার জন্য, জীবতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র ভালরূপ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবিষ্কৃত সত্য লইয়া, স্বধর্ম্মের অবতার-তত্ত্বের বিষয় ভালরূপ বিচার করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, আমাদের প্রপিতামহ মহর্ষিগণ যাহা যোগবলে প্রাপ্ত হন, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণাদি বলে তাহার আভাস মাত্র পায়। বিজ্ঞান সাহঙ্কারে বলে, যে মানব নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিকাশে ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত এবং বহুকাল ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ক্রমবিকসিত হওয়ায় তিনি স্বকীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া জগতের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম।

শাস্ত্রোক্ত নয় অবতারের মধ্যে প্রথম পাঁচটী অমানুষিক অবতার, ভূপৃষ্ঠে মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তদীয় জাতীয় জীবনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তর দৃষ্ট হয়, তাহাই জ্ঞাপন করে এবং শেষোক্ত চারিটী মানুষিক অবতার তাঁহার জাতীয় জীবনের সামাজিক স্তরগুলি জ্ঞাপন করে। মানব স্বীয় জাতীয় জীবনে প্রাণিজগৎ ও সমাজ জগতের যে সকল স্তর অতিক্রম

করিয়া আধুনিক অবস্থায় পরিণত হন, তিনি সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তর স্রষ্টার ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে অলঙ্কারে লিখিয়া যান। সেজন্য সেই সকল স্তর শাস্ত্রোক্ত অবতারতত্ত্বে স্পষ্টরূপে নিহিত। তিনি ভূপৃষ্ঠে যখন যে ভাবে ও যেরূপে বিচরণ করেন, তিনি তখন ঈশ্বরকে সেই ভাবে ও সেইরূপে দর্শন করেন। যখন তিনি ভূমণ্ডলে মৎস্যরূপী, তাঁহার স্রষ্টাও তৎকালে মৎস্যরূপধারী ভগবান; যখন তিনি ভূমণ্ডলে ভক্তিমান, প্রেমময় ও আনন্দময়, তাঁহার ঈশ্বরও তৎকালে ভক্তবৎসল, প্রেমময় ও আনন্দময় কৃষ্ণরূপধারী।

প্রথম পাঁচটী অমানুষিক অবতারে প্রতীয়মান হয় যে, মানব প্রথমে মৎস্যরূপী হইয়া জলচর হন; পরে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া উভচর হন; পরে বরাহরূপ ধারণ করিয়া স্থলচর ও স্তন্যপায়ী হন; পরে নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া অর্দ্ধমনুষ্যরূপী ও অর্দ্ধসিংহরূপী হন; পরে দীর্ঘকায় জীব হইতে ক্রমশঃ খর্ব্বাকৃতি ধারণ করতঃ আধুনিক বামনরূপী মানবে পরিণত হন। শেষের চারিটী মানুষিক অবতারে প্রতীয়মান হয়, তিনি সমাজের আদিম অবস্থায় মাতৃহন্তা পরশুরামের ন্যায় পাশব বলে বলীয়ান থাকেন; পরে সমাজের উন্নতির সঙ্গে অশেষগুণসম্পন্ন রামের ন্যায় অশেষগুণপ্রাপ্তি কামনায় রামচন্দ্রকে স্বজীবনের আদর্শ করেন; পরে ভক্তি ও প্রেম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুশীলনই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভাবিয়া, নিষ্কামধর্ম্মোপদেষ্টা, বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণকে জীবনের প্রধান আদর্শ করেন। পরে দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের সম্যক অনুশীলনে প্রখর জ্ঞান ও যুক্তিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেবকে আপনার আদর্শ পুরুষ জ্ঞান করেন।

আধুনিক যাবতীয় উন্নত বিজ্ঞানশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মের উপরোক্ত উৎকৃষ্ট মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করে। প্রাণিবিদ্যা উপদেশ দেয়, জীবজগতের প্রথম জীব আমিবা (Amœba) হইতে সৃষ্টির চরম পরিণতি মানব পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যতপ্রকার অমেরুদণ্ডীয় ও মেরুদণ্ডীয় জীবজন্তু বর্ত্তমান, উহাদিগের শ্রেণিবিভাগ ও জাতিবিভাগ সম্বন্ধে পরস্পর পস্পরের সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয় যে, একটী উৎকৃষ্ট জীব উহার অব্যবহিত নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিবর্ত্তনে সৃষ্ট হওয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

উভচর জন্তু জলচর মৎস্তের ক্রমবিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত উভচর জন্তু একদিকে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়া পক্ষিজাতিতে পরিণত এবং অপরদিকে অশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত।

ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) উপদেশ দেয়, যে উৎকৃষ্ট জীবজাতি অতি নিকৃষ্ট জীব হইতে আরম্ভ করিয়া কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া যে সকল পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করত আধুনিক আকার ধারণ করে, উহার বংশধরেরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় সেই সকল জাতীয় পরিবর্ত্তনগুলি অল্পদিনের ভিতর সহ্য করতঃ স্বদেহ প্রস্ফুরিত করে। জীব জগতে কোন এক জীব লক্ষ লক্ষ বৎসরে যে সকল পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করে, উহার বংশধর এখন মাতৃগর্ভে অল্পদিনের ভিতর সেই সকল পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতি সকল জীবজন্তুর দেহনির্ম্মাণে জাতীয় পরিবর্ত্তনগুলি পুনরভিনয় করে। ইহাই দেহনির্ম্মাণে প্রকৃতির মূলমন্ত্র। ভ্রূণবিদ্যা বলে, মানব ভ্রূণাবস্থায় প্রথমে মৎস্যরূপী হন, কারণ সে অবস্থায় তাঁহার গ্রীবাদেশে কয়েকটী ছিদ্র দৃষ্ট হয় এবং ঐ ছিদ্রগুলি মৎস্তে চিরস্থায়ী (যেখানে মাছের কান্‌কো থাকে)। এইরূপে যে যে অবস্থা মৎস্যাদি নিকৃষ্ট জীবসমূহে চিরস্থায়ী, সেই সেই অবস্থা এখন মাতৃগর্ভে মানবভ্রূণে ক্ষণস্থায়ীরূপে দৃষ্ট হয়। সরীসৃপজীবদেহে শোণিত যেরূপে সঞ্চরমান মাতৃগর্ভে ভ্রূণদেহে মাতৃশোণিতও সেইরূপে বহমান ; সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই সন্তানের প্রথম রোদনের সঙ্গে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং শোণিতও অন্যরূপে বহিতে আরম্ভ করে।

ভূবিদ্যা বলে, মানবের বাসোপযোগী হইবার পূর্ব্বে পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময়ী, পরে জলময়ী, পরে স্থলময়ী হইয়া কত স্তরের পর স্তর, কত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতিক্রম করতঃ আধুনিক আকার ধারণ করে, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। ভূমণ্ডলের এমন অবস্থা গিয়াছে, যে সময়ে মৎস্য ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠ জীব ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে নাই। সেই মৎস্য জাতির ক্রমবিকাশে অন্যান্য উৎকৃষ্ট জীবজন্তুর ন্যায় মানবও অবনীমণ্ডলে কালসহকারে আবির্ভূত।

হিন্দুধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এক বেদিতে উপবেশনপূর্ব্বক উভয়ে সমস্বরে বলে,

মানব জগৎস্রষ্টা কর্ত্তৃক মানবরূপে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হন নাই; মৎস্য-রূপ অতি নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিকাশে তাঁহার উৎপত্তি; অতএব তাঁহার জাতীয় জীবনে মৎস্যরূপ প্রথম স্তর এবং শাস্ত্রে মৎস্যরূপ ঈশ্বরের প্রথম অবতার। অতি পুরাকালে কে-জানে-কোন-সময়ে মৎস্য জাতির কতকগুলি বংশধর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন রূপ আবর্ত্তে পতিত হইয়া উভচর হয়; অতএব মানবের জাতীয় জীবনে কূর্ম্মরূপ দ্বিতীয় স্তর এবং শাস্ত্রে ঈশ্বরের কূর্ম্মরূপ দ্বিতীয় অবতার। পুনরায় উভচর জীবের কতকগুলি বংশধর লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত স্বীয় বাহ্যাকৃতি পরিবর্ত্তন করতঃ স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত হয়; অতএব মানবের জাতীয় জীবনে স্তন্যপায়ী বরাহ-রূপ তৃতীয় স্তর এবং শাস্ত্রে ঈশ্বরের বরাহরূপ তৃতীয় অবতার। সেইরূপ তাঁহার নৃসিংহরূপ, পরে বামনরূপ, তৎপরে আধুনিক মানবজাতির উৎপত্তি।

হিন্দুশাস্ত্রমতে যে যুগে অসুরগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, সেই যুগে ঈশ্বর নৃসিংহ ও বামন অবতার গ্রহণ করেন। ইহাতে বোধ হয়, মানবদেহ আধুনিক আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে অর্দ্ধপশ্বাকৃতি ও অর্দ্ধনরাকৃতি-ধারণ করে; পরে অসুরের দীর্ঘকায় হইতে ক্রমশঃ খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিতে করিতে তদীয় দেহ আধুনিক আকার ধারণ করে। সত্য বটে, বিজ্ঞান এখনও মানব সম্বন্ধে নৃসিংহ ও বামনরূপের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ করে না। কিন্তু ইহা সকলের জানা আবশ্যক, বিজ্ঞান ভ্রান্তমানববিরচিত ও হিন্দুশাস্ত্র যোগেশ্বর প্রকটিত। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র কদাচ মিথ্যা হইবার নয়। এ স্থলে আরও বক্তব্য, মানবের জাতীয় জীবনের উপরোক্ত স্তরগুলি তত্ত্ববিদ্যামতে কেবল তাঁহার স্থূলদেহ সম্বন্ধে উল্লিখিত; অর্থাৎ তাঁহার স্থূলদেহ কিরূপে ক্রমশঃ বিরচিত বা নির্ম্মিত তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত।

এখন মানবের জাতীয় জীবনের সামাজিক স্তরগুলি ভালরূপ পর্য্যা-লোচনা করা যাউক। ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্ত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ কর, অথবা ভূমণ্ডলে যত প্রকার মানবজাতি আছে, কেহ অসভ্য, কেহ অর্দ্ধসভ্য, কেহ সুসভ্য, তাহাদের বিষয় ভালরূপ অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, মানব ভূমণ্ডলে কত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অতি-ক্রম করতঃ জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম। তিনি আদিম অবস্থা

হইতেই সমাজবদ্ধ। কিন্তু আদিম সমাজের অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর। তখন তিনি বস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে, অন্নাভাবে নানাবিধ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করতঃ সহজাত বন্য ফলমূলে বা অন্য কোন জীব-জন্তুর আমমাংসে উদর পূরণ করেন। তখন কোথায় বা জ্ঞান! কোথায় বা ধর্ম্ম! মানব মনে কিছুই অঙ্কুরিত হয় নাই। তখন তিনি নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নিকৃষ্ট জীবন নিকৃষ্ট সুখভোগে অতিবাহিত করেন। আণ্ডামান, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীদিগকে নিরীক্ষণ কর, আদিম সমাজের সে অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তখন মানবসমাজে মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কোনরূপ ভাষা উদ্ভাবিত হয় নাই। তখন তিনি নিকৃষ্ট জন্তুরবের ন্যায়, মানবশিশু-রোদনের ন্যায় কতকগুলি অস্ফুট অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করেন। বহুকাল ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে তিনি মনোভাব বাক্যকথন ভাষায় ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করেন। এই বাক্য-কথন-ভাষাসৃষ্টি ও অগ্ন্যুৎপাদন তাঁহার জাতীয় উন্নতির প্রথম সূত্রপাত।

দেখ, একটী দুগ্ধপোষ্য মানবশিশু কি প্রকারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা করে। মানবের জাতীয়জীবনে যে ঘটনা সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সংঘটিত, সেই ঘটনা আজকাল মানবজীবনে ২।৩ বৎসরে সংসাধিত। বাল্য কাল জ্ঞানোদয়ের সময়; কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, কোন্ দিন শিশুর প্রথম জ্ঞানোদয় হয়। সেইরূপ মানবের জাতীয় জীবনের বাল্যকালে সমাজে জ্ঞানোদয় হয়; কিন্তু কত সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জাতীয় সাধানার গুণে সমাজে প্রথম জ্ঞানোদ্রেক হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, জাতীয় জীবনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানশক্তি বর্দ্ধিত ও স্ফুরিত হওয়ায় তিনি জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। কিন্তু এই জাতীয় উন্নতি সাধনে কত যুগ যুগান্তর ব্যতীত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

প্রত্নতত্ত্ব বলে, মানবের জাতীয় জীবনের প্রথম অবস্থাকে কয়েক যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) প্রস্তর যুগ (২) ব্রঞ্জ যুগ (৩) লৌহ যুগ। প্রস্তরযুগে প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র, ব্রঞ্জযুগে ব্রঞ্জনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র

এবং লৌহযুগে লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র তিনি ব্যবহার করেন। অসভ্যাবস্থায় শারীরিক পাশবলই তাঁহার প্রধান সহায়। যে স্থলে আজ তাঁহার বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, ধর্ম্মবল ও অর্থবল, সে স্থলে পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র শরীরের পাশববল চালিত। সমাজের এই অসভ্যাবস্থাটী জ্ঞাপন করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পরশুরাম রূপ ঈশ্বরের ষষ্ঠ অবতার আমাদিগকে শিখায়; এ জন্য পরশুরাম কুঠার হস্তে মাতৃহত্যা করিয়া ও একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পাশাববলের সম্পূর্ণ পরিচয় দেন।

কেহ কেহ বলেন, যোদ্ধাগ্রগণ্য ভৃগুবংশীয় পরশুরাম ক্ষত্রিয় জাতির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া স্বজাতির প্রভুত্ব হিন্দুসমাজে স্থাপন করেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণজাতি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা করেন। এখন জিজ্ঞাস্য, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে মাতৃহত্যা করাইয়া কেন ঘোর পাপপঙ্কে লিপ্ত করান? যদি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাঁহারা কদাচ উপরোক্ত বীভৎস ঘটনার উল্লেখ করিতেন না। যাহা হউক, যোগেশ্বরদিগের গূঢ় রহস্য বুঝা অতীব সুকঠিন।

সমাজের দ্বিতীয় অবস্থায় মানব বহুকাল হইতে পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত লোকালয়ে বসবাস করত ক্রমশঃ সভ্যতা সোপানে আরোহণ করেন। এ অবস্থায় পারিবারিক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া তাঁহাকে অশেষ সুখে সুখী করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম অশেষ গুণসম্পন্ন রামাবতাররূপ ঈশ্বরের সপ্তম অবতার আমাদিগকে দেখায়।

সমাজের তৃতীয় অবস্থায় মানব জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সামাজিক ধর্ম্মপালনের আবশ্যকীয় যাবতীয় সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া নিজ মনের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য লালায়িত। এ অবস্থায় তাঁহাকে নিষ্কাম ধর্ম্ম, পরাপ্রেম, ও পরাভক্তি শিক্ষা দিয়া ব্রহ্মানন্দে উন্মত্ত করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের প্রেমাবতার রূপে দেখায়। হিন্দুধর্ম্মের এই চূড়ান্ত সময়। এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করিতে শিক্ষা করেন।

সমাজের চতুর্থাবস্থায় মানবের বুদ্ধিশক্তি পূর্ণ বিকসিত। তিনি

দর্শনবিজ্ঞানাদি রচিত করিয়া তর্কবলে, জ্ঞানবলে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে গিয়া পরাস্ত এবং পৃথিবীতে নাস্তিকবাদ প্রচার করিতে প্রয়াসী। সমাজের এই অবস্থা জ্ঞাপনার্থ হিন্দুধর্ম্ম নাস্তিকবাদী বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের নবম অবতার রূপে দেখায়।

মানবসমাজের চতুর্ব্বিধ অবস্থা, যাহা হিন্দুধর্ম্মের অবতারতত্ত্বে স্পষ্টাক্ষরে ও অলঙ্কাক্ষরে লিখিত, তাহা সকল সভ্যজনপদবর্গে দৃষ্ট হয়। এজন্য সভ্য দেশে একস্থলে সামরিক বল বা পাশব বল, অন্য স্থলে নিষ্কাম ধর্ম্ম; একস্থলে অসাধারণ বুদ্ধিবিকাশের সহিত নাস্তিকবাদ, অন্যস্থলে অনন্যভক্তি-সংবলিত ঈশ্বরপ্রেম; একস্থলে অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি ও সৌভ্রাত্র, অন্যস্থলে ভ্রাতৃবিরোধ ও পিতৃমাতৃভক্তিশূন্যতা দৃষ্ট হয়।

হিন্দুধর্ম্মের অবতারতত্ত্ব কুসংস্কার জ্ঞানে ঘৃণা করিবার বিষয় নয়। ইহাতে বিংশ শতাব্দীর উচ্চ বিজ্ঞানের মহোচ্চ সত্য নিহিত। তোমার দর্শনশক্তি থাকে, তুমি তাহা দেখিয়া নয়ন সার্থক কর। তোমার বোধ-শক্তি থাকে, তুমি তাহা বুঝিয়া নিজ বোধশক্তি সার্থক কর। যাঁহার মন প্রকৃত বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইবে, তিনি কদাচ হিন্দুধর্ম্মকে ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করিবেন না। দেখ, অন্যান্য কৃত্রিম ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কত বিরোধ, কত বিবাদ বিসম্বাদ,এমন কি উহাদের মূলোৎপাটনে বিজ্ঞান দৃঢ়ব্রত। যদি এ সংসারে কোন ধর্ম্ম বিজ্ঞানানুমোদিত হয়, সে এই হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দু-ধর্ম্মই প্রকৃতির সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম্ম। লোকে কেবল বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ কেবল কুশিক্ষাবশতঃ স্বধর্ম্মের মহৎ সত্য বুঝিতে পারে না। কোথায় হে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন! তুমি তাহাদিগকে কবে সুমতি প্রদান করিবে!

রামাবতার।

রামাবতারে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে গার্হস্থ্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দেয়; কি প্রকারে আমরা পরিবারবর্গের সহিত বসবাস করতঃ পিতা ও মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী, স্ত্রী ও পুত্র লইয়া অশেষ সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, কাহার সহিত কিরূপ ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য, তাহাই এ ধর্ম্ম রামচরিত দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃষ্টপদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়। যে রামায়ণে রামাবতারের

কথা লিখিত, তাহা আমাদের নিকট চিরদিনের জন্য পূজ্য। আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রামায়ণ সমভাবে পূজিত। যতদিন ভারতে হিন্দুধর্ম্ম দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন রামায়ণ এই ভাবে পূজিত হইবে। যদি হিন্দুধর্ম্ম এক রামায়ণ ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার না করিত, এক রামায়ণের জন্যই ইহা চিরদিন ধর্ম্মজগতে অতুলনীয় থাকিত। যে দেশে রামায়ণ উদ্ভূত, সে দেশ ধন্য! যে জাতি রামায়ণপাঠে উপকৃত, সে-জাতি ধন্য! যে ভাষায় রামচরিত বর্ণিত, সে ভাষা ধন্য! যে সমাজ রামায়ণ-শ্রবণে ধর্ম্মপথে অগ্রসর, সে সমাজ ধন্য! আর যে ব্যক্তি রামচরিতশ্রবণে নিজ জীবন গঠিত করেন, তিনিও সংসারে ধন্য!

ভাষা মাত্রেই কাব্যশাস্ত্রে পূর্ণ; কিন্তু রামায়ণের ন্যায় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, এমন মনোহর মহাকাব্য কোন দেশের কোন ভাষায় দৃষ্ট হয় না। রামায়ণ ভারতের চিররত্নাকর, এ আকর কিরূপ অমূল্য মণিমুক্তায় পূর্ণ, তাহা এক হিন্দু ব্যতীত জগতের কেহই জানেন না। এ আকরের নিঃশেষ নাই; কত কোটি কোটি মানববৃন্দ এ আকরের অমূল্য রত্ন ভোগ করেন, অথচ ইহা চিরদিন সমভাবে পূর্ণ। যে অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ রামায়ণে পাওয়া যায়, তাহার সহিত কি অকিঞ্চিৎকর, যৎসামান্য মণিমুক্তার তুলনা হইতে পারে? পার্থিব রত্ন পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর দেহকে সুশোভিত করে; কিন্তু রামায়ণের স্বর্গীয় রত্ন অবিনশ্বর আত্মার স্বর্গীয় আভরণ।

কোথায় হে আদিগুরো বাল্মীকি! তুমি এক রামায়ণ লিখিয়া ভারতকে কিরূপ পুণ্যক্ষেত্র, কিরূপ ধর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছ! তুমি রামচরিত শ্রবণ করাইয়া কোটী কোটী মানববৃন্দকে কিরূপ ধর্ম্মামৃত পান করাইতেছ! তুমি রামচরিত বর্ণন করিয়া ভারতকে চিরদিনের জন্য কিরূপ ঋণে আবদ্ধ করিয়াছ! হে আদিগুরো! ধন্য তোমার কল্পনাশক্তি! ধন্য তোমার লেখনী! রামোপাখ্যান সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তুমি যে অলৌকিক রামচরিত বর্ণন করিয়া লোকবর্গকে অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছ, তজ্জন্য তোমার শ্রীচরণারবিন্দে কোটী কোটী প্রণাম। কোথায় হে কবি রত্নাকর! তুমি যে অলৌকিক রামচরিত অলৌকিক তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছ, যে

অলৌকিক দৃশ্য সকলের সমক্ষে ধারণ করতঃ চিরদিনের জন্য সকলকে অলৌকিক সহানুভূতিতে বিমুগ্ধ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার শ্রীচরণারবিন্দে কোটী কোটী প্রণাম। যে দেশে ও যে ভাষায় শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় আদর্শ মানব, আদর্শপুত্র ও আদর্শ রাজা, সীতার ন্যায় আদর্শ নারী ও লক্ষ্মণের ন্যায় আদর্শ ভ্রাতা কল্পিত, সে দেশ ও সে ভাষা কত ধন্য! আর যিনি অত্যদ্ভুত কৌশলবলে, অগাধ কল্পনাবলে সেই আদর্শ পুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করত জাতীয় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে চিরাঙ্কিত করেন, তিনিও এ সংসারে কত ধন্য!

আজ ইংরাজদিগের মুখে এক অপরূপ কথা শ্রবণ করা যায়, যে রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যবিজয় এবং সীতাদেবীর অপহরণ ও লঙ্কায় আনয়ন, লাঙ্গল দ্বারা কৃষিকার্য্যের দাক্ষিণাত্যে প্রচার রূপকভাবে বর্ণিত। যখন তাহারা রামায়ণ পাঠ করেন, তখন তাহারা রামোপাখ্যান কতদূর সত্য, ইহা কোন সময়ের ঘটনা ইত্যাদি নানা বিষয় লইয়া নিজ মস্তক বিঘূর্ণিত করেন বা লেখনী চালনা করেন; কিন্তু তাঁহারা রামায়ণের যে প্রকৃত মাহাত্ম্য বা মহিমা কি, তাহা আদৌ বুঝিতে চেষ্টা করেন না। ওহে সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়! তোমরা আজ তাঁহাদেরই পরমভক্ত শিষ্য। তোমরাও বলিয়া থাক, রামায়ণের অধিকাংশ স্থল অতিরঞ্জিত ও কবির স্বকপোলকল্পিত। কৃতবিদ্য হইয়া, কখনও কি এমন বিশ্বাস করা যায়, যে একটা সামান্য বানর সূর্য্যদেবকে বাহুমূলে রুদ্ধ করে, এক লম্ফে সমুদ্র পার হয়, ইন্দ্রজিৎ আকাশে মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করে, সীতাদেবী সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক অক্ষত শরীরে নিষ্ক্রান্ত হন? তোমরা যদি ঐ সকল কাল্পনিক কথা লইয়া রামায়ণের গুণাগুণ বিচার কর, তোমরাও রামায়ণের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পার নাই। এখন তোমরা ইংরাজিতে নানা সাহিত্য, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করতঃ স্বীয় অভূতপূর্ব্ব বিদ্যার গৌরব কর। বল দেখি, রামায়ণ পাঠে তোমরা যে উপদেশ ও যে শিক্ষা পাও, সে উপদেশ ও সে শিক্ষা আর কোন্ পুস্তকে দেখিতে পাও? বিজ্ঞান শাস্ত্রের আবিষ্কৃত কতকগুলি সত্য জানিলে বা ইতিহাসের কতকগুলি যুদ্ধের বিবরণ পাঠ

করিলে কোন্ শ্রেয়োলাভ হয়? এ সকল বিদ্যা ভবপারাবারে কিছুমাত্র সাহায্য করে না। ইহাদের চরম ফল—

"সর্ব্বং জ্ঞানমখিলং অর্থে পরিসমাপ্যতে।"

অর্থোপার্জ্জনই অখিল পাশ্চাত্যজ্ঞানলাভের চরম ফল। কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, হৃদয় করুণাদিরসে আর্দ্র হয় ও সংসারে পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা যায়, সেই শিক্ষাই ভবপারাবারে সকলের প্রকৃতরূপ সাহায্য করে; ইহার বলে ভবসমুদ্রের নানা ঝঞ্ঝাবাত উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এখন ভাব দেখি, রামায়ণ কিরূপ প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে আমাদিগকে সেই সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করে?

রামায়ণে পিতৃমাতৃভক্তি, পিতৃমাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, সপত্নীপ্রেম, পতিপরায়ণতা, রাজকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় ধর্ম্ম কিরূপ উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উপদিষ্ট! রামচন্দ্র নিজ জীবনে অসাধারণ পিতৃভক্তির কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখান! পিতৃসত্য পালনার্থ কে কোথায় অতুল সম্পদ, অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে যাইতে পারে? কে কোথায় কণ্টকাকীর্ণ হিংস্রজন্তুসমাকুল বনজঙ্গলের অশেষ কষ্টরাশি এত সুদীর্ঘকাল অম্লান বদনে বহন করিতে পারে? কে কোথায় বিমাতার চক্রান্তবশতঃ পিতৃদত্ত সিংহাসন ত্যাগ করতঃ এমন স্বার্থত্যাগ করিতে পারে? যে ক্ষত্রিয়কুল বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা," সেই ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ও এতদূর বাহুবীর্য্যে সুশোভিত হইয়া যিনি পিতৃদেবকে সত্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বেচ্ছায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে যান, তাঁহার স্বার্থত্যাগ জগতে কিরূপ অপরিসীম ও অতুলনীয়! যে রামচন্দ্র মনে করিলেই অনায়াসে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় মাতা ও ভার্য্যাকে অশেষ সুখে সুখিনী করিতে পারিতেন, যাঁহাকে অধীশ্বর করিবার জন্য রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এত উদ্গ্রীব, তিনিই কিছুমাত্র বাক্যব্যয় না করিয়া পিতৃসত্যপালনার্থ চীরবল্কল ধারণ করতঃ বিতাড়িত পশুর ন্যায় বনবাসে যান! স্বার্থত্যাগের এমন মনোহর দৃষ্টান্ত কোন্ ভাষায় দেখা যায় বল? এস্থলে স্বার্থপর বিকৃতমস্তিষ্ক মানব বলেন, যখন কুচক্রী বিমাতা এক অসাবধান মুহূর্ত্তে পিতাকে দুইটী বর

দিতে স্বীকৃত করান ও সুযোগ মত উহাদিগকে পালন করিতে পীড়াপীড়ি করেন এবং যখন পিতাও উহাদিগকে পালন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তখন পিতার কোন্ সুপুত্র উহাদিগকে পালন করিতে ইচ্ছুক? তবে কেন রামচন্দ্র একটা সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্যত্যাগ করেন ও বনবাসে যান? এস্থলে তিনি কি নির্ব্বোধের কার্য্য করেন নাই? যাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট সুশিক্ষিত, তাঁহারাই ঐরূপ ভাবেন। তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তি এখন অপার। তাঁহারা এখন সভ্যযুগের মাবব, সভ্যোচিত ধর্ম্মেরই প্রশংসা করেন। কিন্তু যাঁহারা অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য, তাঁহারা যেন চিরদিন সত্যের মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য মানিয়া চলেন।

এখন বল দেখি, রামচন্দ্রের এই অসাধারণ পিতৃভক্তি প্রদর্শন করাইয়া হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুমাত্রকে কতদূর পিতৃভক্ত করে এবং এতকাল কত অসংখ্য ধর্ম্মাত্মা হিন্দু পিতৃভক্তি প্রদর্শনার্থ কিরূপ স্বার্থত্যাগ করেন! বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে যতদূর পিতৃভক্তি উপদেশ দেয়, এমন কোন ধর্ম্ম এ জগতে দিতে পারে না।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বে দেবাঃ।

"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপ; পিতা সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন।" এমন পিতৃভক্তিপ্রদায়ি শ্লোক কোন্ ভাষার কোন্ পুস্তকে পাওয়া যায়? কিন্তু ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়, হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতনের দিনে পিতৃভক্তিও সমাজে কতদূর হ্রাসপ্রাপ্ত! আজকালের সুসভ্য, সুশিক্ষিত সন্তানগণ পিতামাতাকে ওল্ড ফুল (old fool) বলেন ও বিবিজানদিগের সুপরামর্শে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন রহিত করতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করেন।

রামচন্দ্র স্বজীবনে রাজধর্ম্মের কি পরাকাষ্ঠা দেখান! প্রজারঞ্জন রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কিন্তু বল দেখি, কোন্ রাজা কোন্ সময়ে কেবলমাত্র প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ত্যাগ করতঃ বনবাসে প্রেরণ করিতে পারেন? তার পর কি তিনি ঐশ্বর্য্যভোগে উন্মত্ত হইয়া ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন? যে সীতার

স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই চিরদিন সমভাবে পূজিত; কেবল রাজধর্ম্ম দেখাইবার জন্য তিনি সীতার বাহ্যদেহ ত্যাগ করেন মাত্র। আমরা কেন রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা না করিব? যিনি পরের জন্য এতদূর স্বার্থত্যাগ করিয়া নিজজীবনে ধর্ম্মের এমন জলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখান, যিনি ধর্ম্মের মাহাত্ম্যবর্দ্ধনার্থ নিজ জীবন অনন্ত দুঃখে অতিবাহিত করেন ও অশেষ ক্লেশরাশি বহন করেন, তিনি ঈশ্বর স্থানে কেন না পূজ্য হন বা আমাদের আদর্শপুরুষ হন? সেই ধর্ম্মাত্মার জীবনবৃত্তান্ত বা ঈশ্বরের সেই অবতারের লীলা শ্রবণ করিয়া লোকে কি প্রকৃতরূপ ধর্ম্মশিক্ষা করে না? এস্থলে তাহাদের মনে অবতার সম্বন্ধে যতদূর ভক্তি উদ্রিক্ত, তাহারাও ততদূর ধর্ম্মপথে অগ্রসর ও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণে ততদূর প্রোৎসাহিত। দেখ, এতকাল হিন্দুসমাজে কত সহস্র সহস্র রাজাধিরাজ রামচরিত শ্রবণে প্রজাপুঞ্জের সন্তোষার্থ কত স্বার্থ ত্যাগ করেন এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে উহাদের কেমন পালন করেন! মহাত্মা ঈষা ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন; এজন্য তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মে এত অধিক পূজিত, এমন কি পতিত মানবের উদ্ধারকর্ত্তা। খৃষ্টজগতে তাঁহারই অনুকরণ করিয়া সহস্র সহস্র ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মের জন্য স্বদেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন। মহাত্মা বুদ্ধদেবও সেইরূপ ধর্ম্মের জন্য অতুল সম্পদ ত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধজগতে তাঁহারই অনুকরণ করিয়া অনেকানেক রাজপুত্রগণ অতুল বিভব ত্যাগ করেন এবং শিলাদিত্যাদি নৃপতিবৃন্দ প্রয়াগের সন্তোষক্ষেত্রে বা অন্যান্য স্থলে সর্ব্বস্বদানোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করেন।

এখন দেখা যাউক, ধর্ম্মাত্মা ঈষা, বুদ্ধদেব ও শ্রীরামচন্দ্র, ইহাদের মধ্যে কে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা মানবসমাজের কিরূপ মহোপকার সাধন করেন? ঈষা ও বুদ্ধদেব নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করায় জগৎবিখ্যাত; উভয়েই শিষ্যমণ্ডলী একত্রিত করিয়া গগনভেদিরবে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করেন। কিন্তু রামচন্দ্র শিষ্যমণ্ডলী একত্রিত করিয়া জগতে কোন ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই। অতএব যে স্থলে ঈষা ও বুদ্ধদেব সামান্য কথায় ধর্ম্মোপদেশ দেন,

সেস্থলে রামচন্দ্র কার্য্যতঃ তাহা দেখাইয়া যান; যেস্থলে অলৌকিক ধর্ম্মমত প্রচার করায় ঈষা ও বুদ্ধদেব স্বশিষ্যগণ ও স্বসেবকগণ দ্বারা পূজিত, সেস্থলে রামচন্দ্র অলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করায় সকলের নিকট পূজিত। যাঁহারা সামান্য কথায় অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ দেন, অন্যান্য ধর্ম্ম তাঁহাদের ভালরূপ আদর ও সম্মান করিতে পারে; কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাদের তাদৃশ সম্মান করে না। পরন্তু যাঁহারা অলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য বিখ্যাত, এ ধর্ম্ম তাঁহাদেরই চিরদিন সম্যক সম্মান করে এবং তাঁহাদিগকে সকলের নিকট আদর্শ স্বরূপ দেখায়। ইহারই জন্য রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে হিন্দুসমাজে চিরদিন পূজ্য।

ঈষা ও বুদ্ধদেব কালোচিত ধর্ম্মমত প্রচার করতঃ জগতে নিজ নিজ ধর্ম্ম স্থাপন করেন; আবার উভয়েই স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বসেবকদিগকে যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ দেন। ঈষা ধর্ম্মার্থে স্বজীবন উৎসর্গ করেন, আর বুদ্ধদেব ধর্ম্মার্থে অতুল রাজ সম্পদ উৎসর্গ করেন; তন্মধ্যে ঈষার স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা বুদ্ধদেবের স্বার্থত্যাগ অধিক প্রশংসনীয়। সমাজ-প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্মের অনিষ্ট করেন বলিয়া ঈষা হত হন; পরের অত্যাচার বশতঃ তিনি স্বজীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। এরূপ স্থলে বা এরূপ অবস্থায় সকলেরই ভাগ্যে প্রায় এইরূপই ঘটে। স্বদেশস্থ লোকের অত্যা-চারে সক্রেটিশও জীবন বিসর্জ্জন করেন এবং মহম্মদও জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঈষার প্রাণবিসর্জ্জন তদীয় পরমভক্ত শিষ্যবর্গ দ্বারা অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত। তাঁহারা ঐ ব্যাপারটীকে পতিত মানব-জাতির উদ্ধারের উপায় স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এই প্রকারে তাঁহারা পূজ্যপাদ গুরুর প্রতি অপরিসীম সম্মান প্রদর্শন করেন। ইহাতেই তিনি পাশ্চাত্য জগতে আজ মানবের পরিত্রাতা বলিয়া এতদূর পূজিত এবং ইহাতেই তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্মমত তথায় এতদূর আদৃত। যাহা হউক, তিনি যে আত্মোৎসর্গ করেন, তাহা স্বেচ্ছায় নয়, তাহা পরের অত্যাচার বশতঃ। কিন্তু যে বুদ্ধদেব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্বেচ্ছায় অতুল সম্পদ ও অতুল বিভব বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারই আত্মোৎসর্গ অধিক প্রশংসনীয় ও অধিক শ্লাঘনীয়।

এখন একবার ভাব দেখি, আমাদের ঈশ্বরাবতার রামচন্দ্র কিরূপ আত্মোৎসর্গ করেন! সত্য বটে, তিনি শিষ্যমণ্ডলী একত্রিত করিয়া নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করতঃ ধর্ম্মজগতে কিছুই আন্দোলন করেন নাই; কিন্তু তিনি স্বজীবনে অলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক লোক-বর্গকে অলৌকিক ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া যান; তিনি স্বজীবনে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা সনাতন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম্মের অনন্ত জয় ঘোষণা করেন। বিশেষতঃ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়-দেশে পালিত হইয়া অশেষ প্রলোভনের মধ্যে ঐরূপ অলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অতীব কঠিন কর্ম্ম। যিনি সত্য কথার মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে জলাঞ্জলি দিতে পারেন এবং যিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজধর্ম্ম দেখাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহারই আত্মোৎসর্গ, তাঁহারই স্বার্থ-ত্যাগ জগতে অতুলনীয়, তিনিই জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা। এ জন্য হিন্দুধর্ম্মও তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে চিরদিন পূজা করে এবং সকলের আদর্শ স্বরূপ দেখায়। অতএব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, ঈষা ও বুদ্ধদেব অপেক্ষা রামচন্দ্র যথার্থ ধর্ম্মোপদেশক এবং তাঁহারই আত্মোৎসর্গ সকলের অপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়।

এ স্থলে কতকগুলি ধর্ম্মধ্বজী পুরুষ, যাঁহারা ধর্ম্মের বিকৃত অর্থ করেন, তাঁহারা বলেন, যে রামচন্দ্র নিরাপরাধ বালীকে সংহার করিয়া ও অপরাধী রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করেন, তিনি কি প্রকারে ধর্ম্মবিষয়ে আমাদের আদর্শপুরুষ হন? আমরা কি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া নরহত্যা করিব এবং নরশোণিতে ধরাতল প্লাবিত করিয়া মানব-জাতির অশেষ দুঃখ আনয়ন করিব? আমরা নিভৃতে ও নির্জ্জনে ঈশ্বরের আরাধনা করিব, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধন করিব ও সশরীরে স্বর্গারোহণ করিব; আমরা কেন রামের ন্যায় নরহত্যা করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে যাইব? অতএব আমরা রামচন্দ্রকে কদাচ মহাপুরুষ বলিতে পারি না। যাহা হউক, তাঁহাদের বুঝা উচিত, যিনি সাধারণের আদর্শ পুরুষ, তিনি নিজ-জীবনে গার্হস্থ্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখান; আর যিনি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়-

জাতির আদর্শ পুরুষ, তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ করেন, দুষ্কর্ম্মশালিদিগের সংহার করেন এবং জগতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেন।

রামায়ণে পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা শিক্ষা করা যায়। এখন একবার ভারতের সেই চিরাদৃতা আদর্শসতী, সেই চিরদুঃখিনী সীতার কথা ভাব দেখি। যে অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী রাজার কন্যা, রাজার বধূ ও রাজার ভার্য্যা হইয়া অতুল ভোগৈশ্বর্য্যে লালিতা ও পালিতা, যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যাশয়নে চিরাভ্যস্তা, তিনি যৌবনে পরমারাধ্য প্রাণপতির শ্রীচরণকমলসেবার জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া শ্বাপদসমাকুল কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গলে ভ্রমণ করেন ও স্থণ্ডিলশায়িনী হন। পতিসেবার জন্য কে কোথায় এমন সুদীর্ঘ কাল বনবাসের অশেষ ক্লেশরাশি বহন করে? কেবলই কি বনবাস? আবার সেই প্রাণসম পতি হইতে বিয়োজিতা হইয়া পরগৃহে নীতা, পালিতা ও অশেষ প্রলোভনে প্রলোভিতা হন। এত বিপদরাশির মধ্যেও তিনি স্বীয় সতীত্বধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেন এবং তাঁহারই অনুকরণ করিয়া আবহমান কাল হিন্দুসমাজে কত লক্ষ লক্ষ মনস্বিনী সীমন্তিনী সতীত্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন!

আহা! সীতার জীবনে কি দুঃখের ছবি অঙ্কিত! তাঁহার চিরজীবন কিরূপ দুঃখে অতিবাহিত! তাঁহার সুকোমল হৃদয়ে কিরূপ দুঃখের তুষানল চিরপ্রজ্বলিত! অভাগিনী সীতার জীবনবৃত্তান্ত ভাবিলে কাহার না শোকসাগর উথলিয়া পড়ে? বাল্যকালে তিনি স্নেহময়ী জননীর স্নেহ জানেন না। বিবাহের পর কিছুদিন তিনি স্বামীসহবাসে রাজভোগে থাকেন। যখন প্রাণসম স্বামী পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী, তিনিও স্বেচ্ছায় বনবাসিনী ও তাঁহার দুঃখে প্রকৃত দুঃখিনী। কিন্তু এ সুখেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিতা করেন। দুর্বৃত্ত দশাননকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া তিনি লঙ্কাপুরে নীতা হন। তথায় তিনি কিরূপ দুঃখে দিন অতিবাহিত করেন ও কিরূপ প্রলোভনে প্রলোভিতা হন! দেবতাগণ যে দশাননের পদানত, তাঁহারই সমক্ষে তিনি এক অবলা হইয়া নিজ সতীত্ব রক্ষা করেন। রাবণবংশ ধ্বংস হইলে পর, আপনার সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি অগ্নিপরীক্ষা দেন, পরে স্বামীকর্ত্তৃক গৃহীতা ও স্বভবনে নীতা হন। রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া

তিনি কয়েকদিবসমাত্র রাজভোগে থাকেন। পুনরায় ধর্ম্মের জন্ত প্রেমময় পতিকর্ত্তৃক বনবাসে প্রেরিতা হন এবং তথায় পুত্রদ্বয় প্রসব করিয়া ইক্ষ্বাকু-বংশ রক্ষা করেন। দ্বাদশ বৎসরের পর পুত্রদ্বয়কে স্বামিহস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি বসুন্ধরা মাতার ক্রোড়দেশে আশ্রয় লন ও দুঃখের জীবন উৎসর্গ ও অবসান করেন। বল দেখি, অভাগিনী সীতার জীবন কিরূপ দুঃখময়! কিন্তু বাল্মীকির গুণে, হিন্দুধর্ম্মের গুণে সেই সীতার প্রতিমূর্ত্তি চিরদিন হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়মন্দিরে স্থাপিত ও পূজিত। যুগযুগান্তে কত কোটী কোটী হিন্দু নরনারী সেই দুঃখের জীবন পাঠ ও শ্রবণ করিয়া কিরূপ অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিঞ্চন করেন! পাঠকগণ! এই নয়নবারি কি এতকাল অনর্থক বিগলিত? মানবহৃদয় কি ইহাতে ভাবে গদগদ হইয়া কোনরূপ উচ্চশিক্ষা পায় নাই বা পাইবে না?

কোথায় হে আদিগুরো বাল্মীকি! ধন্য তোমার কল্পনাশক্তি! তুমি রামায়ণ রচনা করিয়া আমাদিগকে চিরদিনের জন্য কিরূপ দুঃখে কাঁদাইয়াছ? যখন শ্রীরামচন্দ্র চীরবল্কল ধারণ করিয়া বনবাসার্থ স্নেহময়ী মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন কৌশল্যাদেবীর রোদন দেখিয়া আমাদের বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়। যখন পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ রাজা দশরথ অন্ধমুনিপুত্রের হত্যার জন্য গতানুশোচনায় দগ্ধ হইয়া পুত্রশোকে প্রাণবিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁহার দুঃখে আমাদের বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়। যখন জানকীদেবী দুর্বৃত্ত দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা হন এবং রামচন্দ্র প্রাণপ্রেয়সী হারাইয়া ও তদীয় শোকে বিকল হইয়া রোদন করেন, তাঁহার শোকাবেগ ও রোদন দেখিয়া আমাদের বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়। যখন বিদেশে বিভূমে সেই কাল সমরক্ষেত্রে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হন এবং রামচন্দ্র তাঁহাকে ক্রোড়দেশে লইয়া ভ্রাতৃশোকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন, তখন তাঁহার সেই ক্রন্দনধ্বনিতে আমাদের বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়। যখন বাল্মীকির আশ্রমে দেবর লক্ষ্মণ সীতাদেবীর নিকট আর্য্যপুত্রের বনবাসাদেশ শ্রবণ করান এবং সীতাদেবীও অসহ্য শোকে অভিভূত হইয়া নিজ দুরাদৃষ্টের দোষারোপ করতঃ ও নিজ শিরে করাঘাত করত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন, তখন তাঁহার সেই ক্রন্দনধ্বনিতে আমাদের বক্ষঃ-

স্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়। হে আদিগুরো! এইরূপ কত জায়গায় তুমি আমাদিগকে চিরদিনের জন্য কাঁদাইয়াছ! আমরাও চিরদিন কাঁদিতেছি ও কাঁদিব। এ দুঃখের সংসারে ক্রন্দনেই আত্মার উন্নতি, মনের উন্নতি ও সমাজের উন্নতি।

রামায়ণে ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা উপদিষ্ট। লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি জগতে অতুলনীয়। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের আজীবন যেরূপ কায়মনো-বাক্যে সেবা করেন ও তাঁহার বিপদে যেরূপ বিপন্ন ও তাঁহার দুঃখে যেরূপ দুঃখিত হন এবং ভরতও ভ্রাতৃভক্তি প্রদর্শনার্থ যেরূপ স্বার্থত্যাগ করেন, তাহা ভাবিলে কাহার না শরীর রোমাঞ্চে পূর্ণ হয়? কোথায় হে আদর্শভ্রাতঃ প্রাতঃস্মরণীয় লক্ষ্মণ! বাল্যকাল হইতেই তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দক্ষিণ হস্ত, তাঁহার সুখে সুখী ও তাঁহার দুঃখে দুঃখী। কেবল ভ্রাতৃসেবার জন্য তোমার জন্মগ্রহণ ও ভ্রাতৃসেবায় তোমার জীবন অতিবাহিত। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ সস্ত্রীক বনে গমন করেন; তুমি কেন স্নেহময়ী জননী ও প্রাণ-প্রেয়সী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত বনবাসের অশেষ কষ্টরাশি বহন করিলে? কেন তুমি সেই কালসমরে শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে বসিলে? তুমি কি মনে করিলে রাজভবনে অতুল ঐশ্বর্য্যে দিন যাপন করিতে পারিতে না? তবে কেন তুমি এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য এত কষ্টভোগ ও এত যন্ত্রণাভোগ করিলে? রে লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য! ধন্য তোমার পবিত্র জীবন! তুমি সংসারের কোটী কোটী মানবকে কিরূপ ভ্রাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃসেবা শিখাইয়াছ! তোমারই অনুকরণ করিয়া এতকাল ভারতের কত সহস্র সহস্র রাজভ্রাতা অপার ভ্রাতৃভক্তি প্রদর্শন করেন ও মুসলমান সম্রাটদিগের ন্যায় সামান্য সিংহা-সনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধে লিপ্ত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করতঃ নরশোণিতে দেশ প্লাবিত করেন না!

আর কোথায় হে রামভ্রাতঃ পূজ্যপাদ ভরত! তুমিও নিজজীবনে ভ্রাতৃ-ভক্তির কি পরাকাষ্ঠা দেখাও? কে কোথায় শুনেছে, কে কোথায় দেখেছে, পিতৃমাতৃদত্ত রাজ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতার খাতিরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপভোগ করেন না? কে কোথায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাদুকাদ্বয় সিংহাসনোপরি স্থাপনপূর্ব্বক উহাদের নিকট যোড়হস্ত হইয়া তাঁহার ভক্ত সেবকস্বরূপ তাঁহার রাজ্যের তত্ত্বাবধান

করেন ? অনেক দেশের অনেক ইতিহাস পাঠ করা গিয়াছে ; কিন্তু কোথাও ভ্রাতৃভক্তির এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত, ইহার জন্য এতদূর স্বার্থত্যাগ দেখি নাই ! কোথায় হে ভরত ! তোমার এ কি বিবেচনা, যে স্নেহময়ী জননী তোমার জন্য রাজসিংহাসন অদ্ভুত উপায়ে লাভ করেন, তাঁহার প্রতি তুমি আদৌ কৃতজ্ঞ হও না ! পরন্তু যে মাতার কুব্যবহারে পূজ্যপিতা দেহত্যাগী ও পূজ্যভ্রাতা দেশত্যাগী হন, সেই মাতার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার মুখ দর্শন কর না এবং অযোধ্যায়ও প্রত্যাগমন কর না ! এই প্রকারেই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এ সংসারে দেখাইতে হয় !

এখন জিজ্ঞাস্য, হিন্দুদিগের ভিতর অলৌকিক গুণসম্পন্ন রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতারজ্ঞানে পূজিত হওয়ায় হিন্দুসমাজের কি কোনরূপ মহোপকার সাধিত ? এখন মহর্ষি বাল্মীকিই রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপাদন করুন, অথবা উত্তরকালে রামভক্ত কবিগণ তাঁহার লোকাতিগগুণদর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্লোকগুলি রামায়ণে প্রক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করুন, যিনিই করুন না কেন, এরূপ করাতে সমগ্র হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত। জনসাধারণকে উত্তমরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্যই অশেষগুণসম্পন্ন রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজিত ; যাহাতে সকলে রামচরিত অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিয়া সকল বিষয়ে তদনুকরণ করতঃ সংসারযাত্রা সুখে যাপন করিতে পারে, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ হিন্দুযুবকের অপার পারিবারিক সুখ, তাঁহার অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র ও স্বপত্নীপ্রেম এবং হিন্দুমহিলার অসাধারণ পতিপরায়ণতা ও পতিসেবা একমাত্র রামায়ণ হইতে উদ্ভূত। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি রামায়ণের মাহাত্ম্য বুঝেন না, তাঁহার জীবনে শতধিক্ !

অন্যান্য দেশে লোকে কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা করে, কিন্তু সে শিক্ষা ততদূর ফলদায়ক হয় না। গ্রীশ দেশে হোমারও বাল্মীকির ন্যায় ইলিয়াড্ রচনা করেন। কিন্তু কয়জন লোক ইলিয়াড্‌পাঠে যথার্থরূপ উপকৃত ? ফলতঃ বাল্মীকির গুণে, হিন্দুধর্ম্মের গুণে হিন্দুসমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রামচরিতামৃত পান করতঃ ধর্ম্মপিপাসা শান্ত করেন ও যথার্থ

ধর্ম্মশিক্ষা করেন। যদি শাস্ত্রকারেরা রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া আমাদের পূজ্য না করেন, রামায়ণের এতাদৃশ গৌরব বৃদ্ধি হয় না এবং হিন্দুসমাজও রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ দ্বারা এতদূর উপকৃত হয় না। অতএব হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্যই শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার বলিয়া চিরদিন পূজিত এবং সেই সঙ্গে রামায়ণও চিরদিন পূজিত।

কৃষ্ণাবতার।

কৃষ্ণ নামোল্লেখেই কেহ কেহ নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া বলেন 'আর ছ্যা!' লম্পটশিরোমণি, ধূর্ত্ত, শঠ গোপপুত্রের কথা কেন এই বিংশশতাব্দীতে উত্থাপন কর? বহুদিন হইতে চলিল, যে সকল কথা অশ্লীল বলিয়া সকলের অশ্রোতব্য, আজ আবার সেই সকল পাপকথা কেন মুখে আন? যিনি ষোড়শসহস্র গোপিনী লইয়া প্রকাশ্য হাটবাজারে রঙ্গরস ও প্রেমলীলা করেন, তাঁহারই কি অশ্লীল কথা, তাঁহারই কি পাপকথা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় অপবিত্র করিতে হইবে? আর হিন্দুধর্ম্ম! তোমায় শতধিক্! যিনি বংশী বাজাইয়া কুলস্ত্রী মজান, তিনি হন তোমার পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার! সকল বিষয়ে চাতুর্য্য প্রকাশই যাঁহার রাজনীতির মূলমন্ত্র, তিনি হন তোমার নিকট সকলের আদর্শপুরুষ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? সাধে কি অন্যান্য ধর্ম্ম তোমার গলদেশে পদার্পণপূর্ব্বক তোমার অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহে?

যাঁহারা কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে ঐরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা ইহার বিন্দুবিসর্গ বুঝেন না। তাঁহারা কেবল কুশিক্ষাবশতঃ কতকগুলি কুসংস্কার নিজমনে বদ্ধমূল করেন মাত্র। দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণাবতারের গূঢ় রহস্য কি, তাহা তাঁহারা বুঝিতে একবারও চেষ্টা করেন না। হিন্দুধর্ম্মের যে স্থলটী তাঁহারা অতীব অশ্লীল ও ঘৃণাস্পদ মনে করেন, সেই স্থলেই ইহার সর্ব্বোচ্চ স্বর্গীয়ভাব ও চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত। কৃষ্ণাবতার কল্পনা করায় হিন্দুধর্ম্ম পার্থিব হইলেও প্রকৃতরূপ স্বর্গীয় ও সকল ধর্ম্মের মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

মানবমনের প্রকৃত উৎকর্ষসাধনের জন্য, ইহার সাত্ত্বিকভাবের প্রকৃত স্ফূর্ত্তির জন্য, ইহাকে পরাপ্রেম ও পরাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য, ইহাকে

আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিবার জন্য, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণাবতার দেখায় এবং ইহার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার। কোন দেশের কোন ধর্ম্ম ঈশ্বরের এমন আনন্দময় রূপ কল্পনা করিতে পারে নাই। এক কৃষ্ণাবতার দেখাইয়াই হিন্দুধর্ম্ম স্বসমাজকে আনন্দে উৎফুল্ল ও উন্মত্ত করায়। ইহাতে শোকের উচ্ছ্বাস নাই, দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস নাই; আছে মাত্র কেবল আনন্দোচ্ছ্বাস, আনন্দাশ্রু ও আনন্দোন্মাদন!

রামাবতারে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে যেরূপ কাঁদায়, কৃষ্ণাবতারে ইহা আমাদিগকে তেমনি হাসায়। রামাবতারে ইহা যেমন হৃদয়ের শোকসাগর উথলিয়া দেয়, কৃষ্ণাবতারে ইহা তেমনি আমাদিগকে হর্ষসাগরে ভাসমান করায়। রামাবতারে ইহা যেমন গার্হস্থ্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দেয়, কৃষ্ণাবতারে ইহা তেমনি ভক্তি ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দেয় ও মনের সাত্ত্বিকভাব সম্যক স্ফুরণ করে। রামাবতারে ইহা যেমন আমাদিগকে কাঁদাইয়া ধর্ম্মপথে লইয়া যায়, কৃষ্ণাবতারে ইহা তেমনি আমাদিগকে হাসাইয়া ধর্ম্মপথের পথিক করে।

কৃষ্ণাবতারে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দেয়, তাহা অন্যান্য ধর্ম্ম আদৌ জানে না, বা আদৌ বুঝিতে পারে না। এই দুঃখময় ভবসংসারে মানবকে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া তাঁহাকে চিরদিন হাসাইব ও তাঁহার অশেষ শোকদুঃখ নাশ করিব, অথচ তাঁহার মনে ঈশ্বরের উপর পরাপ্রেম ও পরাভক্তি স্ফুরণ করত, তাঁহাকে যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক করিব, ইহাই শ্রীকৃষ্ণাবতারের গূঢ় রহস্য। যে ভক্তিযোগ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ভক্তবৎসল হরির তন্ময়ত্ব লাভের অভিলাষী, তাঁহার প্রতি যে অনন্যভক্তিদ্বারা তিনি নিজ আত্মা ও মনের উন্নতিসাধনে একান্ত ব্যগ্র, তাহাই কৃষ্ণাবতারে ভালরূপ উপদিষ্ট।

যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ধর্ম্মের জন্য চিরদিন পাগল, যিনি ইহসংসারে ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, যিনি স্বীয় ধর্ম্মোন্নতির জন্য আপনাকে দেবমণ্ডলীতে পরিবৃত করেন, যিনি মানবধর্ম্মের বিশ্বোদার ভাব ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি কি ঈশ্বরকে একভাবে ভাবিয়া সন্তুষ্ট? তিনি কি মনের সকল ভাবে ও শরীরের সকল কর্ম্মে একমাত্র ঈশ্বর অন্বেষণ করিবেন না? যদি তুমি

ঈশ্বরকে মনের সকল ভাবে না দেখ, না ভাব ও না জান, তোমার কি ঈশ্বরভাবনা, ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরজ্ঞান হয়? একদেশদর্শী খৃষ্টাদি ধর্ম্ম ঈশ্বরকে একভাবে ভাবিয়া বা দেখিয়া সন্তুষ্ট; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সর্ব্বগ্রাহী হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরকে সেইরূপ ভাবিয়া কদাচ সন্তুষ্ট নয়। অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বরকে একভাবে ভাবে বলিয়া উহাদের প্রকৃত উন্নতি নাই, প্রকৃত স্ফূর্ত্তি নাই। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মনের সকল ভাবে ঈশ্বর ভাবে বলিয়া ইহার এত উন্নতি, এত স্ফূর্ত্তি এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতাও এত অধিক স্ফুরিত! সত্য বটে, ঈশ্বরকে একভাবে ভাবিলে এবং সেই ভাবে ভাবিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারিলে, সময়ে সময়ে সাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়; কিন্তু ইহাতে আমাদের মনে সেই এক ভাবের অধিক স্ফুরণ হয় এবং অন্যান্য ভাব অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়। যখন মনের সাত্ত্বিকভাবগুলির বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি করাই ঈশ্বরারাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন উহা দ্বারা যাবতীয় সাত্ত্বিকভাবের সম্যক স্ফূর্ত্তি করাই আমাদের জীবনের মুখ্য ব্রত। অতএব ভক্তি, বাৎসল্য, প্রেম, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি যতগুলি সাত্ত্বিকভাব মানবহৃদয়ে বর্ত্তমান, সকল ভাবেই ঈশ্বরকে ভাব এবং তাঁহার শ্রীচরণ কৃপায় উহাদের সম্যক স্ফূর্ত্তি কর। ঐ সকল শ্রেষ্ঠ ভাবাবলি আমাদের অনন্ত সুখের আকর; ইহারা সম্যক অনুশীলিত হইলে, আমরা অনন্ত সুখে সুখী হই। এখন ঐ সকল সাত্ত্বিক ভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তোমায় শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবানের প্রেমাবতার দেখায় এবং তাঁহার অপার প্রেমলীলা কবির সুললিতকণ্ঠে গান করাইয়া তোমার কর্ণবিবরে অমৃত সিঞ্চন করায়। এক শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলায় মানবমনের বিবিধ সাত্ত্বিকভাব পূর্ণভাবে প্রকটিত। যাঁহারা কেবল নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করেন, তাঁহারা কি হিন্দুধর্ম্মের এই স্বর্গীয়ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম?

কলিযুগে শিশ্নোদরপরায়ণ মানব পুত্রকলত্রাদি অনিত্য বস্তু লইয়াই বিব্রত; তজ্জন্য কখনও বা তিনি সুখসাগরে ভাসমান, কখনও বা তিনি দুঃখসাগরে নিমগ্ন। সেই কলিকলুষিত মানব যাহাতে ঈশ্বরের মধুর নামে কেবল অপার আনন্দে ভাসমান হন এবং যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্যাদি রস সেই নামে উথলিয়া পড়ে, তজ্জন্য হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের মোহন

মূর্ত্তি দেখায়। এই শ্রীকৃষ্ণের নামে তিনি আজ ব্রহ্মানন্দে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করেন; এই শ্রীকৃষ্ণের নামে তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্যাদি রস শতসহস্র ধারে উথলিয়া পড়ে। রে হিন্দুধর্ম্ম! তুমিই ধন্য! তুমিই এ জগতে একমাত্র সত্য ধর্ম্ম! তুমি আমাদিগকে ঈশ্বরের নামে যে ভাবে হাসাও, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে স্বসেবকদিগকে হাসায় বল? তুমি আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি অনন্যভক্তি প্রদর্শন করিতে যেরূপ শিখাও, এমন কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে শিখায় বল? দেখ, মানবহৃদয়ের যে স্বাভাবিক প্রেম অন্যান্য সমাজে স্ত্রীসম্ভোগাদি অশ্লীলকর্ম্মে প্রযুক্ত হওয়ায় উহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে পরিণত, সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে তুমি ভগবানে অর্পণ করিয়া উহার অপূর্ব্ব স্বর্গীয়ভাব স্ফুরণ কর এবং সকলের অপরিহার্য্য ও দুষ্পূরণীয় প্রেমপিপাসাকে ভগবানের নামে তৃপ্তি করাইয়া তাহাদিগকে যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক কর। যে বাৎসল্যভাব সন্তানাদির লালনপালনে প্রযুক্ত, সেই বাৎসল্যভাব ভগবানে অর্পণ করাইয়া তুমি আমাদিগকে তাঁহার কিরূপ সেবা করিতে শিক্ষা দেও? এস্থলে ম্লেচ্ছ মুসলমানধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম শতমুখে তোমার নিন্দাবাদ করুক, কিন্তু তুমিই উহাদের অপেক্ষা সত্যপথে অধিক অগ্রসর।

প্রেমবাৎসল্যাদি হৃদয়ের ভাবগুলি আমাদের যেরূপ অশেষ সুখের আকর, তেমনি উহারা আবার অশেষ দুঃখের আকর। স্ত্রীপুত্র লইয়া আমরা যেমন সময়ে সময়ে আনন্দার্ণবে ভাসমান, তেমনি উহাদের লইয়া সময়ে সময়ে শোকসাগরে নিমগ্ন। ঐহিক বস্তুমাত্রেই ভালমন্দে মিশ্রিত ও সুখদুঃখে জড়িত। প্রেম ও বাৎসল্য ঐহিকপদার্থে অর্পিত হইলে, উহারা ক্রমশঃ কলুষিত হয় এবং আমাদিগকে সুখদুঃখের ভাগী করে। কিন্তু ঐ সকল ঐহিকভাব ঈশ্বরে অর্পিত হইলে, উহারা স্বর্গীয়ভাব ধারণ করে এবং আমাদিগকে অপার ব্রহ্মানন্দে নৃত্য করায়। ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে হরির প্রেমে উন্মত্ত করায় এবং বাৎসল্যভাবে তাঁহার সেবা করিতে উপদেশ দেয়। বল দেখি, যিনি হরির প্রেমে উন্মত্ত, তিনি কি সংসারের শোকতাপে দগ্ধ? যাঁহার ঘরে বালগোপাল বিরাজমান, তিনি কি সামান্য পুত্রশোকে কাতর? যাঁহার গৃহে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান, তিনি কি সামান্য স্ত্রীবিয়োগে কাতর?

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর। আমরা হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি তাঁহাতেই অর্পণ করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণকমলের অনুকম্পায় উহাদের ভালরূপ স্ফূর্ত্তি করি এবং তাঁহারই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন লীলা শ্রবণ, পঠন, মনন, অনুচিন্তন ও ধ্যান করিয়া আমরা ঐ সকল ভাবের সম্যক অনুশীলন করত অনুক্ষণ প্রেমানন্দে ও ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল হই। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের এমন আনন্দময়রূপ কোন দেশে কোন ধর্ম্ম কোন কালে কল্পনা করিতে পারে নাই। বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শসহস্র গোপিনিগণের মধ্যে শ্রীরাধার সহিত বংশী বাজাইতে বাজাইতে জগৎময় প্রেম বিতরণের জন্ম ত্রিভঙ্গে নৃত্য করেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত সাধকও উর্দ্ধবাহু হইয়া ত্রিভঙ্গে নৃত্য করেন! আহা! মরি! মরি! কবির কি কল্পনা রে! ভাবুক ধর্ম্মাত্মার কি ভাবাভিনয় রে! রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তিদর্শনে কাহার না হৃদয়ে অতুলপ্রেম উথলিয়া পড়ে এবং কাহার না আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে থাকে? দেখ, এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে, এই ঘোর দুর্দ্দিনে কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি পাইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ আজ প্রেমে ও আনন্দে কিরূপ উন্মত্ত! যে ভারতমাতার পদযুগল পরাধীনতারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাঁহারই মস্তকোপরি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি স্থাপিত; তজ্জন্ম তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করেন ও দুঃখের দিন বিস্মৃত হন।

যথার্থ বলিতে কি, কৃষ্ণচরিত কল্পনায় হিন্দুধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত। যিনি কৃষ্ণচরিত ভালরূপ বুঝেন, তিনিই ইহাতে চিরদিন মজেন। সমগ্র জগৎ অন্বেষণ কর, সকল দেশের ধর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা কর, কোথাও ধর্ম্মের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, এমন সর্ব্বমনোহর দৃশ্য তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। খৃষ্টধর্ম্ম বল, মুসলমানধর্ম্ম বল, বৌদ্ধধর্ম্ম বল, সকলই কৃষ্ণচরিতের জন্ম হিন্দুধর্ম্মের নিকট পরাস্ত। জগতে কোন ধর্ম্মই মানবকে ঈশ্বরের মাঝে এমন প্রেমোন্মত্ত, এমন আনন্দোন্মত্ত করিতে পারে নাই, তাঁহাকে এতদূর হাসাইতে পারে নাই। এক কৃষ্ণচরিতে হৃদয়ের যাবতীয় রস শত সহস্রধারে বিগলিত, ক্ষরিত ও নিঃসৃত। নন্দের ব্রজ! নন্দের গোকুল! গোপীনাথ! গোপীবল্লভ! রাধারমণ! রাধেশ্যাম! এই সকল প্রেমোন্মাদক নামে কেন হৃদয় এখন শিহরিয়া উঠে? পাশ্চাত্য-

বিস্তার প্রখরকিরণে আজ হৃদয়ের আনন্দোৎস শুষ্কপ্রায়; তথাচ ঐ সকল মধুর নামে এখনও হৃদয়চকোর নৃত্য করিয়া উঠে।

কোথায় হে বৈষ্ণবগুরো পূজ্যপাদ চৈতন্যদেব! কোথায় হে কলিকালের গৌরাঙ্গ অবতার! তুমি দুঃখিনী বঙ্গমাতাকে হরির কি মধুর নাম শুনাইয়াছ! তাঁহাকে হরির প্রেমে কিরূপ নৃত্য করিতে শিখাইয়াছ! ধন্য তোমার অপার হরিভক্তি! ধন্য তোমার হরিপ্রেমোচ্ছ্বাস! ধন্য তোমার প্রেমোন্মাদক হরিসংকীর্ত্তন! এমন সঙ্গীত কে কোথায় শ্রবণ করে? এমন নর্ত্তন কে কোথায় দর্শন করে? ওহে ইংরাজ! তুমি আমাদের হরিসংকীর্ত্তন দর্শনে হাস্য সম্বরণ কর না। তোমার নয়নে তোমার বল্ (Ball) সর্ব্ব প্রেমোন্মাদক; যখন তুমি বিবিজানের সহিত ত্রিভঙ্গে নৃত্য কর, তখন তুমি সঙ্গিনীর অপরূপ রূপ দর্শনে কামোৎফুল্ল-লোচনে অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হও। তোমার চক্ষে আমাদের ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ততা কেন ভাল লাগিবে? তুমি আমাদের হরি সংকীর্ত্তনের মহিমা কি বুঝিবে? যদি সংসারের কোন বস্তুতে পাষাণ দ্রবীভূত হয় বা বজ্র বিদীর্ণ হয়, সে এই হরিসংকীর্ত্তনে। এমন করুণারসোদ্দীপক, এমন প্রেমোন্মাদক সঙ্গীত কোন জাতি কোন কালে কল্পনা করিতে পারে নাই।

কোথায় হে কোম্‌তদেব! তুমি তোমার প্রত্যক্ষবাদী-বৈজ্ঞানিকধর্ম্মে প্রেমের স্ফূর্ত্তির জন্য স্ত্রীজাতির আরাধনা করিতে উপদেশ দেও। কোথায় হে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ! তোমরাও আজ প্রেমের স্ফূর্ত্তির জন্য স্ত্রীজাতির অবাধপ্রেমের অনুমোদন কর! ছি! ছি! একটা সামান্য ঐহিক অনিত্য বস্তুতে এত ভালবাসা দেখাইলে কি তোমাদের প্রেমপ্রবৃত্তি যথার্থরূপে স্ফুরিত হয়? ইহাতে তোমরা কেবল বাহ্যিক চাকচিক্যময় স্ত্রীসৌন্দর্য্যসাগরে অবগাহন কর এবং নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তিকে অযথা চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগকে পশুর অধম করিয়া ফেল। যে অধর্ম্মরূপিনী নারী-জাতি এখন তোমাদের পরমারাধ্যা দেবী ও যাহাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য তোমরা সদা ব্যগ্র, সেই নারীজাতির উপর অপার প্রেম দেখাইলে কি তোমরা পশুর সমান হও না? হৃদয়ের সেই প্রেমটুকু ভগবানের উপর দেখাও, তোমরা ইহ সংসারেই স্বর্গের দেবতা হইবে!

কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে যে প্রেম হৃদয়ে এখন অধিক স্ফুরিত, যাহা অনুশীলন করিয়া আমরা পশুতুল্য, সেই প্রেম হিন্দুধর্ম্ম ভগবানে দেখাইয়া আমাদিগকে দেবতুল্য করিতে চাহে। দেখ, শিল্বনমিশ্র প্রথমে নারীর প্রেমে কতদূর মজেন! তিনি স্ত্রীর প্রেমে এতদূর আসক্ত হন যে, পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ দিবসে প্রবলঝটিকার মধ্যে শবোপরি আরোহণপূর্ব্বক তরঙ্গময় যমুনা পার হন এবং সর্পপুচ্ছাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ প্রাণপ্রেয়সীর নিকট যান। ভার্য্যার সামান্য উপদেশে সেই রাত্রেই সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মজেন। সেই গুণে আজ তৎকৃত শান্তিশতকপাঠে কত লোকে সংসারের অশেষ দুঃখের মধ্যে প্রকৃত শান্তির পথ দেখেন!

নবযুগের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণচরিত কাল্পনিক। সত্য বটে, যদুবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ক্ষত্রিয়সমাজে গণ্য, মান্য ও সমধিক পূজ্য হন; কিন্তু তাঁহার ব্রজলীলা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় উত্তরকালীন কবিগণের কল্পনাপ্রসূত। তাঁহারা এতদূর বলেন, বৃন্দাবনে শ্রীরাধাও জন্মগ্রহণ করেন না ও ষোড়শসহস্র গোপিনীও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আসক্ত হয় না। ইহারা কেবল কবির কল্পনা। ইংরাজের চক্ষে বিবিধ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া তাঁহারা ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত। মহাভারতের আস্তরে কৃষ্ণচরিত যেরূপ, ইহার দ্বিতীয়স্তরে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক এবং ইহার তৃতীয়স্তরে আরও অধিক পৃথক; মহাভারতে যেরূপ, ভাগবতে তাহা হইতে পৃথক এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহা হইতেও পৃথক। মহাভারতে গোপিনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নাই এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার কাহিনী নাই। অতএব কৃষ্ণচরিতের ব্রজলীলা সর্ব্বৈব কাল্পনিক।

কৃষ্ণচরিত কাল্পনিক হউক বা অকাল্পনিক হউক, ইহা হিন্দুহৃদয়ে স্তরে স্তরে বিনির্ম্মিত। সাধারণ হিন্দুসমাজে ভক্তি ও প্রেম যেরূপে বিকসিত, কৃষ্ণচরিতও তদনুরূপ ক্রমবিকাশে হিন্দুসমাজে ক্রমবিকসিত ও স্ফুরিত। যাহা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বিরচিত, তাহা হিন্দুসমাজের জ্ঞানোন্নতির সহিত, ধর্ম্মোন্নতির সহিত হিন্দুহৃদয়ে ক্রমবিকসিত। ইহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে কৃষ্ণচরিতের ভিন্ন ভিন্ন স্তর দৃষ্ট হয়।

মনে কর, কৃষ্ণচরিত কাল্পনিক, তাহাতেই বা হিন্দুসমাজের কি ক্ষতি? কাল্পনিক হউক, অকাল্পনিক হউক, বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, যখন সাধারণ হিন্দুসমাজ এতকাল ইহাকে অপারভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করে এবং ইহার অনুশীলন করিয়া প্রেমানন্দে ও ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল, তখন ইহা সকলের নিকট আপ্তবাক্যস্বরূপ কাল্পনিক হইলেও প্রকৃত অকাল্পনিক এবং মিথ্যা হইলেও যথার্থ সত্য। তবে কেন তোমরা কৃষ্ণচরিত কাল্পনিক বলিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত? পাশ্চাত্যবিদ্যার যে কালানলে তোমাদের কালামুখ দগ্ধ, সেই কালানলে কি সমগ্র সমাজ দগ্ধ করিতে চাহ? আরও দেখ, যাহা কোন বিষয়ের পূর্ণ আদর্শ (Ideal perfection) তাহা বাস্তব জগতে নয়নগোচর হয় না, তাহা সকল দেশে প্রকৃতির কবিগণ কল্পনাজগৎ অনুশীলন করিয়াই সকলের সমক্ষে ধারণ করেন। তাঁহারা কাব্যনাটকাদি রচনা করিয়া ভাবাদিবিষয়ে সকলকে যে শিক্ষা দেন, তাহাও কল্পনাজগৎ হইতে গৃহীত। সেইরূপ এদেশেও ধর্ম্মাত্মা কবিগণ কল্পনাজগৎ অনুশীলন করিয়াই প্রেমধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ আমাদিগকে দেখান। যেমন সয়তানের সহিত ঈশ্বরের মহাযুদ্ধ কাল্পনিক হইলেও খৃষ্টজগতে মহাসত্য, সেইরূপ ব্রজলীলাদি কাল্পনিক হইলেও আমাদের নিকট মহাসত্য। যেমন অন্যান্য দেশে যে সকল কাব্যনাটকাদি ভাববিষয়ে সকলকে ভালরূপ শিক্ষা দেয়, তাহা জ্ঞানজগতের অমূল্যনিধি; সেইরূপ হিন্দুসমাজে পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে প্রেমাদি ধর্ম্ম পূর্ণভাবে বিকসিত, তাহাও আমাদের ধর্ম্মজগতের অমূল্যনিধি ও জাতীয় সম্পত্তি। অতএব যে ব্রজলীলাদি দ্বারা হিন্দুসমাজ এতকাল আনন্দে উৎফুল্ল, সমাজের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া, উহাদিগকে কাল্পনিক বলাই সর্ব্বথা অনুচিত। যাঁহারা ঐরূপ ভাবেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মদ্রোহী ও স্বসমাজদ্রোহী। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ সকল পাপকথা মুখে আনাই অনুচিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট পরব্রহ্মের পূর্ণাবতার। তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল অলৌকিক লীলা প্রদর্শিত, তাহা মানবহৃদয়ের ভাবাভিনয়ের পরাকাষ্ঠা। আমরা যেমন একদিকে তাঁহার অলৌকিক লীলাশ্রবণে তাঁহার প্রতি অপারভক্তিরসে আপ্লুত হই, তেমনি

অপরদিকে তল্লীলাপ্রকটিত ভাবগুলি আমরা নিজ মনে স্ফুরণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাই। এই প্রকারেই আমরা তাঁহার প্রতি অনন্যভক্তি প্রকাশ করি ও তাঁহারই শ্রীচরণকমলের অনুগ্রহে মনে সাত্ত্বিকভাবের স্ফূর্ত্তি করি এবং সেই সঙ্গে অপার ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হই। এখন তাঁহার লীলাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

তাঁহার বাল্যলীলা বাৎসল্যরসোদ্দীপক। নন্দালয়ে শ্রীনন্দ-নন্দন কিরূপে বাল্যকালোচিত ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করতঃ স্নেহময়ী মাতা যশোদার মন আকর্ষণ করেন এবং যশোদাদেবীও কিরূপ অপার মাতৃস্নেহের সহিত তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করতঃ বাৎসল্যভাবে গদ্গদ হইয়া অপার আনন্দভোগ করেন, তাহাই তাঁহার বাল্যলীলায় প্রদর্শিত। সকলের ঘরে দুরন্ত বালক কি না করে? বালকের শাসনেও স্নেহময়ী মাতার অপার স্নেহ প্রকটিত। সে জন্য ধর্ম্মাত্মা কবিও শ্রীকৃষ্ণকে দধিভাণ্ডভঞ্জনপূর্ব্বক নবনীত চুরি করাইয়া মাতার রজ্জুতে বন্ধন করান। আজ সেই ননিচোরা বলিতে হিন্দুসমাজও উন্মত্তপ্রায়। যে সামান্য ঘটনা সকল গৃহস্থের ঘরে অহরহ সংঘটিত, সেই ঘটনা ঈশ্বরে আরোপ করিয়া ভাবুক কবিগণ ইহার স্বর্গীয়ভাব স্ফুরণ করেন এবং সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজকেও অপার আনন্দে উন্মত্ত করেন।

এই বয়সে পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, বৎসাসুরবধ, বকাসুরবধ, অঘাসুরবধ, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি যে সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ তিনি সম্পাদন করেন, তাহাতে তাঁহার যোগেশ্বরত্ব প্রতিপাদিত। যাঁহাদের যোগবল সহজাত, তাঁহারাই ঐরূপ অলৌকিক কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ।

এই বাল্যলীলানুসারে শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তি নির্ম্মিত ও ভারতের অনেক স্থলে পূজিত। হৃদয়ের যে স্বাভাবিক বাৎসল্যভাব পুত্রকন্যার লালনপালনে প্রযুক্ত, সেই বাৎসল্যভাবেও হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বর ভাবিতে ও তাঁহার সেবা করিতে শিক্ষা দেয় এবং তদ্দ্বারা জীবাত্মার অশেষ উন্নতিসাধন করিতে চেষ্টা পায়। পূজ্যপাদ বল্লভাচার্য্যদেব হিন্দুধর্ম্মের এই মহোচ্চভাব স্ফুরণ করেন এবং তাঁহার নিকট ভারত চিরঋণে আবদ্ধ। বল্লভাচারিগণ মঙ্গলারতি, রাজভোগাদি দ্বারা বালগোপালমূর্ত্তির অশেষ সেবাশুশ্রূষা করেন। এই প্রকারে

তাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি ভালরূপ প্রকটিত ও তাঁহার পূজার্চ্চনা ও সেবাশুশ্রূষা দ্বারা তাঁহারা যেমন অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত, তেমনি তাঁহাদের জীবাত্মাও অশেষরূপে উপকৃত। এই প্রকারে তাঁহাদের বাৎসল্যভাবও অধিক স্ফুরিত। তাঁহারা পুত্রে ও বালগোপালে অভেদ জ্ঞান করতঃ উভয়ের প্রকৃতরূপ সেবাশুশ্রূষা করেন। বালগোপালের ভোগ পুত্রদিগের ভিতর বণ্ঠন করাইয়া শৈশবকাল হইতে উহাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দেন। দেবসেবার সময় পুত্রগণে বেষ্টিত হইয়া দেবমূর্ত্তির পূজা ও মঙ্গলারতি করায় উহাদের মনে শৈশবকাল হইতে অপার ভক্তি উদিত। কোথায় হে প্রাতঃস্মরণীয় বল্লভাচার্য্য! তুমি শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তি স্থানে স্থানে স্থাপিত করিয়া লোককে বাৎসল্যভাবে ঈশ্বরারাধনা করিতে শিখয়াইছ।

বাল্যলীলার পর শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরলীলা। এই বয়সে তিনি সামান্য রাখালবেশে দণ্ডহস্তে ময়ূরপুচ্ছচূড়া বন্ধন করিয়া নন্দের গোকুলে গরু চরান এবং কালিন্দীতটে বা নিকটস্থ কুঞ্জবনে বংশী বাজাইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত রাসলীলা বা প্রেমবিহার করেন। আহা! মরি! মরি! পরব্রহ্মের সেই পূর্ণ অবতার, অখিলসংসারের সেই আদর্শপুরুষ, সেই দীনবন্ধু, দীনবৎসল শ্রীহরি, সামান্য দীনহীনবালকের ন্যায় দীনহীনবেশে মাঠে মাঠে গরু চরান! যিনি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তরকালে চক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হন, তিনিই আবার অবস্থার বৈষম্যে পতিত হইয়া পরগৃহে পালিত হন ও সামান্য রাখালিকর্ম্মে স্বজীবন আরম্ভ করেন। হিন্দুধর্ম্ম! তুমিই এ সংসারে ধন্য! তুমি ইহাতে দীনদরিদ্র লোকদিগকে, সমাজের বৈশ্যদিগকে গোপালনে কিরূপ প্রোৎসাহিত কর এবং সমগ্র হিন্দুসমাজও আজ গোপাল! গোবিন্দ! বলিতে কিরূপ উন্মত্ত!

নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণ পরব্রহ্মের সেই পূর্ণাবতার, নবঘনশ্যাম, কিশোরবয়স্ক সেই শ্রীকৃষ্ণের মোহনরূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে আরাধনা করিবার জন্য তাঁহার সহিত যে সকল প্রেমলীলা ও প্রেমবিহার করেন, তাহা যেমন একদিকে আমাদের হৃদয়ের অনন্ত প্রেমরস উদ্দীপন করতঃ আমাদিগকে ঈশ্বরের নামে প্রেমোন্মত্ত করে, সেইরূপ অপরদিকে উহারা তাঁহাকে পতিভাবে আরাধনা করতঃ তন্ময়ত্ব লাভে সাহায্য করে। বাস্তব

হউক বা অবাস্তব হউক, কাল্পনিক হউক বা অকাল্পনিক হউক, সে সকল প্রেমলীলা পাঠ, শ্রবণ, বা অনুচিন্তন করিলে ঈশ্বরের নামে আমাদের হৃদয়ের প্রেম যে কেবল শতসহস্রধারে উথলিয়া পড়ে, এমন নহে; কিন্তু তাহাতে আমরা ঈশ্বরকে প্রেমভাবে পাই এবং প্রেমভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করি। ধন্য কৃষ্ণভক্ত ধর্ম্মাত্মা কবিগণ! ধন্য তোমাদের কল্পনা-শক্তি! তোমরা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমলীলা বর্ণন করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে কিরূপ ঈশ্বরপ্রেমে মাতাইয়াছ ও উহাকে কিরূপ ধর্ম্মপথে অগ্রসর করাইয়াছ! আজ তোমাদেরই গুণে সমগ্র ভারতবাসী কৃষ্ণসঙ্গীত গান করিয়া কিরূপ অপার আনন্দে উৎফুল্ল ও কিরূপ ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত! কোন দেশের কোন কবি এমন প্রেমলীলা বর্ণন করেন নাই। বাইরন, সেক্ষপীয়ার প্রভৃতি অনেক প্রকৃতির কবি নিজ নিজ ভাষায় শ্রুতিমনোহর প্রেমসঙ্গীত সুললিতকণ্ঠে গান করেন বটে, কিন্তু কেহই হিন্দুকবিগণের ন্যায় প্রেমের এমন স্বর্গীয়ভাব স্ফুরণ করেন নাই। একবার ভাব দেখি, যে নিকৃষ্ট প্রেম স্ত্রীপুরুষের মনের একটা দুর্ব্বলতা মাত্র, যে নিকৃষ্ট প্রেম একটা নিকৃষ্ট সুখের মধ্যে গণ্য, যে নিকৃষ্ট প্রেম, নারীজাতি হউক, পুরুষজাতি হউক, সকলেই নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় অনু-সরণ করতঃ মনকে হেয় ও অপদার্থ করে, সেই নিকৃষ্ট অপদার্থ প্রেমকে হিন্দু কবিগণ ভগবানে অর্পণ করিয়া ও যোড়শসহস্র গোপিনীদের সহিত তাঁহার অনন্ত প্রেমবিহার ও রাসলীলা বর্ণন করিয়া, উহার স্বর্গীয় ও মহোচ্চভাব যে কেবল স্ফুরণ করেন তাহা নহে; কিন্তু তাঁহারা সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে ঈশ্বরা-রাধনার উপায় স্বরূপ করেন এবং সেই সঙ্গে জীবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি করেন। যে নিকৃষ্ট প্রেম কলিযুগ বর্দ্ধনের সঙ্গে হৃদয়ে এত বলবৎ, সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু নারীজাতির সৌন্দর্য্যোপভোগে না লইয়া গিয়া পরমারাধ্য ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ করেন ও আপনাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করেন।

আরও দেখ, স্বামীর প্রতি সতী সাধ্বী নারীর যে ভালবাসা বা প্রেম, তাহা এ জগতে অনন্তপ্রেম, তাহা অনন্তভক্তিমিশ্রিত, তাহাতে হৃদয়ের কোনরূপ সঙ্কোচ বা বাধা নাই, কোনরূপ লজ্জা নাই; সেই পরাপ্রেম দ্বারা সতী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হন ও তন্ময়ত্ব লাভ করেন। ঈশ্বরকে পতিভাবে

অনন্ত ও অনন্ত প্রেমের সহিত আরাধনা করিবার জন্ত শাস্ত্রে গোপিনীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমলীলা বর্ণিত। ইহাই ব্রজলীলার মহৎ উদ্দেশ্য।

কেহ কেহ বলেন, যে নিকৃষ্ট প্রেম দ্বারা মানবহৃদয় কলুষিত, তাহা ঈশ্বরে বা তাঁহার কোন অবতারে অর্পণ করায় তাঁহাকে হাস্তাস্পদ করা হয় মাত্র। ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া ডাকিলেই কি তাঁহার যথার্থ গুণ প্রকাশ করা হয়? আর তাঁহাকে অনন্ত প্রেমময় বলিয়া ডাকিলে, তাঁহার কি গুণ প্রকাশ করা হয় না? এখন যদি শাস্ত্রকারেরা তাঁহার অনন্তপ্রেম ভালরূপ প্রকাশ করিবার জন্ত তাঁহার পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণকে কৈশোরে ষোড়শসহস্র গোপিনীদের সহিত প্রেমবিহার ও রাসলীলা করান, তাহাতে কি তাঁহার অনন্তগুণের সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না? ঈশ্বরের অনন্তপ্রেম প্রকাশ করিবার জন্ত মানবপ্রেমকে অনন্ত গুণিত করিয়া প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।

নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি কৈশোরে বা অল্পবয়সে সত্য সত্যই ষোড়শসহস্র গোপিনীদের সহিত প্রেমবিহার করেন? একজন কামাসক্ত মুসলমান নবাব না হয় ঊর্দ্ধসংখ্যক এক শত বেগম লইয়া আপনার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন; তবে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ এত অল্পবয়সে, দ্বাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে ষোড়শসহস্র গোপিনীকে প্রেমোন্মত্ত করান? এ অসম্ভব কথায় কি বিশ্বাস করা যায়? যিনি যোগসিদ্ধ যোগেশ্বর, তিনি যে এত অল্পবয়সে সহস্র সহস্র নারীগণকে নিজরূপে মোহিত করিয়া প্রেমোন্মত্ত করান ও তাঁহাদের সহিত এমন প্রেমবিহার করেন, যদ্দ্বারা কোটী কোটী মানব ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভবসাগর অনায়াসে পার হন, ইহা তাঁহার কোন্ বিচিত্র কথা? যোগবলে লোককে বশীভূত করা, শ্বাপদগণকে বশীভূত করা অতি সহজ কথা। কোমলপ্রকৃতি সুকুমারমতি নারীগণ কোন্ ছার!

যদি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় সন্দিহান হও এবং তাঁহার ব্রজলীলাও কাল্পনিক মনে কর, তথাচ শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় রহস্য বুঝা উচিত। যদি একেশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বমঙ্গলময় ও সর্ব্বদয়াময় বলাতে, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ মানবগুণ অনন্তগুণিত করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করাতে দোষভাজন না হন, আমরাও সেইরূপ অসম্পূর্ণ মানবের অসম্পূর্ণ

প্রেমপ্রবৃত্তি অনন্তগুণিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করায় প্রকৃত দোষভাজন হই না। সেই অসম্পূর্ণ মানবের অসম্পূর্ণ প্রেম অনন্তগুণিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই শাস্ত্রে ষোড়শসহস্র গোপিনী উল্লিখিত। আরও দেখ, যে কৈশোরে প্রথম কামোদয়ে মানবমাত্রেই প্রেমবিহার করিতে অভিলাষী, সেই বয়সে বা উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমাদের সেই আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণও ঐ প্রেমভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন। তিনি গোপিনিগণের সহিত প্রেমবিহার করিয়া নিজের নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন না বা তদ্দ্বারা গোপিনিগণের সতীত্বও নষ্ট করেন না। বালকবালিকাগণের বৌ বৌ খেলার ন্যায় তিনি গোপিনীগণকে লইয়া এক অলৌকিক খেলা খেলেন এবং তদ্দ্বারা জগতে তাঁহার এক অলৌকিক লীলা দেখান মাত্র।

নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মজেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে এতদূর মগ্ন হন যে, নিজ পার্থিব পতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়াও পরব্রহ্মের সেই পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের সদা সাথের সাথী হন ও তাঁহার সহিত প্রেমলীলা করেন। এ জগতে শ্রীরাধার প্রেম অপরিসীম ও অতুলনীয়। যিনি ঈশ্বরকে পতিভাবে পাইবার জন্য, পতিভাবে তাঁহার সেবা করিবার জন্য নিজ মনে পার্থিব পতি ত্যাগ করেন এবং তজ্জন্য তিনকুলে কালী দিয়া সর্ব্বস্বত্যাগিনী হন, তাঁহারই প্রেম এ জগতে অতুলনীয়। এ জন্য রাধারাণী কি জয়! রাধারাণী কি জয়! আজ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সমগ্র ভারতে গৃহে গৃহে স্থাপিত ও পূজিত। এ স্থলে কেহ যেন এমন ভাবেন না, শ্রীরাধা নিজ স্বামী পরিত্যাগ করতঃ কৃষ্ণরূপ পরপুরুষের সহিত প্রেমাসক্ত হন; অতএব তিনি প্রকৃত কুলটা। যিনি অখিল সংসারের পতি, যিনি অনন্তকালের জন্য সকলের পতি, তিনি যখন সশরীরে ব্রজে অবতীর্ণ, তাঁহার সহিত কি সামান্য পার্থিব পতির তুলনা হইতে পারে? যদি শ্রীরাধা সেই বিশ্বপতিকে প্রেমভাবে পাইবার জন্য মনে মনে পার্থিবপতি ত্যাগ করেন, তিনি কি তজ্জন্য কুলটা বা কলঙ্কিনী হন? যাঁহাদের সৌভাগ্যবলে সেই বিশ্বপতি যাঁহাদের মধ্যে সশরীরে আবির্ভূত, তাঁহারা যদি তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য তাঁহার সহিত প্রেমলীলা করেন, তজ্জন্য তাঁহারা কি কুলটা হন? কে

সামান্য পার্থিব পতির খাতিরে মোক্ষলাভের এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে পারে? আর শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহাদের নিকট পরপুরুষ? পার্থিব পতি ইহ-সংসারে তাঁহাদের প্রাণপতি হইলেও পরব্রহ্মের সেই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-কালের জন্য তাঁহাদের যথার্থ পতি। সতী সাধ্বী শ্রীরাধা তাহাই জানিতেন। তবে তিনি কি প্রকারে কুলটা হন? আবার রাধা শব্দের প্রকৃত অর্থ, যিনি আরাধনা করেন, তিনিই রাধা। ভক্তের হৃদয়ই এ স্থলে রাধা। ঈশ্বরের প্রতি পরাপ্রেম শিক্ষা দিয়া জগৎকে আনন্দে উন্মত্ত করিবার জন্যই শ্রীরাধার প্রেম কল্পিত। তুমিও আজ শ্রীরাধার ন্যায় অন্তরের সহিত সর্ব্বস্বত্যাগী হইয়া ও সকল বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমিক হও, সেই নাম মন্ত্র, সেই নাম তপ, সেই নাম যন্ত্র ভাবিয়া তন্ময়ত্ব লাভ কর, তোমার যথার্থ ধর্ম্মসাধন ও শ্রেয়োলাভ হইবে।

বিরহ ও মানভঞ্জন ব্যতীত প্রেম যথার্থ স্ফূর্ত্তি পায় না; এজন্য শাস্ত্র-কারেরা ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে ব্রজাঙ্গনাদের বিরহানল কিরূপ প্রজ্জ্ব-লিত, তাহা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া প্রেমের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি করেন। সেই বিরহ যন্ত্রণা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কত পতিবিরহিতা অবলা, কত পত্নীবির-হিত যুবক স্বহৃদয়ের বিরহসন্তাপ দূর করেন! শ্রীরাধার মানভঞ্জন ব্রজলীলার একটী প্রধান অঙ্গ। পরব্রহ্মের সেই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মানভরা মানিনী শ্রীরাধার পাদমূলে পতিত হইয়া মিনতি করেন, "দেহি পদপল্লবমুদারং।" আহা! মরি! মরি! কি মনোহর দৃশ্য রে! এ দৃশ্যদর্শনে কাহার না প্রেম শতসহস্রধারে উথলিয়া পড়ে? এ দৃশ্যদর্শনে কোন্ মহিলা না শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আরও মজেন? যে ঘটনাটী সকলের ঘরে নিভৃতে, নির্জ্জনে অর্দ্ধরাত্রে কদা-চিৎ কখন সংঘটিত, রসিকচূড়ামণি কবি তাহাই ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া জন-সাধারণকে কিরূপ রসসাগরে নিমগ্ন করান এবং সেই সঙ্গে দেখান, হিন্দু-সমাজে নারীজাতির পদমর্য্যাদা কত উচ্চ! এস্থলে কেহ কেহ বলেন, যে ঘটনাটী পুরুষজাতির দুর্ব্বলতাপরিচায়ক, সেই ঘটনা ঈশ্বরে আরোপ করায় তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করা হয়। যিনি যথার্থ ভাবুক, তিনি ভাবেন, ইহাতে ঈশ্বরপ্রেম আরও অধিক প্রকটিত এবং জনসাধারণও অধিক প্রেমোন্মত্ত। কোথায় হে প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ জয়দেব! ধন্য তোমার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম!

বঙ্গদেশে তোমার জন্ম হওয়ায় আজ আমাদের বঙ্গমাতা পবিত্র! তোমার গীতগোবিন্দ আজ ভারতের সর্ব্বস্থলে কিরূপ পূজিত!

যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবদিগের সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে অলৌকিক উপায় দ্বারা তাঁহার লজ্জা রক্ষা করেন, তিনিই আবার ব্রজলীলায় ব্রজাঙ্গনাদের বস্ত্রহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উলঙ্গবেশে নির্লজ্জ করতঃ সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাদের কৌমারত্ব দর্শন করেন। প্রকৃতির কবি যে স্থলে যেমনটী আবশ্যক, সেই স্থলে তেমনটী বর্ণন করেন। কৈশোর বয়সে অধিকাংশ লোকের চরিত্র চপলতাদোষে দূষিত। রক্তমাংসের শরীর পরিগ্রহ করিয়া অখিল সংসারের সেই আদর্শপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ কি মানবের স্বাভাবিক বয়সদোষ প্রদর্শন করিবেন না? এ স্থলে শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য আরও গূঢ়। অষ্টপাশের মধ্যে লজ্জাপাশ ভঙ্গ করিবার জন্য গোপিনিগণের বস্ত্রহরণ করা হয়! ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরসম্বন্ধে লজ্জা বলবতী হইলে তাঁহার আরাধনা কার্য্যকর হয় না। পরমভক্ত লজ্জাবতী গোপিনিগণের লজ্জা ভঙ্গ করতঃ তাঁহাদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিবার জন্য তাঁহাদের বস্ত্রহরণ করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলা হইতে সমাজে দুইটী মহোৎসব প্রচলিত, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা। যমুনাপুলিনে যোগেশ্বর শ্রীহরি অসংখ্যরূপ ধারণ করতঃ প্রত্যেক গোপিনীর সহিত কিরূপ প্রেমলীলা করেন, তাহাই রাসলীলায় প্রদর্শিত। হেমন্তকালের পূর্ণিমায় রাসোৎসব ও বসন্তকালের পূর্ণিমায় দোলোৎসব প্রচলিত। শেষোক্ত উৎসবে সমগ্র ভারতবাসী প্রেমোন্মত্ত হইয়া কিরূপ আমোদ প্রমোদে রত হয়, তাহা সকলেই জানেন। সেই সময় যে সকল সঙ্গীত সর্ব্বত্র গীত হয়, তাহা আজকাল আমাদের মার্জ্জিত রুচির নিকট অশ্লীল বোধ হইলেও, যখন এতদ্দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ আনন্দে উৎফুল্ল, তখন উহার উপর দোষারোপ করা আমাদের একান্ত অনুচিত।

কেহ কেহ বলেন, শাস্ত্রকারেরা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রেমলীলা বর্ণন করেন, তাহাতে সাধারণ লোকের চরিত্র ক্রমশঃ দূষিত হয়। বল দেখি, যে ধর্ম্ম স্বীয় আদর্শপুরুষকে প্রকাশ্যভাবে পরনারীর প্রেমাসক্ত বর্ণন করে, সে ধর্ম্মের ন্যায় বীভৎস ধর্ম্ম জগতে আর কি হইতে পারে? কোথায় ধর্ম্ম অশেষ সদুপদেশ প্রদান করিয়া সমাজে ব্যাভিচার দোষ নিবারণ করিবে?

না ধর্ম্মই প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয়? এস্থলে হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র অপরাধ এই, যে প্রেম সকলে নারীজাতির উপর দেখাইয়া নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদে রত হয়, সেই প্রেম এ ধর্ম্ম ভগবানে দেখাইতে বলে। সকলকে ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমোন্মত্ত করিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমলীলা শাস্ত্রে বর্ণিত। বল দেখি, যিনি পরব্রহ্মের সেই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরাপ্রেমে ও পরাভক্তিতে মজেন, তিনি কি সামান্য পরনারী পাপনয়নে দর্শন করেন? যে ধর্ম্মাত্মা মহিলা রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মজেন, তিনি কি পরপুরুষকে ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করেন না? তিনি নিজ পতিকে জগতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভাবিয়া তদীয় প্রেমে বিভোর হন এবং তাহাতেও প্রেমের যেটুকু অবশিষ্ট, তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া মনের প্রেমপিপাসা তৃপ্তি করেন। যদি তিনি বৈধব্যদশায় পতিত হন, শ্রীকৃষ্ণকে মনোমত পতি পাইয়া পত্যন্তর গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করেন না। যে পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মজেন, তিনি নিজপত্নীকে রাধার রূপ জ্ঞান করতঃ তদীয় প্রেমে বিভোর হন, অথবা আপনাকে রাধা জ্ঞান করিয়া পরাপ্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা দিবারাত্র পাঠ, শ্রবণ ও অনুচিন্তন করিলে মন কি কদাচ কলুষিত হয়? পরন্তু হরির প্রেমে প্রেমিক হইয়া, তাঁহাকে প্রেমভাবে পাওয়া যায় এবং ক্রমশঃ তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া মানবজীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করা যায়। যেমন মোদক মিষ্টান্নের সুগন্ধ অনুক্ষণ ঘ্রাণ করিলে মিষ্টান্ন ভোজনেচ্ছা তদীয় মন হইতে দূরীভূত হয়; সেইরূপ যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মজিয়া তদীয় প্রেমলীলা অনুক্ষণ ধ্যান করেন, তিনি ক্ষণভঙ্গুর শরীরের ক্ষণস্থায়ী কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অভিলাষী হন না। সত্য বটে, দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তিনি পতি কিম্বা পত্নী লইয়া সংসারাশ্রমে থাকেন; কিন্তু তাঁহার মন সদা বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করে এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়। কয়েকজন অকাল-কুষ্মাণ্ড বৈষ্ণব বিধবা বৈষ্ণবী রাখে বলিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের নিন্দা করিও না।

কৈশোরলীলার পর শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা। এই বয়সে তিনি রাজাধিরাজ, মথুরা ও দ্বারকার স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। কি অবস্থার পরিবর্ত্তন!

কি অবস্থার উন্নতি! কোথায় রাখালবেশধারী ব্রজের গোপাল! আর কোথায় রাজবেশধারী, রাজন্যবর্গে পরিবৃত, চতুরঙ্গবলান্বিত দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ! যিনি মানবের পূর্ণ আদর্শ, তাঁহার পদোন্নতি এই প্রকারে সংঘটিত। যিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠাংশে আবির্ভূত, তাঁহার পদোন্নতি এই প্রকারে সংঘটিত। ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে ক্ষত্রিয়োচিত অশেষ গুণগ্রাম প্রদর্শন করায় ও জগতে অলৌকিক কর্ম্ম করায় চিরদিনের জন্য তিনি ক্ষত্রিয়দিগের পূর্ণ আদর্শ হন। এই সময়ে সদাশয়তা, মিষ্টভাষিতা, ন্যায়পরতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মপরায়ণতা, ব্রাহ্মণসেবা, শাস্ত্রজ্ঞান, বহুদর্শিতা, পরিণামদর্শিতা, অধর্ম্মযুদ্ধবৈমুখ্য, রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি অশেষ গুণগ্রামে তাঁহার চরিত্র বিভূষিত। এই সময়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, সাধুদিগের রক্ষণ ও পাপাত্মাদিগের বিনাশ, সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত। কংশ বধ ও তদ্দ্বারা পিতামাতা ও জ্ঞাতি-গণের উদ্ধার, জরাসন্ধ বধ ও তদ্দ্বারা কারারুদ্ধ রাজন্যবর্গের মুক্তি, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্য প্রাপ্তি, দুষ্ট শিশুপাল বধ ও ব্রাহ্মণদিগের পদ প্রক্ষালন, কুরুক্ষেত্র-সমরে গূঢ়মন্ত্রদ্বারা পাণ্ডবদিগের জয়লাভ ও তাঁহাদিগকে রাজ্যদান প্রভৃতি যে সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ তিনি স্বজীবনে সম্পাদন করেন, তাহাতেই তাঁহার যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত অভিব্যাপ্ত এবং তাহাতেই তিনি ক্ষত্রিয়জাতির পূর্ণ আদর্শ।

যিনি অতি নীচ অবস্থা হইতে রাজন্যবর্গের মধ্যে চক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হন, যাঁহার বুদ্ধি ও মন্ত্রণাবলে কুরুপাণ্ডবদিগের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য অষ্টাদশ দিবসে কালকবলিত, যিনি বাল্যকালে পুতনাবধ, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন ধারণাদি অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করায় সকলের বিস্ময়োৎপাদন করেন, তিনি সমাজে কেন না ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজিত হইবেন?

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল মহৎ উপদেশ দেন, তাহা ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়, তাহা সংসারে সকল ধর্ম্মের সার। বুদ্ধ বল, ঈষা বল, মহম্মদ বল, এমন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ কেহ কোন কালে দিতে পারেন নাই। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়াতে তিনি চিরদিনের জন্য ধর্ম্মো-পদেশক ব্রাহ্মণজাতির আদর্শপুরুষ। যোগবলেই তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞান-

বিষয়ক এমন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রাপ্ত হন। তদুপদিষ্ট গীতা ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট সেই মায়াতীত পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার। তিনিই মূর্ত্তিমান শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু। তিনি পদ্মপলাশলোচন, যোগেশ্বর হরি। তিনিই অখিল সংসারের পতি ও বিশ্বনিয়ন্তা। তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য সহজাত এবং যোগসিদ্ধ বলিয়া তিনি সংসারে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন ও অলৌকিক ধর্ম্ম উপদেশ দেন। মানবজীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল ভাবাবলি মানবহৃদয়ে উত্থিত, যিনি স্বজীবনে সেই সকল ভাবাবলির পূর্ণ অভিনয় করতঃ সকলের দৃষ্টান্ত স্থল, যিনি অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সকল জাতির ও সকলাবস্থাপন্ন লোকের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ, তিনিই ইহসংসারে ভগবানের পূর্ণ অবতার। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকল জাতির যিনি পূর্ণ আদর্শ, তিনিই এ সংসারে পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার। কি দীন দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, কি রাজা, কি রাজাধিরাজ, যিনি সকল লোকের আদর্শ, তিনিই এ সংসারে পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার। কি কৈশোরকাল, কি যৌবনকাল, কি প্রৌঢ়কাল, কি বার্দ্ধক্যকাল, মানবজীবনের সকল সময়ের পূর্ণভাব অভিনয় করতঃ যিনি সকলের আদর্শপুরুষ, তিনিই এ সংসারে পরব্রহ্মের পূর্ণ অবতার। এস্থলে যদি একেশ্বরবাদিগণ নাসিকা সঙ্কুচিত করতঃ আমাদিগকে ভ্রান্ত জ্ঞান করেন, আমরা সাহঙ্কারে বলিব, তাঁহাদের একেশ্বরে যে সকল গুণ আরোপিত, তাহাও কি কাল্পনিক নহে? তাঁহাদের একেশ্বরে যতটুকু সত্য, আমাদের শ্রীকৃষ্ণেও ততটুকু সত্য; তাঁহাদের ঈশ্বরও পরব্রহ্মের মায়ারূপ, আমাদের শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মায়ারূপ; অতএব এ সকল বাক্‌বিতণ্ডা বৃথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

তীর্থ ভ্রমণ।

তীর্থ ভ্রমণ চিরদিন হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহাতে যেমন মানবের অশেষ পাতকনাশ, তেমনি ইহাতে তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলাভ। সমাজস্থ যাবতীয় লোকের জন্য ইহা উপদিষ্ট। কি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বা গণ্ডমূর্খ, কি রাজাধিরাজ বা পথের ভিখারী, কি ধর্ম্মাত্মা বা পাপাত্মা, কি সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ, সকলের জন্য ইহা সমভাবে উপদিষ্ট। সকলেই সময়ে সময়ে এতদর্থে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেন।

যে স্থলে কোন অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ত্তমান, যে স্থলে কোন মহাত্মার আবির্ভাব ও কোন জাগ্রত দেবতার অধিষ্ঠান হয়, সেই স্থলগুলিকে হিন্দুধর্ম্ম তীর্থ বলিয়া প্রচার করে এবং শাস্ত্রে উহাদের অপার মহিমা কীর্ত্তন করতঃ উহাদিগকে চিরদিনের জন্য সাধারণসমক্ষে পূজ্য ও পবিত্র করে। ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর চক্ষে তীর্থস্থলের মাহাত্ম্য ও মহিমা অপার ও অপরিসীম। ধর্ম্মের সেই পীঠস্থল দর্শন করিলে, সেখানকার পূজ্যদেবতার শ্রীচরণপদ্মে প্রণত হইলে, সেখানকার পুণ্যসলিলে অবগাহন করিলে তাঁহার মানবজন্ম সার্থক হয় এবং অশেষ পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভ হয়। তথায় যেরূপ দেবমন্দির বর্ত্তমান, তথায় যেরূপ সাধুসম্মিলন, তথায় যেরূপ পুণ্যতোয়া নদী বহমানা, তথায় যেরূপ পবিত্র বায়ু সঞ্চরমান, তথায় যেরূপ মানব-সমাগম, তথায় যেরূপ পরাপ্রেম ও পরাভক্তি প্রকটিত, তথায় যেরূপ শাস্ত্রালাপ, তথায় যেরূপ পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়, সকলই ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর নিকট এ জগতে অলৌকিক ও মনোরম। ইহারই জন্য তিনি এত-কাল লক্ষ লক্ষ রজতমুদ্রা ব্যয় করিয়া ধর্ম্মের ঐ সকল পীঠস্থল দর্শন করেন ও আপনার জীবন সার্থক করেন।

সমাজের ধর্ম্মোন্নতির জন্য তীর্থস্থলগুলি প্রতিষ্ঠিত। ইহারা ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী স্বরূপ। যেমন শাসনতন্ত্র শাসনপ্রণালী সুকর করিবার জন্য রাজ্যের স্থানে স্থানে নিজ কেন্দ্র স্থাপন করে; সেইরূপ তীর্থগুলিও ধর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ এবং এই কেন্দ্র হইতেই ধর্ম্মভাব সমাজের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ। যেমন দেশের রাজা নিজ রাজধানীকে সৌধমালায় সুশোভিত করতঃ উহার অপরূপ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন; সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মও তীর্থস্থলগুলিকে অপূর্ব্ব দেবমন্দিরে ও সদাব্রতে সুশোভিত করতঃ উহাদের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করে। যেমন বিদ্যালয়ে বিবিধ ছাত্রদিগের সম্মিলনে উহাদের ভালরূপ বিদ্যোপার্জ্জন হয়, সেইরূপ তীর্থস্থলে নানাদেশের ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের সম্মিলনে সকলের ধর্ম্মভাব সম্যক বর্দ্ধিত হয়।

এখন সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় তীর্থভ্রমণকে ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া উড়ান। তাঁহারা ভাবেন, মূর্খ জনসাধারণের কি কুসংস্কার, যে উহারা শীতগ্রীষ্মে এত দারুণ কষ্টভোগ করিয়া ও এত অর্থ অনর্থক ব্যয় করিয়া ঐ সকল তীর্থস্থল দেখিতে যায়? কবে উহাদের এ কুসংস্কার দুরীভূত হইবে? আর হিন্দুধর্ম্ম! তোমারই এ কি বিবেচনা! কোথায় হরিদ্বার ও রামেশ্বর-সেতুবন্ধ! কোথায় প্রয়াগের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ও গঙ্গাসাগর! কোথায় শ্রীক্ষেত্র ও দ্বারকা! কোথায় মথুরা ও বেনারস! এত দূরবর্ত্তী স্থানগুলিকে তীর্থ করায় তোমার কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ? যে পরমপিতা পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, ঘরে বসিয়া কি তাঁহার আরাধনা হয় না? তবে কেন তুমি দূরদেশে তাঁহার অন্বেষণ করিতে উপদেশ দেও? দেখ, লোকে তীর্থভ্রমণের জন্য কত কষ্ট সহ্য করে? কত দীনদরিদ্র ব্যক্তি আজীবন-সঞ্চিত ধন তীর্থস্থলে অকারণ ও অনর্থক ব্যয় করিয়া কিরূপ নিঃসম্বল হয়! তত্রত্য পাণ্ডারাও কত নিষ্ঠুরভাবে যাত্রিবর্গ হইতে প্রচুর অর্থ নিষ্পীড়ন করতঃ আপনাদের ভোগবিলাস কিরূপ চরিতার্থ করেন! পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যাত্রী দুর্গমপথে দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া ধনপ্রাণে কিরূপ মারা যাইত! আজ যদিও ব্রিটিশসিংহের প্রতাপে ও অনুগ্রহে ঐ সকল দূরবর্ত্তী স্থান অনায়াসগম্য, তথাচ একস্থলে লক্ষাধিক লোকের সমাগমে কত লোক বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে! এ সকল ভাবিলে কি

স্বধর্ম্মের সুখ্যাতি করিতে হয়? বোধ হয়, এমন অপকৃষ্ট ধর্ম্ম জগতে আর দ্বিতীয় নাই! আরও দেখ, সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে এখন কেহ তীর্থভ্রমণ করে না। জ্ঞানালোক ও সভ্যতালোক সমাজে যত বিকীর্ণ, ধর্ম্মের এ কুসংস্কার ততই পরিত্যক্ত। তবে কেন এ কুসংস্কার এখনও ভারতে প্রবল?

যাঁহারা তীর্থভ্রমণের মহোপকারিতা আদৌ বুঝেন না, তীর্থভ্রমণে লোক-বিশেষের যে কত মহোপকার ও সমগ্র সমাজের যে কত মহোপকার, তাহা যাঁহারা বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারাই উপরোক্ত প্রকারে স্বধর্ম্মের নিন্দাবাদ করেন। মনে কর, তীর্থস্থলের যে অপরূপ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত, তাহা তোমার সুশিক্ষিত মনের নিকট সর্ব্বৈব কাল্পনিক; মনে কর, যে পাপক্ষয় ও পুণ্য-লাভের জন্য লোকে তীর্থ দর্শন করে, তাহা তাহাদের মনের একটা কুসংস্কার বা ভ্রান্তি; তথাচ তীর্থভ্রমণে ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে কত মহোপকার সাধিত, তাহা যদি তুমি বুঝিতে পার, তুমি স্বধর্ম্মের কদাচ নিন্দাবাদ কর না।

তীর্থভ্রমণ দ্বারা লোক বিশেষের যে কত মহোপকার, তাহা প্রথমে বর্ণন করা কর্ত্তব্য। সকলেই জানেন, নানাদেশ দর্শন করিলে, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা কিরূপ বর্দ্ধিত হয়। নানাদেশের রীতিনীতি, চালচলন ও আব্‌ভাব স্বচক্ষে দর্শন করিলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, তাহাই পূর্ণ জ্ঞান। আর স্বগৃহে মানচিত্র দর্শন করিয়া ভূগোল বা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেশবিশেষের যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা অসম্পূর্ণ জ্ঞান। এস্থলে দেশপর্য্যটনের সহিত ভূগোল বা ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠের তুলনাই হইতে পারে না। সমাজের যে অবস্থায় ভূগোলাদি শাস্ত্রের অভাব হয়, সে সময়ে লোকে তীর্থভ্রমণ দ্বারা দেশবিশেষের জ্ঞানলাভ করে ও স্বসমাজে তাহাই প্রচার করে। দেখ না, এখন যে অশিক্ষিত লোক তীর্থভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করে, সে ব্যক্তি নিজ অশিক্ষিতসমাজে অন্য দেশ সম্বন্ধে কত কথা ও কত গল্প উত্থাপন করে? আর যিনি ভূগোল পাঠে অন্যদেশের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেন, দেশ পর্য্যটন দ্বারা সেই জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করাও তাঁহার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলে, তিনি কত দেশ দেশান্তর দর্শন করেন ও কিরূপ আনন্দভোগ করেন!

তীর্থস্থলের যে সকল দেবদেবীর অপার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত এবং যাঁহাদের কথা সকলেই বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করেন, সেই সকল পরমারাধ্য দেবদেবী স্বচক্ষে দর্শন করিলে, হৃদয়ে কিরূপ বিশুদ্ধ ও বিমল আনন্দের উদয় হয়? যে দিন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ও গোপীনাথের শ্রীচরণপদ্মে প্রণত, সে দিন তাঁহার ভক্তহৃদয়ে কিরূপ ব্রহ্মানন্দ উত্থিত? সে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে, বঙ্গবিজেতা সেনাপতি লর্ড ক্লাইবের পলাশীযুদ্ধের পর জয়োল্লাসও অতি তুচ্ছ।

গৃহে দেবদর্শনে বা ঈশ্বরারাধনায় আনন্দ হয় বটে; কিন্তু ইহা মানবের স্বভাবসিদ্ধ, যে বিষয়ে যত কষ্টভোগ, সে বিষয়ে কার্য্যসিদ্ধির পর ততই সুখবোধ। এ স্থলে দুঃখের পরিমাণ দেখিয়া সুখের পরিমাণ ভাবা উচিত। তুমি সুরম্য হর্ম্ম্যে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি অশেষ সুস্বাদুখাদ্য ভোজন করিতে করিতে সুখ বোধ কর বটে; কিন্তু একজন দীন দরিদ্র ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সমস্ত দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর একমুঠা শাকান্ন গলাধঃকরণ করিয়া যে ভোজনসুখ অনুভব করে, তাহার সহিত তুলনায় তোমার ভোজনসুখ অতি তুচ্ছ। তুমি পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে করিতে অশেষ সাধ্যসাধনায় যে নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহ পাও না, তিনিই আবার সেই ক্লান্ত, পর্ণশয্যাশায়ী দরিদ্রের উপর সমস্তরাত্রি অমৃতসিঞ্চন করেন ও উহাকে স্বর্গসুখে সুখী করেন। সেইরূপ যিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এক মনে, এক ধ্যানে, পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে শীতগ্রীষ্মের দারুণ কষ্টে দৃকপাত না করিয়া, পর্ব্বতজঙ্গলাদি অতিক্রম করতঃ তীর্থস্থানে উপস্থিত, তাঁহার মন যেরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত, সে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে, তুমি বাষ্পীয়শকটযোগে একদিনে বা দুইদিনে কাশীর বিশ্বেশ্বর বা শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া যে সুখ ভোগ কর, তাহা অতি তুচ্ছ। যে বস্তু অনায়াসে লভ্য, তাহার মূল্য কি? তাহাতে সুখই বা কি? যথার্থ বলিতে কি, তীর্থস্থলগুলি এখন অনায়াসগম্য হওয়ায় উহাদের মাহাত্ম্য ও গৌরব আমাদের নিকট হ্রাসপ্রাপ্ত এবং তত্রত্য দেবদর্শনেও তাদৃশ পুণ্যও নাই, তাদৃশ আনন্দও নাই।

তীর্থস্থলের প্রাকৃতিক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যদর্শনে কাহার না মনে ঈশ্বরভক্তি

ও ধর্ম্মভাব স্বতঃ স্ফুরিত হয়? প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম, গঙ্গাসাগরে গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গম, জ্বালামুখীতে অগ্নিনিঃসরণ, সীতাকুণ্ডুতে উষ্ণপ্রস্রবণ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যদর্শনে কাহার না মনে ঈশ্বরভক্তি উথলিয়া পড়ে! হরিদ্বারে বা বদ্রিনারায়ণে অত্যুচ্চ হিমাদ্রির অতুলশোভা সন্দর্শনে কাহার না মন অতুলআনন্দে পুলকিত হয়? হরিদ্বারের সেই বরফবিগলিত নির্ম্মল শীতল সলিলে বা শ্রীক্ষেত্রের সেই উত্তালতরঙ্গের মধ্যে অবগাহন করিলে কাহার না মন আনন্দে বিভোর হয়?

অলোকসামান্য মহাত্মাদিগের জন্মভূমি বা লীলাভূমি সন্দর্শনে মনে অননুভূত ভাবোদয় ও সুশিক্ষা হয়। যাঁহারা জ্ঞানজগতে অসাধারণ ধীশক্তি-বলে যশোমন্দিরের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের জন্মভূমিসন্দর্শনার্থ সহৃদয় বিদ্বজ্জনমাত্রেই অভিলাষী। সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মজগতে অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান দ্বারা বা স্বজীবনে ধর্ম্মের অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সাধারণ লোককে ভবপারাবারে সাহায্য করেন, ধর্ম্মাত্মামাত্রেই তাঁহাদের জন্মভূমি বা লীলাভূমি সন্দর্শনে স্বতঃ সোৎসুক হন। যে স্থল হইতে তাঁহারা দুন্দুভিস্বরে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন, সেই পবিত্রভূমি দর্শন করিলেও মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় ও অনেক সুশিক্ষা হয়। এ কারণে খ্রীষ্টজগতে জেরুজেলাম, মুসলমানজগতে মক্কা, বৌদ্ধজগতে বুদ্ধ গয়া ও হিন্দুজগতে মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থল চিরদিনের জন্য ধর্ম্মের পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র।

এইরূপে নানাপ্রকারে ব্যক্তিবিশেষ তীর্থভ্রমণ দ্বারা অশেষ উপকৃত। এই সকল ব্যক্তিগত উপকার অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তীর্থভ্রমণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কোন্ কোন্ মহদুদ্দেশ্য সাধিত। যে স্থলে সভ্যজগতে লোকে আজকাল বিদ্যা ও অর্থের খাতিরে, স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে দেশ দেশান্তর দর্শন করে, সে স্থলে অর্দ্ধসভ্য হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্মের খাতিরে, নিষ্কাম পরার্থসিদ্ধির খাতিরে তীর্থভ্রমণ বা দেশপর্য্যটন উপদেশ দেয়। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের অপরাধ! ইহাই এ ধর্ম্মের কুসংস্কার!

তীর্থভ্রমণ দ্বারা সমাজের কি কি মহোপকার, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। বিদ্যা বল, শিল্প বল, দেশাচার বল, রীতিনীতি বল, ধর্ম্মের মতামত বল, সকলই তীর্থযাত্রিগণ কর্ত্তৃক এক দেশ হইতে দেশান্তরে নীত ও

বিস্তৃত এবং উহাদের উন্নতি অনায়াসে সাধিত। সমাজের যে অবস্থায় মুদ্রাযন্ত্র অনুদ্ভাবিত, সে অবস্থায় তীর্থভ্রমণ বা ধর্ম্মোদ্দেশে দেশপর্য্যটনই সামাজিক উন্নতির সর্ব্বপ্রধান উপায়। মধ্যযুগে প্যালেষ্টাইনে ইউরোপবাসী পাদরি-পুঙ্গবেরা তীর্থভ্রমণ করায় এবং তদ্‌রক্ষার্থ কয়েকবার ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায়, সমগ্র ইউরোপের যে সকল মঙ্গল সম্পাদিত, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই বিদিত।

পূর্ব্বে তীর্থস্থানে ভারতের নানাপ্রদেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী একত্রিত হইয়া স্ব স্ব বিরচিত পুস্তক লোকসমাজে প্রচার করেন; তাহাতেই ঐ সকল পুস্তক অন্য দেশে নীত ও গুণানুসারে আদৃত! পূজ্যপাদ জয়দেব গীত-গোবিন্দ পুস্তকখানি শ্রীক্ষেত্রে প্রচার করিয়াই মহারাষ্ট্র দেশে ও দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেন; তজ্জন্য এখনও ঐ সকল দেশে ঐ পুস্তকের এত সমাদর। এই পুণ্যভূমি তীর্থক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষাদি যাবতীয় বিদ্যাসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচার করেন। ইহারই জন্য কাশী, নাসিক প্রভৃতি তীর্থস্থলগুলি চিরদিন হিন্দুজগতে বিদ্যালোচনার কেন্দ্রস্থল। এই পুণ্যভূমি তীর্থক্ষেত্রেই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান সংস্কারকগণ ধর্ম্মবিষয়ে শ্রেষ্ঠ মতামত প্রকাশ করতঃ সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচার করেন। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, রামানন্দ, বল্লভাচার্য্য কবীর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মাগণ তীর্থক্ষেত্রে আপনাদিগের উন্নত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচার করেন। যেমন আজকাল কলিকাতা মহানগরী সর্ব্ববিধ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল; সেইরূপ তীর্থ-ক্ষেত্ররূপ কেন্দ্র হইতে ধর্ম্মবিষয়ক ও বিদ্যাবিষয়ক আন্দোলনতরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে ব্যাপ্ত। ইহারই জন্য তীর্থস্থলগুলি ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানীস্বরূপ।

তীর্থস্থলে বহুলোকের সমাগম হওয়ায় নানাদেশ হইতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য ও বিবিধ শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত। ইহাতে ঐ সকল দ্রব্যের গুণানুসারে অন্যান্য দেশে ভালরূপ সমাদর হয়। ইহাতে এক দেশের শিল্পিগণ অন্যান্য দেশের শিল্পিগণের উদ্ভাবিত শিল্পকৌশল অনায়াসে শিক্ষা করে ও নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করে। যে স্থলে আজকাল সভ্যদেশে কোটী

কোটী অর্থ ব্যয় করিয়া জাতীয় প্রদর্শনী (Exhibition) স্থাপন করতঃ শিল্পাদি-বিষয়ে লোকবর্গকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে স্থলে অর্দ্ধসভ্য ভারতবর্ষের পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম লোকদিগকে তীর্থ ভ্রমণে প্রোৎসাহিত করিয়া তীর্থস্থানে বিবিধ শিল্পদ্রব্য একত্রিত করতঃ শিল্পবিষয়ে স্বল্পব্যয়ে উহাদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করে। এ স্থলে অনেকে হাস্য সম্বরণ করিবেন না। কোথায় বহুব্যয়সাপেক্ষ সভ্যদেশের জাতীয়প্রদর্শনী! আর কোথায় অজ্ঞ ও মূর্খ লোকের অবৈধ জনতা! কোথায় বিজ্ঞানরূপ কল্পদ্রুমের পারিজাত পুষ্প-প্রদর্শন। আর কোথায় পুতিগন্ধবিশিষ্ট কম্বুবাহী যাত্রীদিগের হুঙ্কারজনক অবৈধ সমাগম! যাহা হউক, জাতীয়প্রদর্শনী ও তীর্থস্থলের মেলার উদ্দেশ্য প্রায় এক। প্রভেদের মধ্যে, প্রথমোক্তটী কৃত্রিম সভ্যতানুমোদিত কৃত্রিম উপায়, আর দ্বিতীয়টী অর্দ্ধসভ্য দেশের অকৃত্রিম প্রথা।

তীর্থদর্শনোদ্দেশে লোকে নানাদেশ ভ্রমণ করে এবং তাহারা যে দেশে যে কোন উৎকৃষ্ট রীতিনীতি বা শিল্পদ্রব্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহারা স্বদেশে প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পায়। এইরূপে তীর্থভ্রমণ দ্বারা একজাতি অন্যজাতির সংস্রবে ভালরূপ আনীত, নানাবিষয়ে উহাদের পরস্পর সহানুভূতি ও সুশিক্ষা পরিবর্দ্ধিত এবং সেই সঙ্গে উহাদের জাতীয় উন্নতি সম্যক সাধিত। দিগ্‌বিজয় বা দেশজয় দ্বারাও একজাতি অন্যজাতির সংঘর্ষে আনীত এবং উহাদের পরস্পর জাতীয় উন্নতি সাধিত। কিন্তু ইহার নরহত্যা, শোণিতপাত ও নগরলুণ্ঠন প্রভৃতি ভাবিলে ইহাকে জাতীয় উন্নতিসাধনে তামসিক উপায় বলা উচিত। পরন্তু যে তীর্থভ্রমণে বিন্দুমাত্র শোণিতপাত হয় না ও একখানি পর্ণকুঠীর পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত বা দগ্ধ হয় না, অথচ যাহাতে সকলের মধ্যে নানাবিষয়ে সহানুভূতি ভালরূপ অনুশীলিত হয়, তাহাই জাতীয় উন্নতিসাধনে সাত্ত্বিক উপায়। ইহারই জন্য শান্তিপ্রিয় হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন দিগ্‌বিজয়ের অনাদর করিয়া তীর্থভ্রমণের এত প্রশংসা করে।

যাহা হউক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, তীর্থভ্রমণদ্বারা সমগ্র ভারতের ব্যক্তিগত ও সমাজগত নানা মহোপকার সাধিত। যখন তীর্থভ্রমণ এতকাল হিন্দুসমাজে আদৃত, তখন নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা ভারত চিরদিন সম্যক উপকৃত। প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যাহা সমাজবিশেষের মহোপকারী, তাহাই সামাজিক নির্ব্বা-

চলে সে সমাজে স্থায়ী। ইহারই জন্য তীর্থভ্রমণ চিরদিন হিন্দুসমাজে এতদূর আদৃত।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে তীর্থভ্রমণদ্বারা সমাজের এত মহোপকার, কেন শাস্ত্রকারেরা সেই তীর্থভ্রমণের সামাজিক উপকারের কথা উল্লেখ না করিয়া উহাতে অশেষ পাতকনাশ ও অশেষ পুণ্যলাভ এরূপ নির্দ্দেশ করেন? কেন তাঁহারা কতকগুলি কুসংস্কার শিক্ষা দিয়া লোককে কুসংস্কারে জড়িত করিয়া রাখেন? এস্থলে হিন্দুধর্ম্মের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। যখন তীর্থভ্রমণদ্বারা সমাজের এত মহোপকার, তখন যদি এ ধর্ম্ম লোকদিগকে ধর্ম্মের নামে, নিষ্কাম পরার্থসিদ্ধির নামে দেশপর্য্যটনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য কতকগুলি কুসংস্কারও উপদেশ দেয়, সমাজের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া সে সকল সংস্কারকে কি কুসংস্কার বলা উচিত? তোমার বিকৃতমস্তিষ্কের নিকট উহারা কুসংস্কার হইতে পারে; কিন্তু যথার্থ বলিতে কি, উহারাই সমাজের প্রকৃত সুসংস্কার। যাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল, তাহা কুসংস্কার হইলেও প্রকৃত সুসংস্কার, তাহা মহাপাতক হইলেও মহাপুণ্য।

তীর্থভ্রমণে অশেষপাতকনাশনির্দ্দেশে হিন্দুধর্ম্মের দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত। স্বার্থপর মানব স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেরূপ লালায়িত, তিনি সেইরূপ পরশ্রীকাতর এবং পরের জন্য কপর্দ্দক ব্যয় করিতে সেইরূপ কুণ্ঠিত। যদি শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট উপদেশ দেন, যে তীর্থভ্রমণদ্বারা সমাজের এত মহোপকার, অতএব তীর্থভ্রমণ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য; কে বল সমাজের খাতিরে, পরের খাতিরে তীর্থভ্রমণে কপর্দ্দক ব্যয় করে এবং তজ্জন্য এত শারীরিক কষ্ট সহ্য করে? কিন্তু যে মানব এ সংসারের তীব্র তাড়নায় সদা প্রপীড়িত, যিনি এ জীবনে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পান না, যদি তাঁহাকে বলা যায়, যে এ শুভকর্ম্মটী সম্পাদন করিলে তোমার অক্ষয়পুণ্য লাভ হয়, তুমি জীবনের পাপরাশি হইতে মুক্ত হও, তুমি ইহলোকে ও পরলোকে অনন্তসুখে সুখী হও, তখন তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই কার্য্যটি করিতে একান্ত তৎপর হন; এমন কি, যদি উহাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়, তথাচ তিনি তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে ও প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন। ইহারই জন্য তীর্থভ্রমণে এত পুণ্যলাভ, এত ইষ্টলাভ ও এত শ্রেয়োলাভ শাস্ত্রে উপদিষ্ট।

এ বিষয়ে ধর্ম্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী অতীব গূঢ়; কিন্তু ইহাকেই এ ধর্ম্ম তীর্থভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য করে এবং ইহার অন্যান্য উদ্দেশ্যের অনাদর করে। ধর্ম্মজগতের ইহা একটি মহাসত্য, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যাঁহার যেরূপ ভাবনা, তাঁহার তেমনি সিদ্ধিলাভ। যাঁহার মনের এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস, যে তীর্থস্থানের দেবদর্শন করিলে বা পুণ্যসলিলে অবগাহন করিলে অক্ষয়পুণ্য লাভ হয়, তিনি তথায় দেবদর্শন করিয়া ও স্নান করিয়া অক্ষয়পুণ্য লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে অপার আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। এই প্রকারেই তাঁহার জীবাত্মার অশেষ উন্নতি সাধিত এবং এই-প্রকারেই তাঁহার পারত্রিক মঙ্গল সাধিত। যে না গঙ্গা আমাদের পতিত-পাবনী, সেই পুণ্যতোয়া গঙ্গায় ধর্ম্মাত্মা হিন্দু স্নান করিয়া যে ফলপ্রাপ্ত হন, একজন ম্লেচ্ছ পাষণ্ড মুসলমান কি সেই ফল প্রাপ্ত হয়? তাহাই যদি হয়, সংসারে ধর্ম্মের কি প্রয়োজন? পাপপুণ্যেরই বা কি প্রয়োজন?

এখন ভাবিয়া দেখ, এক তীর্থভ্রমণ দ্বারা সমাজের কত মহোপকার। ইহাতে লোকবিশেষের যেমন ঐহিক মঙ্গল, তাঁহার সেইরূপ পারত্রিক মঙ্গল। ইহাতে তাহার শরীরের যেমন মঙ্গল, তাঁহার মনেরও তদনুরূপ মঙ্গল। ইহাতে দেশবিশেষের যেমন মঙ্গল, সমগ্র ভারতবর্ষের তদনুরূপ মঙ্গল। তবে কেন আজ আমরা শিক্ষাদোষে তীর্থভ্রমণকে ধর্ম্মের কুসংস্কার জ্ঞান করি? অহহ! আমাদের কি কুবুদ্ধি! কি বুদ্ধিভ্রংশ! কি মতিচ্ছন্নতা! আর কোথায় হে প্রপিতামহ মহর্ষিগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিশক্তি! ধন্য তোমাদের সমাজতত্ত্ব-জ্ঞান! তোমরা তীর্থভ্রমণাদি ক্রিয়ার যে সকল ফলাফল নির্দ্দেশ কর, সত্য বটে, তাহাতে লোকেরা তথা-কথিত কুসংস্কারে জড়িত, কিন্তু এ সকল ধর্ম্মভাবে অনু-ষ্ঠিত হওয়ায় পরোক্ষভাবে সমাজের যে কত মঙ্গল সাধিত ও উহারাও এতদনু-ষ্ঠানে কিরূপ প্রোৎসাহিত, তাহা বর্ণনাতীত। আর আমাদের বিদ্যাশিক্ষায় ধিক্! আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধিক্! আমরা তীর্থভ্রমণের সামাজিক মঙ্গল বুঝিতে পারিলেও উহার জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে অগ্রসর হই না!

কলিযুগে মানবসমাজে যত কৃত্রিম সভ্যতা বর্দ্ধিত, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বিদ্যা ও অর্থের সমাদরও তত বর্দ্ধিত। এখন লোকে বিদ্যা ও অর্থের খাতিরে, স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে দেশপর্য্যটন করে ও নানাদেশ দর্শন করে; কিন্তু ধর্ম্মের

জন্ত, নিষ্কাম পরার্থসিদ্ধির জন্য কেহ দেশ পর্য্যটন করিতে চাহে না, কেবল এই অৰ্দ্ধসভ্য প্রাচ্য জগতে মূর্খ লোকে এখনও তীর্থভ্রমণ করে। ওহে অত্যুন্নত সুশিক্ষিত পাঠক! তুমি আজ বিদ্যার গৌরব বুঝিয়াছ, অর্থের গৌরব বুঝিয়াছ, তুমি অগাধ বিদ্যা ও অতুল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নানাদেশ পর্য্যটন করিবে। তুমি এখন সুশিক্ষাগুণে প্রকৃতির যথার্থ সৌন্দর্য্য বুঝিতে শিখিয়াছ। তুমি এখন সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নানাদেশে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিবে। তোমার সুশিক্ষিত মনের নিকট ধর্ম্ম একটা মানবমনের দুর্ব্বলতা মাত্র। তুমি কেন ধর্ম্মের জন্য অনর্থক দেশবিদেশে ভ্রমণ করিবে! সেই অমূল্য সময়টুকু রাজনৈতিক আন্দোলনে বা অন্য কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে যোগ দিলে, তুমি নিজের বংশোজ্জ্বল করিবে, দেশের মুখোজ্জ্বল করিবে এবং দেশের মধ্যে একজন গণ্য ও মান্য লোক হইবে। কন্থবাহী মূর্খের ন্যায় তীর্থভ্রমণ তোমার কি শোভা পায়? এখন তোমার মনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ, যদি তুমি বাক্-দেবীর পীঠস্থল সেই বিলাতভূমি দর্শনপূর্ব্বক ব্যারিষ্টার বা সিভিলিয়ান হইয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে পার, তোমার মানবজীবন সার্থক হয় ও তোমার বংশ উজ্জ্বল হয়। হয়ত তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যদি তুমি হিন্দুসমাজে জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক এতদূর পরিশ্রম করিয়া প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে, তুমিও শ্রীধরস্বামীর ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষালব্ধ জীবিকায় দিনপাত করতঃ দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে ও সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিতে। এখন ভাবিয়া দেখ, শিক্ষাভেদে কতদূর মতভেদ উপস্থিত! তবে কেন তুমি তীর্থভ্রমণকে ধর্ম্মের কুসংস্কার জ্ঞানে এখন এত ঘৃণা কর!

যে হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া সমাজের যাবতীয় লোককে এক রজ্জুতে আবদ্ধ করে, সেই হিন্দুধর্ম্ম আবার ভারতের চতুষ্কোণে চারিটী মহাতীর্থ ও মধ্যে মধ্যে অন্যান্য তীর্থ স্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে এক রজ্জুতে বন্ধন করিতে ও সকলকে সুশাসিত করিতে চেষ্টা পায়। ইহারই জন্য বিভিন্নভাষাসংবলিত, বিভিন্নজাতিবিশিষ্ট ভারতভূমিতে এতকাল হিন্দুধর্ম্ম এমন অক্ষুণ্ণপ্রতাপে প্রচলিত। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রকৃতি ইহার মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতাদি দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ ব্যবধান করাইয়া ইহার এক প্রদেশকে অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক

করে; সেজন্য অতি পুরাকাল হইতে হিন্দুজগৎ বিভিন্ন রাজশক্তিসম্পন্ন কয়েক প্রদেশে বিভক্ত। সকল প্রদেশের লোকবর্গ ধর্ম্মোদ্দেশে তীর্থস্থলে একত্রিত হওয়ায় উহাদের ভিতর পরস্পর সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ্য কতদূর বর্দ্ধিত ও উহাদের জাতীয় উন্নতি কতদূর সাধিত? যেমন জাতীয় সমিতিতে বিভিন্ন প্রদেশের সুশিক্ষিত বিদ্বজ্জন একস্থলে একত্রিত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় সকলের ভিতর সহানুভূতি বর্দ্ধিত ও জাতীয় একতা কথঞ্চিৎ স্থাপিত হয়, সেইরূপ তীর্থস্থলে নানাদেশের বিভিন্ন লোক ধর্ম্মোদ্দেশে একত্রিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও সকলের ভিতর সহানুভূতি বর্দ্ধিত ও জাতীয় একতা স্থাপিত হয়।

যথার্থ বলিতে কি, হিন্দুধর্ম্ম এক তীর্থভ্রমণ উপদেশ দিয়াই সমগ্র হিন্দুজগৎকে চিরদিন সমভাবে শাসন করে এবং ইহার বিভিন্ন জনপদবর্গে প্রায় একরূপ দেশাচার চালিত করে। যথার্থ বলিতে কি, তীর্থযাত্রীরাই বদ্রিনারায়ণ হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত, দ্বারকা হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত এই বিভিন্নজাতিসংবলিত, বিভিন্নভাষাসংবিশিষ্ট সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা চিরদিন উড্ডীয়মান করে। এমন কি, যদি তীর্থভ্রমণ ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ না হইত, হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্ম্ম এতদিন এমন অক্ষুণ্ণপ্রতাপে প্রচলিত থাকিত না। হয়ত এ ধর্ম্ম মুসলমানদিগের অধিকারকালে কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইত। তখন কোথায় বা বেদ ও বেদান্ত! কোথায় বা রামায়ণ ও মহাভারত! সকলই অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইত।

অন্যান্য ধর্ম্মে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রচারক নিযুক্ত। সাধু সন্ন্যাসিগণই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত প্রচারক। তাঁহারাই তীর্থভ্রমণ করিয়া ও ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া দেশে দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ভেরি বাজান। এই যে হরিদ্বারে বা প্রয়াগে প্রতিবৎসরে বা দ্বাদশবৎসর অন্তর কুম্ভমেলায় বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রিবর্গ একস্থানে কয়েক দিবসের জন্য সমবেত হইয়া লক্ষ লক্ষ রজতমুদ্রা ব্যয় করতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, ইহাতে যে অর্থরাশির ব্যয় হয়, তাহা কি কেবল অনর্থক ব্যয়? রেলওয়ে কোম্পানি ও পাণ্ডাদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য ঐ অর্থরাশির ব্যয়? ইহাতে কি হিন্দুসমাজের কোনরূপ মঙ্গল

সাধিত হয় না? ইহাতে কি লোকের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয় না? তবে কেন স্বধর্ম্মের এত নিন্দাবাদ কর?

যে তীর্থভ্রমণ দ্বারা ভারত এতকাল এতদূর উপকৃত, আজ ভারতের কি দুরদৃষ্ট! সেই তীর্থস্থলগুলি আজ কেমন নরককুণ্ডে পরিণত! তত্রত্য পাণ্ডাদিগের অর্থ নিষ্পীড়ন ও পৈশাচিক ব্যবহার, পাপাত্মা ও বেশ্যার সমাগম, পাপরাশির অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মভাবের অভাব, এ সকল দেখিয়া কোন্ ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত না হয়? মনে হয়, যে দেশের রাজা বিধর্ম্মী, তথায় ধর্ম্ম এইরূপে অবনত ও দেশের লোকও এইরূপে মোহান্ধ।

উপবাসাদি ব্রত পালন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ব্রতপালনের জন্য আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করায়। জনসাধারণ এখনও সকল প্রদেশে ঐ সকল ব্রত বিধিবৎ পালন করতঃ ভালরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। মুসলমান ও বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ স্বসেবকদিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করায়। কিন্তু সুসভ্য যুগের সুসভ্য খ্রীষ্টধর্ম্ম এখন কাহাকেও উপবাস করায় না। ইহা দেখিয়া সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় আজ হিন্দুধর্ম্মের এই কঠোর বিধানের উপর অতীব নারাজ। তাঁহারা ভাবেন, ধর্ম্ম মনের বিশ্বাস মাত্র; শরীরকে অযথা কষ্ট দিলে, কি প্রকারে ধর্ম্মসাধন হয়? ঈশ্বরারাধনা দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি কর, পাপপথ হইতে চিরদিন বিরত থাক, সাধ্যানুসারে পরোপকার কর, ইহাই তোমার যথার্থ ধর্ম্মসাধন। তবে কেন তুমি অপদার্থ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের উপদেশানুসারে উপবাস করিয়া তোমার বরবপুকে বৃথা ক্লিষ্ট কর? এ স্থলে অত্যুন্নত পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান কি বলে, তাহাই শ্রবণ করা উচিত। মিতাহারী হইয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আহারবিহারাদি কর; বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, বিশুদ্ধ ভোজন ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পান কর, ইহাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। তবে কেন তুমি স্থবির মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম্মের কথায় কর্ণপাত কর? শরীরের সহিত ধর্ম্মের আবার সম্বন্ধ কি? এইটী এ ধর্ম্মের মহৎ ভ্রম যে, ইহা শারীরিক ক্রিয়ার উপরও অযথা হস্তক্ষেপ করে; এইটী ইহার অনধিকারচর্চ্চামাত্র।

এ স্থলে ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক! অবনিমণ্ডলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া নীরোগ শরীরে জীবন অতিবাহিত করা আমাদের একটী মহৎ ব্রত। এই ব্রতপালনে সকলেই সমভাবে তৎপর। ধনসম্পদ বল, মানসম্ভ্রম বল, পুত্রকলত্র বল, জীবনের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু একমাত্র স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর; এজন্য হিন্দুধর্ম্মও সকলকে চিরদিন উপদেশ দেয়, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং," স্বাস্থ্যরক্ষাই ধর্ম্মের প্রধান সাধন। আমরা কি উপায়ে প্রকৃত স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া সর্ব্বসুখে সুখী হই, কি উপায়ে আমরা উৎকট রোগসমূহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করি, তদ্বিষয়ে এ ধর্ম্ম বিশেষ মনোযোগী। সংসারে অশেষ দুঃখরাশির মধ্যে প্রকৃত সুখবর্দ্ধন করাই যে ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, সে ধর্ম্ম কি সকল সুখসম্ভোগের মূলীভূত কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিবে না? যে ধর্ম্ম ভবসংসারের যাবতীয় কর্ম্মের উপর স্বীয় প্রীতিপদ অনুশাসন চালাইয়া সকলকে যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক করে, সে ধর্ম্ম কি অশেষ সুখের নিদান স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিবে না? সুতরাং স্বাস্থ্যবর্দ্ধন দ্বারা শরীরধর্ম্ম পালন করিবার জন্য উপবাস শাস্ত্রে উপদিষ্ট।

উপবাস দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন কি প্রকারে সম্ভব? কোথায় উপবাস করিলে নিয়মিত সময়ে আহারাদি না পাইয়া পাকস্থলী বিকৃত ও সেই সঙ্গে সমস্ত শরীর বিকৃত? না কোথায় উপবাস দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত? এ অসম্ভব কথায় কে বিশ্বাস করে? ইহা ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা নয়! দেখ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজকাল রোগের সময়েও কাহাকেও লঙ্ঘন করায় না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইহা পুষ্টিকারক ও বলকারক পথ্যের সুব্যবস্থা করে। তবে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রলাপে কি কর্ণপাত করা উচিত?

এখন দেখা যাউক, রোগের সময় প্রকৃতি কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া রোগের শান্তি করে? কেন নানারোগে প্রকৃতি ক্ষুধামান্দ্য আনয়ন করিয়া স্বাভাবিক লঙ্ঘন করায়? কেন অন্যান্য জীবজন্তু রোগাক্রান্ত হইলে স্বতঃ উপবাস করে? উপবাস বা লঙ্ঘন সকল ঔষধের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত মহৌষধ। এক উপবাস করাইয়া প্রকৃতি অনেক সময়ে নানারোগের শান্তি করে। এক লঙ্ঘন দ্বারা অনেক উৎকট রোগের উপশম হয়। উপবাসের এত গুণ বলিয়া

প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্ম্ম রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সকলকে সময়ে সময়ে উপবাস করাইয়া তাঁহাদের শরীরকে রোগাক্রান্ত হইতে দেয় না। অতএব শরীরের রোগপ্রবণতা দূরীকরণই উপবাসের প্রথম ফল।

শরীরের কোন যন্ত্র বিকৃত হইলে, সেই যান্ত্রিকবিকার শরীর-প্রকৃতির স্বাভাবিক রোগপ্রশমনশক্তি দ্বারা দূরীভূত হয়। যাঁহার শরীরের রোগ-প্রশমনশক্তি যেরূপ বলবতী, তিনি সেইরূপ উৎকট রোগ হইতে অল্পাধিক সময়ে অব্যাহতি পান। দুঃসাধ্য ব্যাধির আরোগ্যে প্রকৃতির এই রোগপ্রশ-মনশক্তি অধিক কার্য্যকারিকা। উৎকট রোগে তুমি অর্থবলে শ্রেষ্ঠচিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলেই, যে তুমি সেই রোগ হইতে অব্যাহতি পাও, এমন নহে। সহস্র কেন, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন কর না, সহস্র কেন, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হও না, তোমার শারীরিক প্রকৃ-তির রোগপ্রশমনশক্তি যেরূপ বলবতী, তুমিও সেইরূপ অত্যুৎকট রোগসমূহ হইতে নিষ্কৃতি পাও। এজন্য শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি বর্দ্ধন করা সক-লের একান্ত কর্ত্তব্য। যেমন প্রকৃতি স্বয়ং উপবাস করাইয়া নানা রোগের স্বাভাবিক প্রশমন করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ প্রকৃতি-সেবক হিন্দুধর্ম্মও সময়ে সময়ে সকলকে উপবাস করাইয়া শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি বর্দ্ধন করিতে চেষ্টা পায়। অতএব শরীরপ্রকৃতির রোগপ্রশমনশক্তির বর্দ্ধনই উপবাসের দ্বিতীয় ফল। অস্মদ্দেশীয় বিধবাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এ বিষয়টী ভালরূপ বুঝিতে পারিবে। বিধবারা উপবাস করিয়া যেমন শরীরকে বিধিমতে ক্লিষ্ট করেন, তাঁহারা তেমনি কেমন দীর্ঘজীবন ভোগ করেন এবং কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে, তাঁহারা কেমন সহজে সেই রোগ হইতে অব্যাহতি পান!

আজকাল উন্নতচিকিৎসাবিজ্ঞান নানা উৎকট রোগের নানাবিধ কীটাণু (Germ) আবিষ্কার করে। তজ্জন্য কেহ কেহ বলেন, যখন ঐ সকল কীটাণু শরীরাভ্যন্তরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেই নানা রোগ উৎপন্ন, তখন উপবাসের দ্বারা শরীরের কি উপকার সাধিত? ঐ সকল কীটাণুবশতঃ উৎকট রোগ উৎপন্ন হউক বা অন্য কোন কারণে উৎপন্ন হউক, ইহা সুনিশ্চিত, উপবাস দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করিতে পারিলে, রোগের বীজস্বরূপ ঐ সকল কীটাণু বা অন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ শরীরে অধিক বলবৎ হয় না এবং ইহার রোগপ্রশ-

মনশক্তি বর্দ্ধিত হইলে, অনায়াসে ঐ সকল কারণ দূর করা যায়। অতএব উপবাস শরীরের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আশাতীত ফলোৎপাদন করে। এক দিনের বা দুই দিনের উপবাসে কিছুই ফল নাই; দীর্ঘকাল ধরিয়া মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে ইহার প্রকৃত সুফল পাওয়া যায়।

দুই দিবসের উপবাসও রেচকব্যবহার তুল্যমূল্য। শরীর সম্বন্ধে ইহাদের ক্রিয়া প্রায় একরূপ। যাহা রেচনদ্বারা সম্পাদিত, তাহাই আবার লঙ্ঘন দ্বারা উত্তমরূপ সম্পাদিত। কবিরাজগণ বলেন, নিত্য আহার বিহার করিতে করিতে শরীরে রোগোৎপাদক রস উৎপন্ন হয়। যে স্থলে রেচক সেই দূষিত আম ও রসকে শরীরাভ্যন্তর হইতে নিঃসরণ করায়, সে স্থলে উপবাস উহাদিগকে শরীরাভ্যন্তরে পরিপাক করায়। কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে ইহাদের বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে, পাকাশয় ও অন্ত্রের খাদ্যপাচিকাশক্তি বর্দ্ধিত হয়। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লইলে, যেমন শরীরের তেজ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে পাকাশয়কে ইহার নিয়মিত কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিলে, ইহার তেজ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু রেচক ব্যবহার দ্বারা ইহার প্রভূত অনিষ্টোৎপত্তি হয়। মধ্যে মধ্যে রেচক ব্যবহার করিলে, পাকাশয় ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়ে। প্রকৃতি-সেবক হোমিওপ্যাথী কেন রেচক আদৌ ব্যবহার করে না? আর এলোপ্যাথী বা এলোপাতাড়ী কেন ইহার অপব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে? সূক্ষ্মদর্শী হোমিওপ্যাথী রেচক ব্যবহারের অপকারিতা ভালরূপ বুঝিতে পারে; আর স্থূলদর্শী এলোপ্যাথী ইহার ভবিষ্যৎ অপকার চক্ষে দেখিয়াও দেখে না এবং আশু উপকারদর্শনে বিমুগ্ধ হয়। আজকাল অনেকে রেচকের অপব্যবহার করিয়া মন্দাগ্নি, উদরাময়, সংগ্রহিণী প্রভৃতি নানাবিধ উৎকটরোগে আক্রান্ত হন। অতএব যাঁহারা প্রাজ্ঞ ও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা আদৌ রেচক ব্যবহারের পক্ষপাতী নন; বরঞ্চ ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা উপবাসের পক্ষপাতী হন।

কবিরাজগণ তরুণজ্বরে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ পশ্চিমাঞ্চলে একমাত্র লঙ্ঘন দ্বারা বাতশ্লেষ্মাদি উৎকট রোগ আরোগ্য করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান আজকাল লঙ্ঘনের আদৌ পক্ষপাতী নয়। লঙ্ঘন, রক্তমোক্ষণ ও অযথাপারদসেবনের অনুপকার প্রাপ্ত হইয়া, ইহা এখন

বিপরীত দিকে ধাবিত ; তজ্জন্য ইহা ব্রথ ব্রাণ্ডি প্রভৃতি পুষ্টিকারক ও উত্তেজক পথ্যের ব্যবস্থা করে। এ প্রথার অনুসরণ করায় ইহা প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করে। যে উপায়ে প্রকৃতি রোগের স্বাভাবিক প্রশমন করে, তাহা ইহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু পুরাকালের মহর্ষিগণ প্রকৃত প্রকৃতি-সেবক। তাঁহারা নানারোগে একমাত্র লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃতির অনুকরণ করিতে উপদেশ দেন। কেহ কেহ বলেন, লঙ্ঘন দ্বারা বাতশ্লেষ্মাদি রোগের যেরূপ নিখুঁৎ আরাম হয়, কতকগুলি ছাইভস্ম ব্রথ ব্রাণ্ডি দিয়া রুগ্নশরীরের পোষণ ও উত্তেজন করায় সেরূপ নিখুঁৎ আরাম করা যায় না। যাহা হউক, লোকে এখন উপবাসে অনভ্যস্ত ও ক্ষীণবীর্য্য ; প্রাকৃতিক উপায়ে রোগপ্রশমনের জন্য যতদিন লঙ্ঘন আবশ্যক, ততদিন ধরিয়া লঙ্ঘন তাহারা সহ্য করিতে পারে না, অথবা ততদিনের ভিতর তাহাদের প্রাণান্ত হইয়া যায় ; সেজন্য পুষ্টিকারক পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

শরীরের উপর উপবাসের অশেষ গুণ বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতে উপদেশ দেয়। এখন জিজ্ঞাস্য, যে দেশে ধর্ম্ম সাধনার্থ উপবাস আদৌ প্রচলিত নাই, সে দেশের লোকেরা কি দীর্ঘজীবন-ভোগ করে না বা কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাহা হইতে অব্যাহতি পায় না ? দেখ, খৃষ্টজগতে উপবাসপ্রথা আদৌ প্রচলিত নাই ; অথচ তথায় লোকে দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া কেমন স্বাস্থ্যসুখে কালাতিপাত করে ! মিতাহার, নিয়মিত সময়ে আহারবিহারাদি, নিয়মিত কায়িকপরিশ্রম, বিশুদ্ধ ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ পানীয় জলপান প্রভৃতি যে যে বিষয় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক, তাহা উহারা এখন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতি পাইয়া বিধিবৎ পালন করে ও সুখে দীর্ঘজীবন ভোগ করে। তবে কেন উপবাসের অযথা প্রশংসা কর ? এস্থলে সকলের একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শীতপ্রধান-দেশে জলবায়ুর গুণে জনসাধারণ তথায় প্রাকৃতিক কারণে দীর্ঘায়ু ও বলিষ্ঠ ; আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উহারা স্বভাবতঃ অল্পায়ু ও ক্ষীণবীর্য্য। অতএব শেষোক্ত স্থানে দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য উপবাসাদি বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরা অগাধ পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন গুণে উপবাসের গুণাগুণ বুঝিতে পারিয়া উহা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের সুব্যবস্থা কি এখন

হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য? যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে জীবন গঠিত করেন, তাঁহারাও কেন দীর্ঘজীবন ভোগ করেন না? তবে কেন, তোমরা শাস্ত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে এত ব্যগ্র?

উপবাস দ্বারা মানবমনও অশেষরূপে উপকৃত। শরীরের উপর ইহার উপকার পরোক্ষভাবে সাধিত; কিন্তু মনের উপর ইহার উপকার সকল সময়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত। ইহা দ্বারাই মন ক্রমশঃ সংযত, ইহার একাগ্রতা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা বর্দ্ধিত ও দুর্দ্দম্য কামপ্রবৃত্তি মন্দীভূত। এ কলিযুগে অল্পায়ু ক্ষীণবীর্য্য মানব পুরাকালের ন্যায় মনসংযমের জন্য তপস্যাদি অবলম্বন করিতে পারেন না। অতএব হিন্দুধর্ম্ম যুগধর্ম্মে বাধ্য হইয়া অন্নগত-প্রাণ মানবের প্রকৃত মনসংযমের জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করাইয়া তাঁহার কালোচিত তপঃসাধন করায়। কলিযুগে উপবাসই ঘোর তপস্যা; এজন্য শাস্ত্রে ইহার এত প্রশংসা এবং প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথমেই ইহা সম্যক উপদিষ্ট।

উপবাস মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়। যেমন কামপ্রবৃত্তি যত অল্পপরিমাণে চালনা করা যায়, উহার তেজ তত মন্দীভূত হয়; সেইরূপ মধ্যে মধ্যে ক্ষুধাগ্নিকে দমন করিলে মনের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্যক বর্দ্ধিত হয়। যে পাপসংসারে আমাদের চতুর্দ্দিকে বিপদ আপদ অনুক্ষণ ঘনীভূত, সে সংসারে ধৈর্য্য গুণ থাকা কত আবশ্যক! এক ধৈর্য্যগুণ থাকিলে আমরা সংসারের নানা বিপদ হইতে উদ্ধার পাই। এক ধৈর্য্যগুণ থাকিলে আমরা সংসারের যাবতীয় বিপদআপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষা করি। এখন যে উপবাস দ্বারা মনের ধৈর্য্যগুণ বর্দ্ধিত, সে উপবাস আমাদের কত মহোপকারী! ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্ম উপবাসকে ধর্ম্মসাধনার এক অঙ্গস্বরূপ করে এবং এতদর্থে নানা ব্রতের উপদেশ দেয়। আজকাল অনেকে নিয়মিত সময়ে আহার না পাইলে একেবারে ক্রোধান্ধ হন; উপবাসে অভ্যস্ত থাকিলে, এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি কি সম্ভব? এখন সুস্থশরীরে উপবাস করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এখন আমরা উপবাসের নামে শিহরিয়া উঠি।

কলিযুগে মানব নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির দাস; এমন কি কামরিপু চরিতার্থতার জন্য তিনি এখন নিকৃষ্টজন্তু অপেক্ষা সমধিক উন্মত্ত। এই অত্যুগ্র কামপ্রবৃত্তি

যাহাতে কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হয়, যাহাতে ইহার দুর্দ্দম্য তেজ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে শুক্রদেবের অপচয়ে আয়ুর্বল হ্রাসপ্রাপ্ত, সে শুক্রদেবকে শরীরে যত রক্ষা করা যায়, ইহার ততই মঙ্গল। অতএব ইন্দ্রিয় দমন করা সকলের সমান কর্ত্তব্য। সামান্য মৌখিক উপদেশে ইন্দ্রিয় দমন হয় না। তজ্জন্য অশেষ ক্রিয়াযোগ ও মনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা আবশ্যক। উপবাসের আর একটি মহৎ গুণ এই যে, ইহা দ্বারা কামপ্রবৃত্তির তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়। যেমন বহুদিবস ধরিয়া আমিষ ভোজন করিলে মন ক্রমশঃ কোপনস্বভাব হয়, সেইরূপ বহুদিবস ধরিয়া মধ্যে মধ্যে রীতিমত উপবাস করিলে কামপ্রবৃত্তির তেজ সবিশেষ মন্দীভূত হয়। এ দেশের বিধবা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নেত্রপাত কর, এ বিষয়টী ভালরূপ বুঝিতে পারিবে।

উপবাসের আর একটি মহৎ গুণ, ইহাতে ভোজনসুখ বর্দ্ধিত হয়। প্রতিদিন যথাসময়ে ভোজন করিলে ভোজনে তাদৃশ সুখানুভব হয় না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে ভোজনসুখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। এস্থলে একদিকে উপবাসের যেরূপ কষ্ট, ভোজনেও তদনুরূপ সুখবোধ। যাঁহারা উপবাসে অভ্যস্ত, তাঁহাদেরই ভাগ্যে এ সুখলাভ ঘটে। আর যাঁহারা উপবাসে অনভ্যস্ত এবং এ সুখের সহিত অপরিচিত, তাঁহাদের একবার ভাবা উচিত, কোন রোগ আরোগ্য হইবার পর তাঁহারা অন্ন ভোজন করিয়া কিরূপ পরিতৃপ্ত হন। এইরূপ উপবাসদ্বারা মানবমন অশেষরূপে উপকৃত।

সেইরূপ উপবাসদ্বারা জীবাত্মাও অশেষরূপে উপকৃত। উপবাসের জন্য যে সকল ব্রত শাস্ত্রে উপদিষ্ট, সে সকল ব্রত অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে, মনে কেমন বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ হয়! যাহাতে মনের আত্মপ্রসাদ লাভ, তাহাতেই জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি, তাহাতেই ইহার অশেষ পুণ্যলাভ ও তাহাতেই ইহার অশেষ পারত্রিক মঙ্গললাভ। যে উপবাসে শরীরের যেমন উপকার, মনের তেমনি উপকার, আবার জীবাত্মার ততোধিক উপকার, সেই উপবাসে মানবমনের গূঢ়রহস্যজ্ঞ হিন্দুধর্ম্ম কেবল পুণ্যলাভের কথা নির্দ্দেশ করে। এরূপ নির্দ্দেশ করিবার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের অপরাধ কি? যে উপবাসে শরীরের অশেষ কষ্ট, কলিযুগের অন্নগত-প্রাণ, আয়াসপ্রিয়-মানব

কি সেই উপবাস সহজে করিতে চান? নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের নামে সেই পরমকল্যাণকর ক্রিয়াসম্পাদনে তাঁহাকে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করিবার জন্যই এধর্ম্ম ইহার পুণ্যের কথা নির্দ্দেশ করে। যদি তোমার সুশিক্ষিত মনের নিকট এখন উহা ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া বোধ হয়, তবে কোন্‌টি সমাজের সুসংস্কার? যে কর্ম্মে সমাজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহা কি কদাচ কুসংস্কার হইতে পারে? তবে কেন তোমরা আজ ঐ সকল কল্যাণকর ধর্ম্মানুষ্ঠানকে ধর্ম্মের কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ কর?

এখন দেখ, যে উপবাসে আমাদের অশেষ উপকার; সেই উপবাসে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে কিরূপ প্রোৎসাহিত করে? কি বিবাহোৎসব, কি শ্রাদ্ধোৎসব, কি দেবোৎসব, কি ব্রতোৎসব, সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথমেই ইহা উপবাস করিতে উপদেশ দেয়। তুমি যাঁহার সহিত আজীবন ধর্ম্মাচরণ করিবে, তাঁহার সহিত আজ মন্ত্রপূত হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে, এ ধর্ম্ম তোমায় বলে, সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া তুমি মন্ত্রপূত হও, ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল। তুমি আজ স্নেহময়ী কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়া বা সুপাত্রীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া নিজ দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবে, এ ধর্ম্ম তোমায় বলে, সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া সম্প্রদানাদি কার্য্য সম্পাদন কর, ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল। তুমি আজ মৃত পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃমাতৃ-ঋণ হইতে উদ্ধার পাইবে, এ ধর্ম্ম তোমায় বলে, তুমি উপবাস করিয়া উহাদের প্রেতাত্মাদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান কর, ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল। তোমার গৃহে আজ কোন দেবোৎসব বা ব্রতোৎসব হইবে, এ ধর্ম্ম তোমায় বলে, তুমি উপবাসে থাকিয়া ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাহায্য কর ও দেবতাদিগের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর, ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল। আজ অমাবস্যা, আজ পূর্ণিমা, আজ মহাজন্মাষ্টমী, আজ শিবরাত্র, এ সকল শুভোপলক্ষে তোমাদের ধর্ম্মাচরণ একান্ত আবশ্যক, এ ধর্ম্মও তোমাদিগকে বলে, উপবাসে থাকিয়া শাস্ত্রোক্ত ব্রতপালন কর, ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল। এরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে উপবাসে প্রোৎসাহিত করে এবং উপবাস করাইয়া আমাদের শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল সম্পাদন করে।

এস্থলে হিন্দুবিধবাদিগের একাদশীব্রতের কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। হিন্দু-

শাস্ত্রের আদেশে বিধবাগণ একাদশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবেন। তাঁহাদের নিরম্বু উপবাসের ক্লেশদর্শনে ব্যথিতহৃদয় হইয়া কেহ কেহ ভাবেন, ধর্ম্মের এ কি অবিচার! ধর্ম্ম পত্যন্তর গ্রহণ করিতে না দিয়া একদিকে উহাদিগকে কতদূর মানসিক কষ্ট দেয়! আবার গোদের উপর বিস্ফোটক! উহাদিগকে অপরদিকে একাদশীতিথিতে নিরম্বু উপবাস করাইয়া কতদূর শারীরিক যন্ত্রণা দেয়! রে নিষ্ঠুর হিন্দুধর্ম্ম! তুমি কেন এমন নবনীতপুত্তলী অবলাদিগকে বিধিমতে এত ক্লেশ ও যন্ত্রনা দেও? ইহাতে তোমার কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ? এস্থলে হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যুত্তর দেয়, "রে পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার! আমার এমন অযথা নিন্দাবাদ করিও না! তোমার জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইবে! নিরম্বু উপবাসের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা কর।"

যে ধর্ম্ম দম্পতিমিলনে নারীজাতিকে পুরুষজাতির চিরদিনের জন্য অর্দ্ধাঙ্গিনী করে এবং উহাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে ও ত্বকে ত্বকে সর্ব্বাঙ্গীন মিলন ঘটায়, সে ধর্ম্ম কি প্রকারে বিধবাকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইবে? সে ধর্ম্ম পরমারাধ্য পতির মৃত্যুতে দুঃখিনী বিধবাকে ইহজীবনের যাবতীয় সুখসম্ভোগে জলাঞ্জলি দেওয়ায়, পতির প্রতি অনন্যপ্রেমের খাতিরে দুর্জ্জয় কামপ্রবৃত্তি দমন করাইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করায় এবং তাঁহাকে সংসারাশ্রমে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী ও যোগিনী সাজাইয়া নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও পরসেবায় প্রোৎসাহিত করায়। তাঁহারই প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের জন্য, তাঁহার প্রকৃত মনঃসংযমের জন্য, তাঁহার দুর্জ্জয় কামপ্রবৃত্তি দমনের জন্য নিরম্বু উপবাস একাদশীতিথিতে উপদিষ্ট। ইহাতে উপবাসের যে সকল মহোপকার ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত, তৎসমুদায়ই বিধবা ভালরূপ লাভ করেন। পক্ষে পক্ষে এইরূপ নির্জলা উপবাস করাতে তাঁহার কামপ্রবৃত্তি কতদূর মন্দীভূত! নিজের কষ্টরাশি বহন করিবার জন্য, পরসেবার জন্য তাঁহার ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা ইহাতে কিরূপ বর্দ্ধিত! ইহাতে তাঁহার কিরূপ তপঃসাধন, ধর্ম্মসাধন ও পুণ্যলাভ!

দারুণগ্রীষ্মে, দারুণপিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ, অথচ একবিন্দু জলস্পর্শ নাই। ধৈর্য্যের এমন মহৎ দৃষ্টান্ত কোন্ ধর্ম্ম এ জগতে দেখায় বল? রে ধর্ম্মাত্মা বিধবে! ধন্য তোমার তপঃসাধন! ধন্য তোমার তিতিক্ষা! তুমি নিজগুণে হিন্দুসংসার পবিত্র ও উজ্জ্বল কর! তুমি যে ইহজীবনে এত

কষ্ট সহ্য কর, তাহাতে পরলোকে তুমি কি তেমনি সুখী হইবে না? যে প্রাণ-পতির জন্য তুমি সংসারে যোগিনী সাজ, তাঁহারই প্রেতাত্মা তোমার উপর চিরদিন পুষ্পবর্ষণ করে। আর ওহে ধর্ম্মাত্মা হিন্দুযুবক! যদি তোমার প্রিয়তমা দুহিতা বৈধব্যদশায় পতিত হইয়া একাদশীতিথিতে নিরম্বু উপবাস করেন, তুমিও সপরিবারে উপবাসে থাকিয়া কলিকালের এই শ্রেষ্ঠ তপঃসাধনে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত কর। ইহাতে তোমার যেমন মঙ্গল, তোমার পরিবারবর্গেরও তেমনি মঙ্গল। যদি তোমার প্রাণসম পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূ নিরম্বু উপবাস করেন, তুমিও সপরিবারে উপবাসে থাকিয়া এই শ্রেষ্ঠধর্ম্মসাধনে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত কর। ইহাতেই তোমার সংসারের অশেষ মঙ্গল।

এখন জিজ্ঞাস্য, একাদশীতিথিতে কেন এ নিরম্বু উপবাস উপদিষ্ট? ইহাতে ধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য কি? ইহাতে শরীরের অশেষ উপকার। যেমন চন্দ্রের আকর্ষণ বশতঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সমুদ্রের জোয়ার অধিক বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ চন্দ্রের আকর্ষণ বশতঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় শরীর অধিক বিকৃত হয় এবং শরীরস্থ অনেক ব্যাধি উগ্ররূপ ধারণ করে। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় শরীর অধিক বিকৃত হইবার পূর্ব্বে একাদশীতিথিতে নিরম্বু উপবাস করাইয়া শরীরের স্বাভাবিক দোষ খণ্ডন করায়। এই প্রকারে এ ধর্ম্ম একাদশীব্রত দ্বারা বিধবাদিগের ভালরূপ স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

যে উপবাসের এত মহৎগুণ, যে উপবাসদ্বারা মানব এতদূর উপকৃত, সেই উপবাস আজ শিক্ষাদোষে আমাদের নিকট ধর্ম্মের একটা কুসংস্কার। আমাদের ধর্ম্মাত্মা পিতামহগণ শাস্ত্রোক্ত উপবাসাদি ব্রতপালন করিয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করতঃ কেমন সুখে কালাতিপাত করেন! আজ আমরা পঞ্চাশৎবর্ষ অতিক্রম করিলেই আপনাদিগকে দীর্ঘজীবী মনে করি; কিন্তু তাঁহারা পঞ্চাশৎবর্ষবয়ঃক্রমকালে বলিষ্ঠ যুবা থাকেন। এখন আমাদের সুবিধার জন্য চতুর্দ্দিকে রেল, ট্রাম ও অর্ণবপোত উদ্ভাবিত, আমরাও দুই পা হাঁটিতে কষ্ট বোধ করি; কিন্তু তাঁহারা অনায়াসে স্বচ্ছন্দে বিশ ক্রোশ হাঁটেন। এখন আমরা কি ছাই ভস্ম পড়িয়া অল্পবয়সে চক্ষুদ্বয়ের মাথা খাই; কিন্তু তাঁহারা অশীতিবর্ষ বয়ক্রমকালেও ভালরূপ চক্ষে সন্দর্শন করেন। এখন আমরা সহজ শরীরে আদৌ উপবাস করিতে চাই না; প্রকৃতিও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত করাইয়া আমাদিগকে জবরদস্তি

অনেক সময়ে উপবাস করায়। প্রকৃতির অমোঘ আদেশ অবহেলা করিলে, শরীর কি এইরূপে রুগ্ন, ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু হইবে না? নিশ্চয় জানিও, যে সকল কারণে আজ বঙ্গবাসী এমন অল্পায়ু, তন্মধ্যে শাস্ত্রোক্ত ব্রতাদি পালন না করাও ইহার একটা প্রধান কারণ।

পরিশেষে বক্তব্য, যদি এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া স্বাস্থ্য-সুখে কালাতিপাত করিতে চাও, শাস্ত্রোক্ত ব্রতপালনে যত্নবান হও ও উপবাসে আপনাকে অভ্যস্ত কর। কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিবে, উপবাসের কি মহৎগুণ এবং ইহা দ্বারা তোমার জীবাত্মা, মন ও শরীর কিরূপ উপকৃত!

গাভী পূজা।

বল দেখি, হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ অসার ও অপদার্থ! একটা সামান্য চতুষ্পদ জন্তুকেও এ ধর্ম্ম পূজা করিতে উপদেশ দেয়। যে ধর্ম্মের নিকট প্রস্তর, সর্প, বৃক্ষাদি সকলই পূজ্য, সে ধর্ম্ম যে একটা চতুষ্পদ জন্তুকে পূজা করিতে উপদেশ দিবে না, ইহাই ইহার পক্ষে বিচিত্র কথা। সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় স্বধর্ম্মের গাভীপূজনসম্বন্ধে ঐরূপ ভাবেন। বাল্যকালে তাঁহারা সকলেই গাভীদর্শনে "মা ভগবতি!" বলিয়া প্রণাম করেন। কিন্তু যে দিন তাঁহারা অন্ধকার হইতে আলোকে আইসেন, সেই দিন হইতে গাভী তাঁহাদের নিকট একটা সামান্য চতুষ্পদ জন্তু এবং স্থলবিশেষে, বোধ হয়, উহাকে পদাঘাত করিতে পারিলে, তাঁহারা সার্থকজন্মা হন। আবার তাঁহাদের কোন কোন উদারচিত্ত ভ্রাতা বিদ্যার অত্যুজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হইয়া আজকাল গোপনে গোমাংস ভক্ষণ করতঃ ভগীরথের ন্যায় সপ্তপুরুষ উদ্ধার করেন ও কলিকালে গোমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন। তাঁহারা গাভী পূজার বিস্তর নিন্দাবাদ করেন বটে, কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মের যে কি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে চেষ্টা করেন না।

এখন গাভী পূজার ভিতর হিন্দুধর্ম্মের কি গূঢ় রহস্য, তাহা উদ্ঘাটন করা কর্ত্তব্য। গাভী আমাদের কত মহোপকারী জীব! ইহারই দুগ্ধে আমরা আশৈশব লালিত ও পালিত। যে দুগ্ধ ইহার বৎসপোষণের জন্য বিহিত, আমরা সেই দুগ্ধ অবলার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পান করি বা

পুত্র, কন্যাদিগকে পান করাই। বল দেখি, আমরা স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া গাভিজাতির প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করি! ইহাদের বৎসগুলিকে জীর্ণ ও শীর্ণ করতঃ ইহাদের দুগ্ধে স্বীয় সন্তানদিগের লালন পালন করি এবং সেই দুগ্ধে ঘৃত, ক্ষীর, পনির ও ছানা প্রস্তুত করিয়া কত প্রকার সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করি! ইহাদের পুংবৎসগুলিকে বৃষ ও বলীবৰ্দ্দ করিয়া, উহাদের দ্বারা কৃষিকাৰ্য্য সম্পাদন করি। তাহাতেই আমরা দিনান্তে মুষ্টিমেয় অন্ন ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করি। ইহাদের গর্ভজাত বলদগুলিকে পণ্যদ্রব্য বহনে আমরা নিযুক্ত করি। ইহারা সবংশে ও সসন্ততিতে চিরদিন আমাদেরই অশেষ সেবা ও শুশ্রূষা করে। ইঁহাদের পবিত্র গোময় আমাদের পর্ণকুটীর লেপনে ও পরিষ্করণে এবং অন্নপাকে চিরদিন ব্যবহৃত। মৃত্যুর পরও ইহাদের চৰ্ম্ম আমাদের পদদ্বয়কে কণ্টকাদি হইতে রক্ষা করিতে ব্যবহৃত এবং ইহা-দের অস্থিগুলি শর্করা পরিষ্করণে নিযুক্ত। অতএব ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, গাভিকুল আমাদের কিরূপ মহোপকারী!

এখন প্রকৃতি স্বয়ং গাভিজাতিকে আমাদের সেবক করিয়া দেয় নাই। আমরা বুদ্ধিবলে, কৌশলবলে ও বলপূৰ্ব্বক ঐ অবলাজাতিকে আমাদের সেবক করিয়া লই। উহারাও যাবজ্জীবন আমাদের গৃহে পালিত হইয়া কায়মনোবাক্যে আমাদের সেবা ও শুশ্রূষা করে এবং তৎপরিবর্ত্তে ক্ষেত্রের মুষ্টিমেয় তৃণ ভোজন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। এখন ভাব দেখি, এই অবলা গাভিজাতির প্রতি আমরা স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে কিরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করি! এরূপ নিষ্ঠুরতাচরণে কি আমরা পাপপঙ্কে লিপ্ত হই না? যে ধৰ্ম্মাত্মা হিন্দু সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য গাভিজাতির প্রতি কার্য্যতঃ অশেষ নিষ্ঠুরতা-চরণ করিতে বাধ্য, তিনিই আবার নিজ মন হইতে নিষ্ঠুরভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার জন্য গাভীর সমক্ষে করযোড়ে, ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হন। যে ধৰ্ম্মাত্মা হিন্দু গাভিজাতির প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে মহাপাতকে লিপ্ত হইতে ভীত, তিনিই আবার নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গাভীকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দানে পূজা করেন। ইহাই গাভী পূজনে হিন্দুধৰ্ম্মের প্রথম উদ্দেশ্য।

যে গোবংশ আমাদের এত মহোপকারী, উহাদের নিকট আমরা কিরূপ ঋণে আবদ্ধ ও উহাদের প্রতি আমাদের কিরূপ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত! অন্ত-

রের যথার্থ কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ দেয়, তোমরা উহাদের পদতলে ভক্তিভাবে প্রণত হও, যথাবিধি উহাদের সেবা ও শুশ্রূষা কর, উহাদের প্রতি আদৌ নিষ্ঠুরতাচরণ করিও না এবং কদাচ কোন কারণে গোহত্যা করিও না। আঃ! মরি! মরি! এস্থলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার কি স্বর্গীয়ভাব স্ফুরিত! এক ভাবপ্রধান হিন্দু ব্যতীত জগতের কোন্ জাতি কৃতজ্ঞতার এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে পারে!

যদি কেহ তোমার বিশেষ উপকার করেন, তুমি তাঁহার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ! তুমি সেই ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত কত শ্রদ্ধা, কত ভক্তি ও কত মান্য কর! এখন ভাব দেখি, যে গাভিকুল আমাদের মহোপকারী, যাহার উপর আমরা প্রাণধারণের জন্য সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করি, সেই গাভিকুলের উপর আমাদের কতদূর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? অন্তরের কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে গাভীপূজা করিতে শিখায়। রে হিন্দুধর্ম্ম! এস্থলে পাষণ্ড ম্লেচ্ছধর্ম্ম তোমার ন্যক্কারজনক ভাবাভিনয় দেখে বটে, কিন্তু ইহাতেই তোমার মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব ভালরূপ প্রকাশিত। অতএব যে ধর্ম্ম যাহাই বলুক বা যাহাই ভাবুক, অন্তরের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশই গাভী পূজনে এ ধর্ম্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

আবার যে গাভিজাতি আমাদের এত মহোপকারী, সে জাতির কিরূপ সেবা ও শুশ্রূষা করা উচিত? অকপট ও নিঃস্বার্থ সেবা ব্যতীত কি সে জাতির উন্নতি সম্ভব? স্বার্থসাধনোদ্দেশে যে বস্তুর সেবা করা যায়, স্বার্থের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে, সেবারও বিলক্ষণ বিপর্য্যয় উপস্থিত; কিন্তু যদি সে বস্তুর নিঃস্বার্থভাবে কায়মনোবাক্যে সেবা করা যায়, স্বার্থের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলেও সেবা সম্বন্ধে অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য অসম্ভব। ইহার জন্য যে গাভিকুল আমাদের এত মহোপকারী, সেই গাভিকুলের নিঃস্বার্থভাবে ও ধর্ম্মভাবে সেবাও শুশ্রূষা করিয়া উহাদের সম্যক উন্নতিসাধন করতঃ হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গলসাধনের জন্যই হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে উহাদের পূজা করিতে উপদেশ দেয় এবং সেই সঙ্গে গোহত্যা মহাপাতক, এই সুসংস্কার আমাদের মনে চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল করিয়া দেয়। অতএব নিঃস্বার্থভাবে সেবা ও শুশ্রূষা করাই গাভী পূজনে হিন্দুধর্ম্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য।

আমরা মাতৃস্নেহের কেন এত প্রশংসা করি? কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ বলিয়াই ইহার এত আদর, এত গৌরব ও এত মাহাত্ম্য! সকল প্রকার ভালবাসায় কিছু না কিছু স্বার্থ মিশ্রিত; কিন্তু মাতৃস্নেহে স্বার্থের লেশমাত্র নাই। কুপুত্র হয়, কিন্তু কুমাতা কখন হয় না। পুত্র যতই কেন অক্ষম ও মূর্খ হউক না, মাতার স্নেহ স্তনধারার ন্যায় উহার জন্য সদা ক্ষরিত ও বিগলিত। সেইরূপ নিঃস্বার্থভাবে, ধর্ম্মভাবে গাভিজাতির যে সেবা করা যায়, তাহাই প্রকৃত সেবা, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা। যে গাভী ভালরূপ দুগ্ধপ্রদান করে, তাহার ত সেবা সকলেই করিয়া থাকে। কিন্তু যে গাভী দুগ্ধ প্রদান করে না, নিঃস্বার্থভাবে ও ধর্ম্মভাবে সে গাভীর সেবা এক ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ব্যতীত এ জগতে কোন্ জাতি করে?

যে গাভিকুল দ্বারা মানব এতদূর উপকৃত, মানবসমাজমাত্রেই সেই গাভিকুলের যথাবিধি সেবা ও শুশ্রূষা করে। অন্যান্য দেশে কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশেই উহাদের সেবা ও শুশ্রূষা হয় এবং যেস্থলে স্বার্থের বিপর্য্যয় উপস্থিত, সে স্থলে গাভীটী হত হয়। দেখ, পাষণ্ড মুসলমান যে গাভীর দুগ্ধ পান করে বা যে বৃষ দ্বারা ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য করায়, সেই গাভী বা বৃষ বৃদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে, উহাকে সংহার করতঃ পাঁচজনে মিলিত হইয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা কৃতজ্ঞ হিন্দু সেরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ কদাচ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। অতএব হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে গাভী পূজা করিতে শিখাইয়া কি উদার, মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব প্রদর্শন করে? এস্থলে ভাবপ্রধান ধর্ম্মাত্মা হিন্দু সামান্য স্বার্থকে ধর্ম্মের নিঃস্বার্থে পরিণত করেন; তিনি গোপালনরূপ সমাজের একটা সামান্য কর্ত্তব্যকে ধর্ম্মের মহাপুণ্য করেন এবং গোহত্যারূপ সমাজের অমঙ্গলকে তিনি মহাপাতক করেন। কি পরিতাপের বিষয়! কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা আজকাল শিক্ষাদোষে স্বধর্ম্মের এ সকল মহোচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না এবং সকলই কুসংস্কার ভ্রমে উড়াইয়া দিই। কোথায় হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন! আমাদের কবে সুশিক্ষা হইবে?

বৈদিক সময়ে আর্য্যসমাজে গোমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ায় সমাজের বিশেষ অমঙ্গল সাধিত; তজ্জন্য গোবংশের উন্নতি দ্বারা হিন্দুসমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য উত্তরকালে গাভীপূজা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত এবং সেই সঙ্গে

গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া সকল শাস্ত্রে উপদিষ্ট। গাভীপূজা যে সময়েই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, ইহা দ্বারা হিন্দুসমাজের যে কত মঙ্গল সাধিত, তাহা একমুখে বর্ণন করা যায় না। ইহারই গুণে চিরদিন হিন্দুসমাজে অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ ও ঘৃত উৎপন্ন এবং বিবিধ যাগযজ্ঞে-অপর্য্যাপ্ত ঘৃত অগ্নিতে আহুত। ইহারই গুণে ভারতবাসী পূর্ব্বে ভীমপরাক্রমশালী ও বলবীর্য্যদৃপ্ত। ইহারই গুণে তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ও ধর্ম্মভাব এতকাল এতদুর স্ফুরিত। ইহারই গুণে তিনি এতকাল অল্পব্যয়ে ঘৃতপক্ক অন্নাদি ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করতঃ স্বাস্থ্যসুখে সুখী ও দীর্ঘজীবী। যথার্থ বলিতে কি, এক গোবংশের উন্নতি দ্বারাই কৃষি-প্রধান ভারতভূমি চিরদিন ধনধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ও সভ্যতা-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এক গোবংশের উন্নতিই অনন্তরত্নপ্রভবা ভারত-মাতার সকল ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত কারণ। ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে চিরদিন গাভী পূজা করিতে বলে। কিন্তু হায়! ইহাই এ ধর্ম্মের এখন অপরাধ! ইহাই এ ধর্ম্মের এখন কুসংস্কার!

এখন একবার ভাব দেখি, গোহত্যা করা মহাপাপ শাস্ত্রের এই আদেশের ভিতর সমাজধর্ম্মের কি জলন্ত সত্য নিহিত? যে হিন্দুধর্ম্ম ছাগগুলিকে দেবতার সম্মুখে বলিদান দিয়া ভোজন করিতে বলে, সেই ধর্ম্ম গোহত্যায় মহাপাতক নির্দ্দেশ করে। এরূপ নির্দ্দেশ করিবার প্রকৃত কারণ কি? যে ছাগ দ্বারা সমাজের কিছুমাত্র উপকার নাই, যাহার কোমল পুষ্টিকর মাংস ভোজন করিলে শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হয়, সে ছাগগুলিকে দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া ভোজন কর, ইহাতে কোনরূপ পাপ নাই। কিন্তু যে গোবংশ কৃষিপ্রধান ভারতভূমিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সবিশেষ আবশ্যক, যাহার গব্য-রসে ও গব্য-ঘৃতে সকলেই লালিত ও পালিত, উহাদের হত্যা সমগ্র সমাজের কতদুর অপকারক! যে বৃক্ষশাখায় তুমি উপবিষ্ট, কুঠার দ্বারা সে শাখা ছেদন করা যেরূপ, গোহত্যা করাও তদনুরূপ। যে কুক্কুটী স্বর্ণ-অণ্ড প্রসব করে, তাহার উদর ছেদন করিয়া অণ্ড বাহির করা যেরূপ, গোহত্যা করাও তদনুরূপ। ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্ম গোহত্যায় মহাপাতক নির্দ্দেশ করে।

এইরূপে সমাজের মহোপকারী বিষয়গুলি মহাপুণ্য ও ইহার অনিষ্টকারী

বিষয়গুলি মহাপাপ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় সাধারণ লোকে কত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আগ্রহের সহিত ঐ সকল পালন করিতে প্রোৎসাহিত এবং তদ্দ্বারা সমাজেরও কত মঙ্গল সাধিত! যদি শাস্ত্রকারেরা গোজাতির মহোপকারিতা দর্শনে উপদেশ দিতেন, যে ইহাদের উন্নতির জন্য ইহাদের বিধিমতে সেবা ও শুশ্রূষা করা উচিত ও ইহাদের নিধন সর্ব্বতোভাবে অনুচিত, সমাজের কয়জন ব্যক্তি তদনুসারে ইহাদের প্রকৃতরূপ সেবা ও শুশ্রূষা করিত এবং গোহত্যা করিত না? কিন্তু আজ হিন্দুধর্ম্মের গুণে গোপালনে মহাপুণ্য ও গোহত্যায় মহাপাতক হওয়ায়, আমরা কিরূপ ধর্ম্মভাবে গোজাতির সেবা করি ও গোহত্যায় কিরূপ সঙ্কুচিত হই! এস্থলে ধর্ম্ম গোহত্যায় মহাপাতক নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে উহাকে চিরাঙ্কিত করে এবং স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশে আমরা যেরূপ উত্তেজিত হই, গোহত্যা দর্শনেও আমরা সেইরূপ স্বতঃ উত্তেজিত হই।

আজকাল সমাজের কোন কোন অকালকুষ্মাণ্ড অম্লানবদনে উইল্‌সন্ হোটেলে গিয়া গোমাংস ভক্ষণ করতঃ আপনাকে সপ্তপুরুষের উদ্ধারকর্ত্তাজ্ঞানে বাহ্বাস্ফোট করেন। কিন্তু বল দেখি, যদি একজন হিন্দু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ গোহত্যা করিয়া ফেলেন, তাঁহার মনে কত আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়! তাঁহার কতদূর মানসিক কষ্ট হয়! গোহত্যার কথা ছাড়িয়া দেও, ঐ পাপকথা মুখে আনিও না; গোহত্যা দর্শন করিলেও আমাদের মহাপাপ এবং যেস্থলে গোহত্যা হয়, সেস্থল আমাদের নয়নে মহা অপবিত্র, সেস্থল নরক অপেক্ষাও ভীষণতর! ওহে ন্যায়বিচারী ইংরাজ রাজপুরুষগণ! যে সকল ধর্ম্মাত্মা হিন্দু গোহত্যা দর্শনে স্বতঃ উত্তেজিত হইয়া বিধর্ম্মীদিগের সহিত বিবাদবিসম্বাদে লিপ্ত হন ও রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করেন, তোমরা আজ সুশাসনের জন্য তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ কর বটে; কিন্তু তাহাতে কি তোমরা হিন্দুজাতির প্রাকৃতিক হৃদয়োদ্বেগ নিবারণ করিতে পার? মহানদী বালির বাঁধে বাঁধা যায়, দুই দশজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া জাতীয় হৃদয়োদ্বেগ রোধ করা যায় না। তোমাদের নিকট হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ন্যায়বিচারপ্রার্থী এবং শুনিতে পাই, তোমরা জাতিনির্ব্বিশেষে রাজ্যশাসন কর এবং সকলকে সমচক্ষে দর্শন কর, কিন্তু ঘটনাচক্রে তোমাদের দোষে হিন্দুজাতি এ বিষয়ে অধিক

প্রপীড়িত। দেশীয় করদ ও মিত্র রাজ্যে গোহত্যা লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর কখনও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় না।

যে গাভিজাতি দ্বারা হিন্দুসমাজ এতদূর উপকৃত, সে গাভিজাতি রক্ষা করিয়া উহাদের উন্নতিসাধন করা আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জাতিধর্ম্ম রক্ষা করার ন্যায় গোধন রক্ষা করাও হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে নরাধম কসাইহস্তে গোধন সমর্পণ করে ও পরোক্ষভাবে উহার হত্যায় সাহায্য করে, তাহার ন্যায় মহাপাপী আর কে? এ মহাপাপে তাহার কি বংশ নাশ হয় না? এ মহাপাপে তাহার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় না? এ মহাপাপে সে পাপিষ্ঠ কি পরলোকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয় না?

হিন্দুরাজত্বকালে এ বিষয়ে ভারতের কি সুসময় অতীত! যে ঘৃত আজ এত মহার্ঘ, সেই ঘৃত তৎকালে মনপরিমাণে যজ্ঞাদিতে আহুত। ইহাতেই বুঝা যায়, আমাদের পুণ্যতম প্রপিতামহগণ কিরূপ মনঃসুখে গব্য-রস ও গব্য-ঘৃত পান করিতেন! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই সোণার ভারত আজ কিরূপ ছারখার! যে ভারতে জলের ন্যায় দুগ্ধের মূল্য ছিল না, সে ভারতে আজ পাঁচ সের দুগ্ধের মূল্য এক টাকা! হা হত বিধে! এ কিরূপ পরিবর্ত্তন! যে জাতি এতকাল পরাধীন, সে জাতির জাতীয় অধঃপতন এতদূরই কি সম্ভব!

বিগত সপ্তশতাব্দী ভারতভূমি বিজাতীয় বিধর্ম্মীদিগের অধীনস্থ হওয়ায় উহারা অপরিমেয় গোহত্যা করে এবং মনঃসুখে গোমাংস ভক্ষণ করিয়া উদর-পূরণ করে। মুসলমানরাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুস্থানে কত কোটী কোটী গোহত্যা সম্পাদিত, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? এখন যে আমরা ইচ্ছামত মনঃসুখে দুগ্ধপান ও ঘৃতভক্ষণ করিতে পাই না এবং ঘৃত ও দুগ্ধ যে এত মহার্ঘ, ইহার একমাত্র কারণ গোখাদক ম্লেচ্ছজাতি কর্ত্তৃক অপরিমেয় গোহত্যা। এই অপরিমেয় গোহত্যা বশতঃ গোবংশ আজ নির্ম্মূল-প্রায় এবং আমরাও দুগ্ধাভাবে ও ঘৃতাভাবে ক্ষীণবীর্য্য ও অল্পায়ু। এখনও এক টাকায় ছয় সের জলমিশ্রিত দুগ্ধ খরিদ করিয়া পান কর। স্মরণ রাখিও, কিছুকাল পরে এক টাকায় এক সের দুগ্ধ খরিদ করিতে হইবে। তখনই সকলে মনঃসুখে সন্তানাদির লালনপালন করিবেন ও দীর্ঘজীবন ভোগ করিবেন। তবে কেন তোমরা আজ গোবংশের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত হও না?

এখন একবার ভাব দেখি, গোখাদক ম্লেচ্ছজাতি কর্ত্তৃক অপরিমেয় গোহত্যা সংঘটিত হওয়ায়, ভারতের ভবিষ্যৎ কিরূপ ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন! যখন অর্থাভাবে, দুগ্ধাভাবে ভারতের দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানগণ ভালরূপ লালিত ও পালিত হইবে না, যখন উহারা জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে, তখন ভারতের অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইবে? যে গোধন রক্ষা করিবার জন্য, যে গোবংশের উন্নতিসাধনের জন্য হিন্দুধর্ম্ম এতকাল নানা সুব্যবস্থা ও নানা ক্রিয়াযোগ উপদেশ দেয়, তখন সে গোবংশ জাহান্নমে যাইবে এবং সেই সঙ্গে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম জগতে লুপ্ত হইবে। তবে কেন তোমরা আর্জ গোবংশের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত হও না?

আর কোথায় হে আমাদের দুঃখিনি ভারতমাতঃ! আজ তোমার সন্তানগণ দুগ্ধাভাবে জীর্ণ, শীর্ণ, নির্বীর্য্য, ও অল্পায়ু। যেমন তুমি তাহাদের দুঃখদর্শনে আজ নীরবে রোদন কর, আমরাও সেইরূপ নীরবে রোদন করি ও বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমার কৃতীপুত্রেরা আজ মোহান্ধ। তাঁহারা জাতীয় সমিতিতে গগনভেদিরবে রাজনৈতিক আন্দোলন করেন; কিন্তু তাঁহারা তোমার দুঃখে ভালরূপ সাহানুভূতি করেন না ও গোজাতির সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবেন না। তাঁহারা এখন সমাজে পাশ্চাত্যবিদ্যা বিস্তৃতির জন্য মহাব্যগ্র ও রাজজাতির সহিত সমান অধিকার পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যাহাতে ভারতবাসী দুগ্ধ ও ঘৃত অধিক পরিমাণে পান করিয়া বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা এখন মোহনিদ্রায় নিদ্রিত। কোথায় হে ভগবন্! কবে তুমি তাঁহাদিগকে সুমতি দান করিবে!

আজকাল যে সকল ইউরোপীয় সৈন্যদল ভারতসাম্রাজ্যসংরক্ষণে নিযুক্ত, তাঁহাদের উদরপূরণের জন্য প্রত্যহ কি পরিমাণে গোহত্যা সংঘটিত, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই অপরিমেয় গোহত্যাবশতঃ হিন্দুসমাজের যে প্রভূত অপকার সাধিত, তজ্জন্য ইংরেজরাজকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। এস্থলে যত দোষ আমাদেরই। আমরা কেন সামান্য অর্থলোভে গোধনগুলি কসাই হস্তে বিক্রয় করি? সমগ্র হিন্দুজাতি যদি আদৌ গোধন বিক্রয় না করে, দুরাচার কসাইগণ কোথায় গরু পায়? এস্থলে গোপবংশীয় কুলা-

জায়েরাই আমাদের সকল সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ। এই নরাধমেরা নানা-স্থলে গাভী খরিদ করিয়া কসাইহস্তে বিক্রয় করে এবং ফুকো দিয়া গরুর দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে বাহির করিয়া লয় ও গরুগুলির সর্ব্বনাশ করে। রে দুরাচার দুর্বৃত্ত গোপগণ! তোমাদের কি পরকালের কিছুমাত্র ভয় নাই? তোমরা কি হিন্দুধর্ম্মের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ত্রীপুত্রে চিরসুখী হইবে? তোমরা কি সামান্য অর্থলোভের খাতিরে সমগ্র হিন্দুসমাজের মনে কষ্ট দিয়া ধনপুত্রে লক্ষ্মী-লাভ করিবে? যে গোধনগুলি কসাইহস্তে বিক্রয় করিয়া তোমরা উহাদের প্রাণ সংহার করাও, সে সকল গোধন যথাবিধি পালন করিলে উহাদের দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা তোমাদের কি জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না? স্মরণ রাখিও, তোমাদেরই এই মহাপাপে তোমাদের ভবিষ্যবংশধরেরা দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। তোমাদের এই মহাপাপের দরুণ ভারতমাতা তোমা-দিগকে সহস্র অভিসম্পাত দিতেছে, তাহাতেই তোমরা কালে নির্ব্বংশ হইবে।

ওহে প্রজাবৎসল ইংরাজরাজ! তোমরা প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে কিরূপ যত্নবান! প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করাই কি রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য? তোমরা বিধর্ম্মী বটে, তথাচ রাজনীতির খাতিরে প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করা কি তোমাদের উচিত নয়? তোমরা ত ভালরূপ জান, যে হিন্দুধর্ম্মকে মুসলমান-ধর্ম্ম পঞ্চশতাব্দীতে পরাজয় করিতে পারে নাই, সে ধর্ম্মকে তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম্মও কস্মিনকালে পরাজয় করিতে পারিবে না। তবে কেন তোমরা রাজনীতির খাতিরে প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উহাদের প্রীতিভাজন হও না? হিন্দুর ন্যায় রাজভক্ত ও শান্তিপ্রিয় প্রজা জগতে দেখিতে পাইবে না। তবে কেন তোমরা গোহত্যা করিয়া সেই প্রজার মনে এত কষ্ট দেও? পাশববলে বহির্জগৎ জয় করা যায়, মনোজগৎ জয় করা যায় না। তবে কেন তোমরা প্রজার জাতিধর্ম্ম ও গোব্রাহ্মণ রক্ষা করিয়া উহাদের আরও ভক্তিভাজন ও প্রীতিভাজন হও না? প্রজার মনে কষ্ট না দিবার জন্য তোমরা নিভৃতে ও নির্জনে গোহত্যা কর বটে, কিন্তু তাহাতেই কি সেই প্রজা মনে কষ্ট পায় না? তোমরা মনে করিলেই গোহত্যা না করিয়া মেষ-ছাগাদির মাংসে সৈন্যদলের উদর পূরণ করিতে পার; তবে কেন তোমরা অপরিমের গোহত্যা করিয়া রাজভক্ত প্রজার মনে এত কষ্ট দেও? দেখ,

তোমাদের গোহত্যা দর্শনে দুঃখিনী ভারতমাতা আজ মর্ম্মাহত হইয়া নীরবে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে সকলই দেখিতেছেন এবং যতদিন তাঁহার এমন দুর্দ্দিন যাইবে, ততদিন তিনি সকলই সহ্য করিবেন ; কিন্তু তিনি মনে মনে তোমাদিগকে অভিসম্পাত দিতেছেন। যদি প্রজারঞ্জন রাজধর্ম্ম হয়, প্রজার মনে আর অধিক কষ্ট দেওয়া উচিত নয় ; আর যদি অধিক কষ্ট দিতে থাক, ঈশ্বর সন্নিধানে তোমরা অপরাধী হইবে এবং কালে তাঁহারই নিকট তোমরা শাস্তি পাইবে।

কোথায় হে ধর্ম্মাত্মা ভারতবাসিগণ ! তোমরা আজ ঘোর বিপদে পতিত। যিনি তোমাদের রক্ষক, তিনিই এখন ভক্ষক। গোধন রক্ষা এখন তোমাদের মহাদায়। এ মহাবিপদে গোধন রক্ষা করিবার জন্য তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা কর এবং করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। এতকাল গোহত্যার বিষময় ফল তোমরা উপলব্ধি করিতে পার নাই এবং তোমাদের ঔদাস্য বশতঃ ভারতের অসংখ্য গোধন প্রণষ্ট। এখন তোমরা সকলে জাগ্রত হইয়া গোধনসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত হও, ঈশ্বর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। এখনও গোবংশ ধ্বংস হয় নাই ; এখনও ভালরূপ চেষ্টা করিলে গোবংশের উন্নতিসাধন করিতে পার। তবে এখন হইতেই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও যত্নবান হও।

কোথায় হে সহৃদয় পাঠকগণ ! কলিকাতা মহানগরীর মহাবর্ত্ম দিয়া দুরাচার কসাইগণ যখন গাভী ও গোবৎসগুলি নিধনার্থ লইয়া যায়, তখন কি তোমাদের মনপ্রাণ কাঁদিয়া উঠে না ? সে দৃশ্যদর্শনে তোমাদের পাষাণহৃদয় কি বিগলিত হয় না ? তৎকালে কি তোমাদের অশ্রুজল গণ্ডস্থল দিয়া প্রবাহিত হয় না ? বোধ হয়, তোমরা সকলে সে সময়ে অভ্যাসবশতঃ হৃদয়োদ্বেগ নিবারণ করতঃ অপর দিকে দৃষ্টিপাত কর। সে সময় যে মহাত্মা কসাইহস্তে রজতমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক গোধন উদ্ধার করেন, তিনি অক্ষয় স্বর্গবাস লাভ করেন। ভারতমাতাই সে সময় তাঁহাকে সহস্র আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার গৃহ সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ করেন।

কোথায় হে মাড়ওয়ারবাসী ধর্ম্মাত্মা বণিকসম্প্রদায় ! তোমরা গোজাতির উন্নতিমানসে, উহাদের উদ্ধারমানসে স্থানে স্থানে যে গোরক্ষিণী সভা ও পিঁজরাপোল স্থাপিত করিয়াছ, তাহাতে তোমরা আজ সমগ্রহিন্দুসমাজের

ধন্যবাদার্হ ও অনুকরণীয়। ধন্য তোমাদের উদ্যম! ধন্য তোমাদের অর্থব্যয়! যে অবলাজাতিকে তোমরা রক্ষা ও পালন কর, উহারাই তোমাদিগকে সহস্র আশীর্ব্বাদ প্রদান করে এবং তাহাতেই তোমাদের অক্ষয়পুণ্যলাভ। ভারতের রাজন্যবর্গ ও জমীদারকুল এখন অন্ধকার হইতে আলোক প্রাপ্ত; তাঁহারা এমন মূর্খ লোকদিগের সভায় যোগদান করেন না। তাঁহারা এখন প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শ্রুতিমনোহর উপাধি প্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। হে ভগবন্! কবে তাঁহাদেরও সুমতি হইবে এবং তাঁহারাও জাতিধর্ম্ম ও গোব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন?

আদ্যশ্রাদ্ধে বহুব্যয়সাপেক্ষ বৃষোৎসর্গব্যাপার অনুষ্ঠিত। ইহারও উদ্দেশ্য সুমহৎ। গোবংশের উন্নতিসাধন করিয়া সমাজের মঙ্গলসাধন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। যে স্থলে অন্যান্য ধর্ম্ম পিতার মৃত্যুকালে তাঁহাদের স্মরণার্থ সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণ সমাজের কোনরূপ বিশেষ মঙ্গলসাধন করে না, সেস্থলে অপকৃষ্ট হিন্দুধর্ম্ম পিতৃমাতৃঋণ পরিশোধের জন্য কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করে, যাহাতে পরোক্ষভাবে সমাজেরই প্রভূত মঙ্গল সাধিত। শ্রাদ্ধে একটা বৃষকে জলন্তলৌহশলাকায় চিহ্নিত করিয়া উন্মুক্ত করা হয়; ধর্ম্মের ষাঁড় গ্রামস্থ সকল কৃষকের ক্ষেত্রে অবাধে চরিতে পায়; তাহাতে উহা বিশেষ হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া গ্রামস্থ যাবতীয় গাভীর গর্ভাধান করে এবং তাহাতে হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস উৎপাদন করিয়া গোবংশের অশেষ উন্নতিসাধন করে। একবার ভাব দেখি, কিরূপ কার্য্য হইতে সমাজের কিরূপ মঙ্গল সাধিত! কি দুঃখের বিষয়, আজ কাল এই সকল ধর্ম্মের ষাঁড়গুলিকে মিউনিসিপ্যালিটীর আবর্জ্জনী-শকট বহনে নিযুক্ত করা হয় এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের মস্তকেও পদাঘাত করা হয়। কমিশনারগণের অজ্ঞতাই ইহার কারণ।

এইরূপ হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক কর্ম্মের কোন না কোন গূঢ় উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। সে সকল গূঢ় উদ্দেশ্য সহজে বুঝা যায় না সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজ, শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি ও মঙ্গল অনায়াসে ও অতি পরিপাটির সহিত সম্পাদিত। মানবমনের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে কর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্য যতই না জানা যায়, ততই মানবের মঙ্গল। উদ্দেশ্য ও ফলাফল জ[illegible], মনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রসম্বন্ধে সংশয় ও সন্দেহ অতীব অনিষ্টকর। শাস্ত্রের আদেশ,

তুমি এই কার্য্য সম্পাদন কর, ইহাতে তোমার শ্রেয়োলাভ ও পুণ্যলাভ। তোমাকেও অন্ধবিশ্বাসের সহিত সেই কার্য্যের ফলাফল বিচার না করিয়া তাহা পালন করা উচিত। চিকিৎসক মহাশয় যেরূপ ঔষধ দেন না কেন, তোমায় অম্লানবদনে, সাগ্রহে, স্বেচ্ছায় ও অন্ধবিশ্বাসের সহিত তাহা পান করা উচিত। এতদূর বিশ্বাস না থাকে, তাঁহার ঔষধও তাদৃশ কার্য্যকর হয় না।

যাহা লোকের মঙ্গলদায়ক, তাহা ধর্ম্মভাবে, নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করায়, সমাজের যে কত মঙ্গল, তাহা বর্ণনাতীত। ইহারই জন্য শাস্ত্রকারেরা সকল কর্ম্মে ধর্ম্মের অনুশাসন দেন, অর্থাৎ এই কর্ম্ম মহাপুণ্য, এই কর্ম্ম মহাপাতক, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহারা সমাজের অশেষ মঙ্গলসাধন করেন। যদি তাঁহারা ঐ সকল কর্ম্মের ফলাফল ও গুণাগুণ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন, লোকে কদাচ এত অন্ধবিশ্বাস ও এত ভক্তির সহিত ঐ সকল পালন করে না এবং যে সকল কার্য্য বহুব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য, তাহারা উহাদিগকে প্রথমেই ত্যাগ করিয়া বসে। ইহাতেই শাস্ত্রকারদিগের অগাধ বুদ্ধি প্রকাশিত। জনসাধারণকে সৎপথে চালিত করিয়া সমাজের মঙ্গলসাধনার্থ তাঁহারা এরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করেন। কোথায় হে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ! ধন্য তোমাদের সমাজতত্ত্ব-জ্ঞান! ধন্য তোমাদের সদুপদেশ! আর আমাদের বিদ্যাশিক্ষায় ধিক্! আমরা কিনা দুই পৃষ্ঠা ইংরাজি পাঠ করিয়া ঐ সকল অমূল্যরত্ন পদে দলন করি!

নদ্যুপাসনা।

হিন্দুর নিকট পুণ্যতোয়া গঙ্গামাতা চিরদিন পূজ্য এবং মাতঃ গঙ্গে! এই নামে তাঁহার ভক্তিরস শত সহস্র ধারে বিগলিত। গঙ্গামাতা চিরদিন তাঁহার পতিতপাবনী ও অধমতারিণী। যে নদী পবিত্র শ্বেতাম্বুরাশি লইয়া দেশদেশান্তর প্রবাহিত, যাহার নির্ম্মল পুণ্যসলিলে অবগাহন করিলে, মন যেমন আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত, শরীরও তেমনি নানারোগ হইতে মুক্ত, তদ্দর্শনে কাহার না হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত ও কাহার না ঈশ্বরভক্তি শতধারে বিগলিত? শাস্ত্রে গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য ও মহিমা যত অধিক বর্ণিত, ধর্ম্মাত্মা হিন্দু ইহার পুণ্যসলি-লের অবগাহনে ততই প্রোৎসাহিত ও তিনি ততই আনন্দরসে অভিষিক্ত।

নদনদী পূজনে অন্যান্য জাতি আমাদিগকে জড়োপাসক মনে করে। বস্তুতঃ কি নদনদী পূজা করিয়া আমরা অসভ্য বর্ব্বরজাতির ন্যায় জড়োপাসনা করি? আমাদের গঙ্গামায়ীর পূজন কি সেই পুরাকালীন জড়োপাসনার ভগ্নাবশেষ? হায় উহাদের কি বুদ্ধিভ্রংশ! উহাদের মুখে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কি লাঞ্ছনা! যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু বিশ্বকে পরব্রহ্মের বিরাটরূপ ভাবেন, যিনি অনন্য ভক্তির সহিত বিশ্বের সর্ব্বস্থলে ও সর্ব্বপদার্থে একমাত্র পরব্রহ্ম অন্বেষণ করেন, যেস্থলে তিনি কিছু অলৌকিক দর্শন করেন, সেই স্থলেই তিনি ব্রহ্মরূপ কল্পনা করিয়া উহার নিকট ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করেন। এজন্য যে সকল নদনদী প্রভৃত জলরাশি লইয়া ভারতের মধ্যে মধ্যে প্রবাহিত, যাহাদের শ্বেতাম্বু বা নিলাম্বু দর্শনে তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত, যাহাদের নির্ম্মল পবিত্র সলিলে অবগাহন করিলে, তাঁহার শরীর, মন ও জীবাত্মা সর্ব্বতোভাবে পূত ও পবিত্রীকৃত, সে সকল নদনদী কেন না তাঁহার নিকট পূজ্য হইবে? হিন্দুধর্ম্মও ঐ সকল নদনদীর মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিয়া উহাদিগকে পরব্রহ্মের রূপ জ্ঞান করিতে আমাদিগকে শিখায়। আমরাও মাতঃ গঙ্গে! মাতঃ যমুনে! মাতঃ নর্ম্মদে! বলিতে বলিতে অপার ব্রহ্মানন্দে উৎফুল্ল ও ভক্তিরসে আপ্লুত হই এবং উহাদের পবিত্র পুণ্য-সলিলে অবগাহন করিলে, অশেষ পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভ মনে করি। এস্থলে আমাদের মনের বিশ্বাস যতদূর দৃঢ়, আমাদের ভক্তিও ততদূর প্রগাঢ় এবং এই সাধন দ্বারা জীবাত্মাও ততদূর উপকৃত।

নব্যসম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, ভারতবর্ষে যে সকল নদনদী বহমান, উহাদের গুণে ভারত চিরদিন সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ! উহাদের নিকট আমরা পূর্ব্ব জাতীয় গৌরবের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। উহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ উহারা আমাদের নিকট পূজ্য। দেখ, এক গঙ্গানদী দ্বারা আমরা কিরূপ উপকৃত! এই মহানদীই পুরাকালে আমাদিগকে সভ্যতা সোপানে আরোহণ করায়। যে সকল প্রদেশের মধ্য দিয়া ইহা সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত, সে সকল প্রদেশ চিরকালই ধনধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। চিরকালই ইহার উভয়পার্শ্বে সৌধমালাসুশোভিত সমৃদ্ধ মহানগরী বিরাজমান। বৎসরে বৎসরে এই মহানদী অনন্তরত্নপ্রভব হিমাদ্রির অধিত্যকা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ক্ষারসমূহ প্রধৌত করিয়া উহাদিগকে পার্শ্বস্থ

ভূখণ্ডে পলিরূপে প্রক্ষেপ করতঃ অপর্য্যাপ্ত শস্যোৎপাদন করে এবং নিজ বক্ষঃ-স্থল দিয়া ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যরাশি জলযানযোগে সমৃদ্ধ বন্দরে লইয়া যায়। এই প্রকারে গঙ্গানদী আমাদের অতুল সুখৈশ্বর্য্যের কারণ; তজ্জন্য আমরাও উহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। উহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য উহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে এত অধিক বর্ণিত।

তাঁহাদের মুখে আরও শুনিতে পাই, স্রোতের জলে স্নান শরীরের স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলকারক ও রোগনাশক। এজন্য স্রোতস্বতী নদনদীর নির্ম্মল সলিলাবগাহনে জনসাধারণকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য উহাদের এত মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত এবং অবগাহনেও এত পুণ্যলাভ শাস্ত্রে উপদিষ্ট।

নব্যসম্প্রদায়ের কথা সর্ব্বৈব সত্য, এমন কি ইহা সর্ব্বতোভাবে অখণ্ডনীয়; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর নিকট ইহা পাপকথা। যে বিশ্বাস হিন্দুসমাজে বহুদিন হইতে বদ্ধমূল, যদ্দ্বারা ইহা সুখের পথে, ধর্ম্মের পথে অধিক অগ্রসর, যে কথায় সমাজের সেই চিরন্তন বিশ্বাস মন্দীভূত হয়, সে কথা কি পাপকথা নয়? তাহাতে কি সমাজের প্রভূত অমঙ্গল হয় না? দেখ, ধর্ম্মাত্মা হিন্দু এতকাল পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভের জন্য গঙ্গা স্নান করেন এবং ধর্ম্মভাবে ও ভক্তিভাবে এ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তিনি ইহার শারীরিক,মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উপকার পূর্ণাংশে ভোগ করেন। এখন যদি তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া যায়, গঙ্গা স্নান দ্বারা যে পুণ্যলাভ ও পাপক্ষয় হয়, তাহা কেবল ধর্ম্মের বুজরুকি ও কুসংস্কার, ইহা দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয় মাত্র, তিনি কি আর সামান্য স্বাস্থ্যের খাতিরে গঙ্গাস্নান করিতে ততদূর ব্যগ্র হন, বা গঙ্গা স্নান করিয়া ততদূর আনন্দনীরে অভিষিক্ত হন? তবে নব্যসম্প্রদায়ের যে কথায় হিন্দু-সমাজের এত অমঙ্গল, তাহা কি পাপকথা নয়? যে সংস্কারবশতঃ আজ নব্যসম্প্রদায় স্বয়ং গঙ্গাস্নানে বীতশ্রদ্ধ, তাহা কি সমাজে প্রচার করা কর্ত্তব্য?

এখন জিজ্ঞাস্য, যে গঙ্গামাতা আমাদিগকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় অপার স্নেহের সহিত প্রতিপালন করেন এবং যিনি আমাদের অতুল বিভব ও সম্পদ আনয়ন করেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই কি তিনি আমাদের পূজ্য ও পতিতপাবনী? যে গঙ্গামাতার পবিত্র উদক কীটাণুরহিত, যাঁহার পুণ্যসলিলে স্নান করিলে শরীরের অশেষ স্বাস্থ্যবর্দ্ধন ও রোগনাশ হয়, তিনি

কি এই সামান্য শারীরিক উপকারের জন্য আমাদের পূজ্য ও পতিতপাবনী? ধর্ম্মাত্মা হিন্দু কি ক্ষণবিধ্বংসি শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের জন্য গঙ্গা স্নান করেন?

এই নদ্যুপাসনার উদ্দেশ্য সুমহৎ। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের স্বর্গীয় ও মহোচ্চ-ভাব প্রদর্শিত। ইহাতে এ ধর্ম্ম মানবের একটা সামান্য স্বার্থকে ধর্ম্মের নিঃস্বার্থে পরিণত করে, স্বাস্থ্যবর্দ্ধনরূপ শরীরের সামান্য মঙ্গললাভকে ধর্ম্মের মহাপুণ্য করে এবং উহাকে জীবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়স্বরূপ করে। যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবগাহন শরীরের বলকারক ও স্বাস্থ্যকারক এবং পবিত্র-স্রোতে অবগাহন ততোধিক বলকারক ও স্বাস্থ্যকারক, সে দেশে যদি ধর্ম্ম স্রোতের জলে অবগাহনে সকলকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য উহাতে মহা-পুণ্য নির্দ্দেশ করে, তাহাতে ধর্ম্মের অপরাধ কি? যাহাতে শরীরের উপকার ও উন্নতি, তাহাতে যদি ধর্ম্ম মন ও জীবাত্মারও অশেষ উপকার ও উন্নতি নির্দ্দেশ করে, উহাতে ধর্ম্মের অপরাধ কি?

ধর্ম্মজগতের নিয়ম এই যে, যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস, তিনি বিশ্বাসানুযায়ী ফল-ভোগ করেন। যখন তোমার অন্তরের বিশ্বাস, পবিত্র গঙ্গোদকে স্নান করিলে অক্ষয়পুণ্য লাভ হয়, তখন তুমি গঙ্গোদকে স্নান করিয়া প্রকৃত আত্মপ্রসাদ লাভ কর। যাহাতে আত্মপ্রসাদলাভ, তাহাতেই পুণ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ এবং তাহাতেই জীবাত্মার অশেষ উন্নতি। ইহারই জন্য গঙ্গা স্নানে হিন্দুধর্ম্ম মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করে। ইহাই গঙ্গা স্নানের মুখ্য উদ্দেশ্য; তদ্ভিন্ন শরীরের মঙ্গললাভ ইহার গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। ধর্ম্মাত্মা হিন্দু শরীরের মঙ্গল লাভের দিকে লক্ষ্য করেন না; তিনি গঙ্গা স্নান দ্বারা জীবাত্মার উন্নতির প্রার্থী, ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য ও পুণ্য লাভের জন্য একান্ত ব্যগ্র। কিন্তু হায়! ইহাই আজকাল হিন্দু-ধর্ম্মের কুসংস্কার!

মৃতব্যক্তির চিতাভস্ম পবিত্র গঙ্গোদকে নিক্ষিপ্ত হইলে, ইহার প্রেতাত্মা পূত ও পবিত্র হয়। গঙ্গোদকে দেহত্যাগ করিতে পারিলে অক্ষয় স্বর্গবাস হয়, এ বিশ্বাস যেন চিরদিন আমাদের মনে বদ্ধমূল থাকে এবং মৃত্যুকালে আমরা যেন গঙ্গামাতার পবিত্র ক্রোড়দেশে মস্তক রাখিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি। ইহাই ধর্ম্মাত্মা হিন্দুর একমাত্র বাঞ্ছনীয়। কোথায় হে পতিতপাবনি মাতঃ

গঙ্গে! অন্তকালে আমাদের এই মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয় এবং তোমার পবিত্র ক্রোড়দেশে স্থান দিয়া অধমসন্তানদিগকে কৃপানয়নে দেখিও।

এখন গঙ্গোৎপত্তি বিষয়ে যে পুরাণকাহিনী শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহার কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। ইক্ষাকুবংশীয় সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার ষষ্ঠীসহস্রপুত্র অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত। পাতালে কপিলমুনির নিকট অশ্ব নিবদ্ধ শ্রবণ করিয়া, উঁহারা সাগর খনন করতঃ পাতালে প্রবেশ করেন এবং তথায় কপিলদেব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হন। তৎপরে তদীয় বংশে মহাত্মা ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোর তপস্যাবলে সুরধনীকে সন্তুষ্ট করতঃ তাঁহাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করেন। এই প্রকারে গঙ্গামাতা পতিত মানবের উদ্ধারের জন্য মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ।

এখন জিজ্ঞাস্য, গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য ও পতিতপাবনী-শক্তি সপ্রমাণ করিবার জন্যই কি শাস্ত্রকারেরা উপরোক্ত অলীক উপকথা কল্পনা করেন? না ঐ উপাখ্যানের ভিতর কোনরূপ বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত? সত্য, সত্যই কি মহারাজ ভগীরথ গঙ্গানদীকে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবাহিত করান? তবে গঙ্গোপাখ্যানের কিরূপ অর্থ করা কর্ত্তব্য? কৃতবিদ্য মাত্রেই জানেন, বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর ও ভারতমহাসাগর হইতে যে প্রভূত বাষ্পরাশি উত্থিত, তাহা মেঘাকারে পরিণত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিতে বর্ষণ করে এবং অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিতে না পারিয়া ইহার অধিত্যকা প্রদেশে উহা প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করে। আবার তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রির শৃঙ্গস্থ বরফরাশি সূর্য্যোত্তাপে বিগলিত হইয়া ইহার অধিত্যকা প্রদেশে পতিত। এ সকল জলরাশি উচ্চদেশে মন্দাকিনী, অলকনন্দা প্রভৃতি কয়েক স্রোতে প্রবাহিত হইয়া হরিদ্বারে আর্য্যাবর্ত্তের সমতলক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। তথায় ইহা বহুবিস্তৃত হইয়া গঙ্গানাম প্রাপ্ত এবং আর্য্যাবর্ত্তের নানাদেশ দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণদিকে প্রবাহিত ও পরিশেষে বঙ্গোপসাগরে পতিত। সকল দেশেই নদনদী প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত ও সাগরাদিতে পতিত। কোথাও লোকবিশেষ কর্ত্তৃক কোন নদী সৃষ্ট বা একস্থল হইতে অন্য স্থলে নীত হয় নাই। তবে গঙ্গোপাখ্যানের প্রকৃত রহস্য কি? যেমন আজকাল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে খাল

খনন করতঃ উহাতে নদীর জল প্রবাহিত করিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা করিয়া দেন! সেইরূপ কি পুরাকালে মহারাজ ভগীরথ কোন প্রদেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া গঙ্গার সাগরবাহিনী স্রোতকে একদিক হইতে অন্যদিকে লইয়া যান এবং তাহাতেই কি ভাগীরথী নদী উৎপন্ন?

গঙ্গা ত্রিপথগামিনী, শাস্ত্রের এ কথায় আমাদের বুঝা উচিত, হিমালয়ের উচ্চদেশ স্বর্গভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত মর্ত্ত্যভূমি এবং সুন্দরবন ও সাগরের নিম্নতল পাতাল। এই তিন স্থলেই গঙ্গা প্রবাহিত, অতএব ইহা ত্রিপথগামিনী। আর সগর রাজার ষষ্ঠী সহস্র পুত্র এবং উহাদের দ্বারা সাগর খনিত, এ অসম্ভব কথায় কি বিশ্বাস করা যায়? কেহ কেহ অনুমান করেন, "সাগর" এই নাম হইতে সগর রাজার কাহিনী এবং গঙ্গার "ভাগীরথী" নাম হইতে ভগীরথের কাহিনী হিন্দুশাস্ত্রে কল্পিত। কেহ কেহ বলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ ভগীরথ পুরাকালে গঙ্গার উপকূল পর্য্যন্ত কোশলরাজ্য বিস্তীর্ণ করতঃ নিজ নামানুসারে গঙ্গার নাম ভাগীরথী রাখেন এবং গঙ্গানদীর মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তদবধি হিন্দুসমাজে গঙ্গার মাহাত্ম্য ও গৌরব আর্য্যাবর্ত্তে স্থাপিত। হিন্দুর চক্ষে গঙ্গামাতার যে অসীম মাহাত্ম্য ও পতিতপাবনী শক্তি চিরদিন বর্ত্তমান, উহার সেই অপার মাহাত্ম্য ও গৌরব মহারাজ ভগীরথ আর্য্যাবর্ত্তে প্রথম স্থাপন করেন। তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা তাঁহার দ্বারাই গঙ্গাদেবীকে মর্ত্তে আনয়ন করান। ইহাই গঙ্গোপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

আরও দেখ, যে স্থলে সুসভ্য ইউরোপখণ্ডের সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্ম, যে সামান্য মানব জগতে একেশ্বরবাদ প্রচার করায়, পরের অত্যাচারবশতঃ ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া হত হন, তাঁহারই মাহাত্ম্যবর্দ্ধনার্থ মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করায় এবং সাধারণ মানবের পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা স্থির করে, সেস্থলে যদি অর্দ্ধসভ্য ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম নির্ম্মল পবিত্র গঙ্গোদকে স্নান করাইয়া স্বসেবকদিগকে নীরোগ করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের অশেষ পাতকনাশ করিবার জন্য, যে স্রোতস্বতী মহানদী দ্বারা ভারত চিরদিন অলৌকিকরূপে উপকৃত, সেই নদীর মাহাত্ম্যবর্দ্ধনার্থ সগর রাজার ষষ্ঠী সহস্র পুত্রগণকে যোগসিদ্ধ কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত করায় এবং পুণ্যাত্মা ভগীরথ দ্বারা গঙ্গামাতাকে মর্ত্তে আনয়ন করিয়া উহাদের

উদ্ধারসাধন করায় এবং আবহমানকাল সকলকে গঙ্গাস্নানে প্রোৎসাহিত করায়, তাহাতে শাস্ত্রকারদিগের কি অপরাধ বা ধর্ম্মের কি অপরাধ ?

যাহা হউক, গঙ্গোপাখ্যান সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, যখন ইহা শাস্ত্রের কথা, তখন অন্ধবিশ্বাসের সহিত আমাদের ইহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আর যিনি শাস্ত্রের কথায় অবিশ্বাস করিয়া গঙ্গাস্নান বৃথা মনে করেন, তিনি ম্লেচ্ছের ন্যায় সামান্য পুষ্করিণী বা কলের জলে স্নান করিয়া নিজদেহ পবিত্র করিবেন ও সুস্থ শরীরে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

ওহে সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়! যে গঙ্গাস্নান দ্বারা শরীর, মন ও জীবাত্মা অশেষরূপে উপকৃত, মনে কর, উহার পাতকনাশ একটা কথার কথা মাত্র, তথাচ যে গঙ্গাস্নান দ্বারা শরীরের অশেষ স্বাস্থ্যবর্দ্ধন হয়, তাহা কি ধর্ম্মের কুসংস্কার হইতে পারে ? শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধনও কি তোমাদের পরমলাভ নহে ? তবে কেন তোমরা এখন হইতে ইহাতে এত বীতশ্রদ্ধ ? যাও সকলে পবিত্র গঙ্গোদকে স্নান করিয়া দেহ, মন ও আত্মাকে পবিত্র কর, স্বাস্থ্যসুখে সুখী হও এবং দীর্ঘজীবন ভোগ কর। ধর্ম্মের আদেশ অবহেলা করিও না। কলিযুগে গঙ্গাস্নানই সকলের অশেষ পাতকনাশন। স্বধর্ম্মের এমন সহজ সাধনবিধি কদাচ কি পরিত্যাগ করা উচিত ?

আতিথ্যধর্ম্ম ও দানধর্ম্ম।

অতিথিসৎকার চিরদিনই হিন্দুধর্ম্মের একটী সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। যাবতীয় শাস্ত্রে এ ধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা ও ভূয়সী সুখ্যাতি দেখা যায়। ইহাতে যেরূপ মনের বিমল আত্মপ্রসাদলাভ, তেমনি ইহাতে জীবাত্মার অক্ষয়পুণ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।
উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।

হিতোপদেশ।

"অতিথি যাঁহার গৃহ হইতে ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করেন, তিনি সেই গৃহস্থকে নিজের দুষ্কৃত দান করিয়া ও তাঁহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করেন। যদি নীচ জাতীয় ব্যক্তি উত্তম জাতীয় গৃহস্থের গৃহে আগমন করে, তথাপি তাহার যথাবিধি অতিথিসৎকার করা কর্ত্তব্য; কারণ সকল দেবতা পূজনে যে ফল লাভ করা যায়, একমাত্র অতিথিসৎকারে সেই ফল পাওয়া যায়।" ধর্ম্মাত্মা হিন্দুকে অতিথিসৎকারে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য এমন সহস্র সহস্র শ্লোক শাস্ত্রে দেখা যায়। ইহারই গুণে হিন্দু চিরদিন অতিশয় আতিথেয় ও দানশীল। বল দেখি, যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু চিরদিন স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া এক গৃহে বাস করেন ও উহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করেন, তিনি এ সংসারে কত দানশীল! যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে, পুত্রকন্যার বিবাহোপলক্ষে ও তীর্থাদিস্থানে অকাতরে অর্থব্যয় করেন, তিনি এ সংসারে কত দানশীল! যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু জীবনের অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতিবর্গ ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া ফতুর, তিনি এ সংসারে কত দানশীল! যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই উহাকে ভোজন না করাইয়া তৃপ্ত হন না, তিনি এ সংসারে কত দানশীল!

দানধর্ম্ম, গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন ও ভক্তিযোগ, এই কয়েকটী কলিকালের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহারা সকলের পক্ষে সহজ ও সুগম। তোমার যেমন শক্তি ও সামর্থ্য, তুমি তেমনি অতিথিসৎকার কর ও দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ইহাতেই তোমার পুণ্যলাভ এবং ইহাতেই তোমার জীবাত্মার শ্রেয়োলাভ। সর্ব্বান্তঃকরণে পরোপকারব্রতে ব্রতী হও, যথাসাধ্য পরের দুঃখ বিমোচন কর, সৎপাত্রে অর্থদান কর, ভিক্ষুককে মুষ্টিমেয় অন্ন দান কর, ইহাই তোমার মহাপুণ্য; আর সামর্থ্য থাকে, অন্নছত্র ও সদাব্রত স্থাপন করিয়া সহস্র লোককে অকাতরে অন্ন বিতরণ কর ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া রুগ্নদিগকে অকাতরে ঔষধ বিতরণ কর, ইহা অপেক্ষা ধনবানের পক্ষে আর কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে? দরিদ্র ভিক্ষুককে অন্নদান, ব্রাহ্মণকে গোদান ও দক্ষিণাদান, রুগ্নকে ঔষধদান ও বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান, এই সকল দানই সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান।

যে পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকে কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন করে এবং

অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি সমাজের কিয়দংশ লোক গ্রাসাচ্ছাদনোপার্জ্জনে একেবারে অসমর্থ, সে পৃথিবীতে দানধর্ম্ম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ কি? সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহার অত্যাবশ্যকতা স্বীকার করে এবং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করে। এমন কি, এ ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত মানবসমাজ একরূপ অচল। সত্য বটে, কোন কোন অসভ্য সমাজে, অসভ্য মানব অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নগণকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে। এস্থলে প্রকৃতি স্বয়ং সমাজের সেই সকল অপোগণ্ডকদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য অসভ্য মানবকে প্রণোদিত করে। কিন্তু সভ্য মানবের নিকট এ জঘন্য ব্যবহার অতীব বীভৎস ও ঘৃণাকারজনক। তিনি দয়াধর্ম্ম প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাজের অপোগণ্ডকদিগকে চিরদিন প্রতিপালন করেন। দয়া মনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং দয়াপ্রকাশেই মানবের অপার আত্মপ্রসাদলাভ ও অক্ষয়পুণ্যলাভ। তাঁহার চতুর্দ্দিকে আপদ্ বিপদ্ এত ঘনীভূত, যে পরস্পর দয়াপ্রকাশ ব্যতীত সংসার একরূপ অচল। এজন্য পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম দয়াপ্রকাশকে, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া উপদেশ দেয়। তিনিও সকল দেশে বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করিতে, দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখ বিমোচন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত। এই যে সভ্যদেশের অনাথাশ্রম, চিকিৎসালয় ও অন্ধাশ্রম, যাহাতে সহস্র সহস্র দীনদরিদ্র ব্যক্তি প্রতিপালিত ও রোগমুক্ত, ইহারা কি? এই যে এদেশের ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, পুষ্করিণীদান, কূপদান ও মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদান, ইহারাই বা কি? কেবল মাত্র মানবের দয়া হইতে ইহারা উদ্ভূত। এই প্রকারে তিনি দয়াধর্ম্মে প্রণোদিত হইয়া নানা সদনুষ্ঠান দ্বারা স্বজাতিবর্গের দুঃখবিমোচনে সদা অনুরত। উপচিকীর্ষা তাঁহার মনে এত প্রবল, যে স্থলবিশেষে তিনি নিজ প্রাণকে বিপদাপন্ন করিয়াও পরের বিপদুদ্ধারে বা মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হন। কত কত পুণ্যাত্মা জলমগ্নকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন! কত কত বীরপুরুষ দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন! যাঁহারা দয়াধর্ম্মের সমক্ষে এইরূপে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁহাদের কি পুণ্যলাভ, কি সুকৃতিলাভ?

অন্যান্য ধর্ম্ম সমাজের খাতিরে, যশের খাতিরে সামাজিক মানবকে দয়াপ্রকাশে ও দানধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রণোদিত করে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কি অপার

মহিমা! যে কোন সদনুষ্ঠান সমাজের মঙ্গলদায়ক, তাহাতেই এ ধর্ম্ম মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে ধর্ম্মভাবে ও নিঃস্বার্থভাবে তৎসম্পাদনে প্রণোদিত করে। ইহার মতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় যেরূপ পুণ্য, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, কূপনির্ম্মাণ ও ঘাটনির্ম্মাণেও তদনুরূপ পুণ্য; ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণে ও সদাব্রত উদ্ঘাটনে যেরূপ পুণ্য, মুষ্টিমেয় ভিক্ষা দানেও তদনুরূপ পুণ্য। অন্যান্য ধর্ম্ম দয়াপ্রকাশ মানবের কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেয়। যাহা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা আমরা অনেক সময়ে অনিচ্ছার সহিত সম্পাদন করি। কিন্তু যাহাতে অশেষ পুণ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ, তাহাতে আমরা সকল সময়ে সাগ্রহে ও স্বেচ্ছায় স্বতঃ প্রবৃত্ত হই। ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্ম দানধর্ম্মানুষ্ঠানে এত পুণ্য নির্দ্দেশ করে। যে সদনুষ্ঠান দ্বারা মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহাতেই জীবাত্মার অশেষ পুণ্যলাভ। পরোপকাররূপ মহাব্রতে ব্রতী হইলে বা দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহা ত ক্ষণস্থায়ী ঐহিক ভাব মাত্র; কিন্তু সেই আত্মপ্রসাদ হইতে যে পুণ্যলাভ করা যায়, তাহাই জীবাত্মার চিরসহচর। শরীরনাশেও ইহার লয় নাই।

দানধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানবের অশেষ পুণ্যলাভ। যাঁহার যেরূপ অর্থবল, তিনি তদনুরূপ দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যলাভ করেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দান করাই সকলের কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতীত ইহাতে পুণ্যলাভ নাই। শ্রদ্ধার সহিত এক কপর্দ্দকদানে যে ফল, বিরক্তির সহিত সহস্র মুদ্রাদানেও সে ফল পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া যে তৃপ্তিলাভ করেন, দুর্য্যোধনের নিকট সুখাদ্য ভোজন করিয়াও সে তৃপ্তি পান নাই।

সুপাত্র দেখিয়া দান করাই আবশ্যক। অপাত্রে দান ঊষরক্ষেত্রে বীজ-বপনের ন্যায় নিষ্ফল। এখন দানের সুপাত্র কে? সকলেই জানেন অন্ধ, খঞ্জ ও পথের ভিখারী, যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনোর্জ্জনে অসমর্থ, তাহারাই দানের সুপাত্র এবং তাহাদিগকে দান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ।

হিতোপদেশ।

"হে কৌন্তেয়! দরিদ্র লোকদিগকে প্রতিপালন কর, ধনবানে কদাচিৎ ধন দান করিও না। যাহারা রোগগ্রস্ত, তাহাদেরই ঔষধের প্রয়োজন; নীরোগ শরীরে ঔষধের কি প্রয়োজন?"

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই দীনদরিদ্র লোকদিগকে প্রতিপালন করিতে উপদেশ দেয়। তবে কেন হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণভোজনে ও ব্রাহ্মণকে গোদান ও দক্ষিণাদানে মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করে? ইহা কি এ ধর্ম্মের পক্ষপাত নহে? ইহা কি ধর্ম্মের একটা কুসংস্কার নহে? যে ভণ্ড অধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজকে কতকগুলি কুসংস্কার শিক্ষা দেন, যিনি নিজের উদরপূরণ ও স্বার্থসিদ্ধি ভালরূপ জানেন, তিনি আমাদের দানের সুপাত্র? ছি! ছি! অধর্ম্ম আর কাহাকে বলে? যাঁহাকে দেখিলে আপাদমস্তক সর্ব্ব শরীর প্রজ্জ্বলিত হয়, তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিতে ও অর্থদান করিতে হইবে? রে হিন্দুধর্ম্ম! তোমার একি অবিচার! কেন তুমি এমন অধর্ম্ম শিক্ষা দেও? সুখের বিষয়, এখন আমরাও আর তোমার কথায় কর্ণপাত করি না।

ওহে সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়! এস্থলে হিন্দুধর্ম্মের অপরাধ কি? যেস্থলে রাজা দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য উহাদের মনে ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করেন, সে স্থলে যে পূজ্য ব্রাহ্মণজাতির অস্তিত্বের সহিত হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব অপরিহার্য্যরূপে জড়িত, যে ব্রাহ্মণজাতি লোকপরম্পরায় সমাজের অধিনায়ক হইয়াও সামান্য ভিক্ষোপজীবী, যে ব্রাহ্মণজাতি সমাজের মঙ্গলের জন্য যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি নানা কর্ম্মে সদা নিরত, সেই ব্রাহ্মণজাতির প্রতিপালনের জন্য যদি ধর্ম্ম দক্ষিণাদানে মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করতঃ সমাজের অন্যান্য জাতিকে উহাতে ধর্ম্মভাবে, প্রেমভাবে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করে, তাহাতে ধর্ম্মের অপরাধ কি? দেখ জগতের নিয়ম এই, যে দেশে সমাজের অনাটন পূরণ করিয়া জ্ঞানানুশীলন, শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্মানুশীলনে লোকের যত অবকাশ, সে দেশ তত উন্নতিপদবীতে অধিরূঢ়। এই নিয়মানুসারে হিন্দুধর্ম্ম সমাজের অন্যান্য জাতিকে অন্যান্য কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিয়া কেবল ব্রাহ্মণজাতিকে জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত করে এবং উহাদিগকে যথেষ্ট অবকাশ দিবার জন্য

উহাদের ভরণপোষণ অন্যান্য জাতির স্কন্ধে অর্পণ করে। ইহারই জন্য এ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণভোজনে ও দক্ষিণাদানে এত পুণ্য নির্দ্দেশ করে। অতএব যে ব্রাহ্মণজাতি হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়, যাঁহারা তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য সদা অনুচিন্তিত, যাঁহারা না থাকিলে, তোমরা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ, যাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াই তোমরা ধর্ম্মপথে, সাধনপথে অধিক অগ্রসর, তাঁহারা ব্যতীত তোমাদের দানের কে সুপাত্র? অন্ধ বল, খঞ্জ বল, পথের ভিখারী বল, ইহারা সমাজের অপোগণ্ড ; ইহাদের মৃত্যুতে সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই! কিন্তু যে ব্রাহ্মণজাতি তোমাদেরই নিকট হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণা পাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ আপনাদের অস্তিত্ব, হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব বজায় রাখেন, তাঁহারা কি সমাজের অপোগণ্ড? তাঁহারাই হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। যাও, তাঁহাদের পদরেণু স্পর্শ কর, অর্থদানে তাঁহাদের গৃহ সচ্ছল করিয়া দেও; ইহাতেই তোমাদের পুণ্যলাভ। নিদেন হিন্দুসমাজের খাতিরে, হিন্দুধর্ম্মের খাতিরে দক্ষিণাদি দান করিয়া তাহাদের উত্তমরূপ ভরণপোষণ কর। এ স্থলে কেহ যেন এমন মনে করেন না, যে সকল ব্রাহ্মণ কুলোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ম্লেচ্ছ সেবা দ্বারা বা অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপাপার্জ্জন করেন, তাঁহারাও তোমাদের দানের সুপাত্র? হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতনের দিনে অধ্যাপক ও পুরোহিতবর্গের এখন কত হীনাবস্থা, ও দুরবস্থা! যদি তাঁহারা সকলের নিকট যথাবিধি দক্ষিণা পান, হিন্দুধর্ম্মের কি এতদুর অধঃপতন সম্ভব?

শাস্ত্রে তিন প্রকার দান উল্লিখিত ; যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং।

গীতা।

"যিনি তোমার কখন উপকার করেন না, তাঁহাকে দেওয়া উচিত মনে করিয়া যে দান করা যায় এবং দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় যে দান করা যায়, তাহাই সকলের সাত্ত্বিক দান।"

উপকারের খাতিরে যাহা দান করা যায়, তাহা শ্রেষ্ঠদান নহে;

তাহা তুমি করিতে বাধ্য; সেটী তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এরূপ দান সকলেই করেন। কিন্তু যিনি তোমার আদৌ উপকার করেন নাই এবং যাঁহার নিকট তুমি কিছুমাত্র উপকার প্রত্যাশা কর না, তাঁহাকে তুমি যাহা দান কর, তাহাই তোমার সাত্ত্বিক দান। তীর্থস্থানে, দেবোৎসবে পুত্রের বিবাহোৎসবে, পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে, ও নৈষ্টিক ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়, তাহা সকলের সাত্ত্বিক দান।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং।

গীতা।

"যদি কেহ তোমার উপকার করেন, তাঁহার প্রত্যুপকার করিবার জন্য তুমি যে দান কর, তাহা তোমার রাজসিক দান। ভবিষ্যতে তুমি কোনরূপ সুফল পাইবে বা সুযশ পাইবে, এই মনে করিয়া যদি তুমি দান কর, তাহাও তোমার রাজসিক দান। যদি তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বা মনে কষ্ট অনুভব করিয়া দান কর, তাহাও তোমার রাজসিক দান।" গভর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি পাইবার আশায় বা সংবাদপত্রে স্বনাম উচ্চৈঃস্বরে উদ্ঘোষিত হইবার আশায় অনেক ধনবান ব্যক্তি যে দান করেন, তাহা তাঁহাদের রাজসিক দান। কিন্তু পুণ্যলাভের জন্য মন্দিরনির্ম্মাণ, পুষ্করিণীখনন, কূপখনন, ঘাটনির্ম্মাণ, প্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম্মে অর্থব্যয় করা যায়, তাহা লোকের সাত্ত্বিক দান।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং।

গীতা।

"অপাত্রে, অসময়ে ও অস্থানে যাহা দান করা যায়, তাহা তামসিক দান। যাহা ঘৃণাপূর্ব্বক ও অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক দান করা যায়, তাহা তামসিক দান। শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া বা কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাও তামসিক দান।" এইপ্রকার দান সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাতে পুণ্যও নাই, যশও নাই।

হিন্দুধর্ম্মের গুণে আতিথ্যধর্ম্ম ও দানধর্ম্ম চিরদিন হিন্দুসমাজে প্রবল

এবং হিন্দুজাতির ন্যায় অতিথিপরায়ণ ও দানশীল জাতি অন্যত্র দেখা যায় না। যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু লক্ষপতি হইয়াও শীতে কষ্ট সহ্য করেন, পরে সহস্র ব্রাহ্মণকে বনাত দান করিয়া নিজে বনাত গায়ে দেন, তাঁহার মতন এ সংসারে কে দানশীল? * যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু স্বজীবনে দানসাগররূপ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহার মতন এ সংসারে কে দানশীল? যে মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কালে সম্মুখে পঞ্চলক্ষ রজতমুদ্রা রাশীকৃত করিয়া তদন্তরালে পৌরাণিককে উপবেশন পূর্ব্বক একটী মাত্র ভাগবতের শ্লোক শ্রবণ করেন ও তাঁহাকে সমস্ত অর্থ দান করেন, তাঁহার মতন এ সংসারে কে দানশীল? †

পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, ও সন্ন্যাসাশ্রমের লোকেরা একমাত্র গৃহস্থাশ্রমবাসী দ্বারা প্রতিপালিত। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সহস্র সহস্র সাধু-সন্ন্যাসিগণ কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও লোকের মুষ্টিমেয় ভিক্ষায় দিনপাত করতঃ দেশবিদেশ পর্য্যটন করেন। পুরাকালে লোকে কত উৎসাহ ও কত আগ্রহের সহিত অতিথিসৎকার করিতেন এবং রাজন্যবর্গও কত অর্থব্যয় করিয়া নানা তীর্থস্থানে দেবমন্দির ও সদাব্রতাদি স্থাপন করিয়া যান, তাহা ভাবিলে কাহার না হৃদয়ে আনন্দোদ্রেক হয়? পূর্ব্বে গৃহস্বামী অতিথি প্রাপ্ত হইলে কিরূপ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন এবং তাঁহার কিরূপ সেবাশুশ্রূষা করিতেন! এখনও যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, তাঁহারা কত উৎসাহের সহিত অতিথিসৎকার করেন এবং অতিথিকে ভোজন না করাইয়া মুখে জলদান করেন না।

যে ভারত পূর্ব্বে এমন দানশীলতা ও বদান্যতার জন্য বিখ্যাত, সে ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা! যে পাশ্চাত্য-কালস্রোত প্রবলবেগে বহমান, তাহার সম্মুখে সকলই ভাসিবে ও রসাতলে যাইবে, একমাত্র দানশীলতা কেন থাকিবে? এখন অনেকে অতিথিসৎকার কাহাকে বলে, তাহাই জানেন না এবং ভিক্ষুককে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা দিতে অতীব কাতর। সন্ন্যাসী, ভিখারী ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে গৃহদ্বারে দেখিলে, তাঁহারা কোপে প্রজ্জলিত হন এবং দ্বারদেশ হইতে উহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিলে সুস্থিরচিত্ত হন। সমাজের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! এখন যেমন হিন্দুয়ানি লুপ্তপ্রায়, ভোগ-

* স্বর্গীয় তারকচন্দ্র প্রামাণিক এতদূর দানশীল ছিলেন।

† পাথুরিয়া রাজবংশের মহারাজ আমানসিংহ এতদূর দানশীল ছিলেন।

বিলাসও তেমনি প্রবল। আবার প্রজাবৎসল ইংরাজরাজের অনুগ্রহে এখন আমরা উদারান্নের জন্য লালায়িত ও বিবিধ করভারে প্রপীড়িত। এখন জীবনধারণ করাই আমাদের কতদূর কষ্টকর! কি ছাইভস্ম শিখিয়া আমাদের অনাটন ও অভাব এখন কত বর্দ্ধিত! আমাদের চতুর্দ্দিকে কিরূপ কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত! এইরূপে হিন্দুসমাজ নানা কারণে বিপন্ন হওয়ায় ইহার চিরন্তন দানশীলতা এখন লুপ্তপ্রায়।

আজকাল নব্যসম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, ইংরাজি বিদ্যালয়, ইংরাজি-চিকিৎসালয়, ইংরাজি-অনাথাশ্রম প্রভৃতি দেশহিতৈষী কর্ম্মে যোগ দান করা এবং তাহাতে মুক্তহস্ত হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। যে সদনুষ্ঠানে রাজার উৎসাহ, তাহাতে প্রজাও স্বতঃ উৎসাহী। যাহাতে রাজার নিকট সম্মান, তাহাতে প্রজাও স্বতঃ উৎসাহী। এখন ইংরাজি-বিদ্যালয় স্থাপনে লোকের যেরূপ আগ্রহ, চতুষ্পাঠী সাহায্য দানে তাহারা তেমনি নারাজ। যাহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সুকর, তাহাতে কাহার না আগ্রহ? আর যাহাতে দারিদ্র্যের ভীষণ কষ্ট, তাহা লুপ্ত হওয়াই সমাজের মঙ্গল। কিন্তু কিছুকাল পরে সকলেই সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারিবেন।

আজকাল অনেকে মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদানের উপর নারাজ। তাঁহারা মনে করেন, ইহাতে কেবল আলস্যের উৎসাহ দেওয়া হয়। অতএব ইহা যতই সমাজে অপ্রচলিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা অনাথাশ্রম স্থাপনের জন্য ব্যগ্র। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় যে দেশে বিপুল অর্থাগম হয়, যে দেশে বহুবিস্তৃত বাণিজ্য বশতঃ সমস্ত পৃথিবীর ধন এক স্থলে রাশীকৃত হয়, সে দেশে সমাজের অপোগণ্ডকদিগের প্রতিপালনের জন্য অনাথাশ্রম স্থাপন সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা। কিন্তু ভারতের ন্যায় যে দেশের জনসাধারণ দীনদরিদ্র ও কৃষিজীবী, সে দেশে অপোগণ্ডকদিগের প্রতিপালনের জন্য মুষ্টিমেয় ভিক্ষা দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এজন্য মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদানই এদেশের চিরন্তন প্রথা এবং ভারতের সকল প্রদেশে এই প্রথা চিরদিন প্রচলিত। মুষ্টিমেয় ভিক্ষা-দানে সমাজের যে কত মহোপকার সাধিত, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা কর, হিন্দুসমাজের সহিত ইউরোপীয় সমাজের তুলনা করিয়া দেখা উচিত। পাশ্চাত্যজগতে ধনবান ব্যক্তিদিগের যতদূর সুখ, দীনদরিদ্র লোকের ততদূর

কষ্ট। তথায় ধনবান যত সুখৈশ্বর্য্যে মত্ত, দীনহীন লোক ততই দারিদ্রদুঃখে প্রপীড়িত ও ক্লিষ্ট। যদি তথায় মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদান প্রথা প্রচলিত হইত, দীন দরিদ্র লোকের কি এতদূর কষ্ট থাকিত ? কিন্তু এদেশে হিন্দুধর্ম্মের গুণে মুষ্টিমেয় ভিক্ষাদান চিরদিন প্রচলিত বলিয়া, দরিদ্র লোকের ততদূর কষ্ট নাই। পাঁচ গৃহস্থের দ্বারদেশে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেই তাহারা উদর পূরণার্থ যথেষ্ট চাউল প্রাপ্ত হয়। অতএব যে প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ এতদূর উপকৃত, যদ্দ্বারা ইহার অপোগণ্ডকগুলি চিরদিন প্রতিপালিত, সে সুপ্রথা কি এখন কুশিক্ষা বশতঃ রহিত করা উচিত্ ?

আজকাল দুর্ভিক্ষের করালছায়া যেরূপ ঘন ঘন ভারতের নানা অঞ্চলে পতিত, তাহাতে প্রকৃষ্টরূপ দানধর্ম্মের অনুশীলন ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। ইংরাজদিগের আমলে ভারত সুখৈশ্বর্য্যে পূর্ণ বটে, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমরা এখন পেটের দায়ে অস্থির। ভারতের তিনাংশ লোক প্রায় একাহারী। যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এখন যেরূপ দুর্ম্মূল্য, তাহাতে অল্পকারণেই নানা স্থলে দুর্ভিক্ষপতন হয়। এই দুর্ভিক্ষপতনই ইংরাজরাজের ভারত-শাসনের দুরপনেয় কলঙ্ক এবং ইতিহাসে তাঁহাদের এ শাসনকলঙ্ক চিরদিন জ্বলন্ত অক্ষরে ঘোষিত হইবে। অনেকে বলেন, অর্থাভাববশতই ভারতে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপতন হয়। ইংরাজরাজের অর্থশোষণবশতঃ ভারতের জনসাধারণ এখন দীনদরিদ্র এবং অর্থাভাবই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। কিন্তু অবাধ বাণিজ্যবশতঃ ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের অধিকাংশ অন্যদেশে নীত এবং এই অন্নাভাবই দুর্ভিক্ষপাতের একমাত্র মূলীভূত কারণ। সত্য বটে, ইংরাজরাজ দৈবদুর্ব্বিপাক শান্তি করিতে চেষ্টা পান ও প্রজাপালনে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন ; কিন্তু তাঁহারা স্বজাতিপ্রিয়তাবশতঃ দুর্ভিক্ষপতনের মূলীভূত কারণ অপনোদনে কিছুমাত্র মনোযোগী হন না। বৃক্ষের মূলদেশ কর্ত্তন করিয়া শাখায় জলসেচন করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, তাঁহাদের উদার রাজনীতির ফলও তদনুরূপ। মনে করিলেই তাঁহারা ভারতের ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন ; কিন্তু বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজরাজ কি কদাচ অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করিতে পারেন ?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হিন্দুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইংরেজেরা যাহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলেন, তাহা আমাদের জাতীয় ভাষায় দৃষ্ট হয় না। রাজবংশাবলি, রাজচরিত ও যুদ্ধবিবরণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ প্রথমে সূতমুখে, পরে ভাট ও চারণমুখে রাজসভায় গীত হইত। তাঁহারাই পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া রাজন্যবর্গকে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপালনে চিরদিন প্রোৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা পদ্যাকারে যে রাজচরিত লিখিতেন, তাহা জনসাধারণের নিকট তাঁহারা কদাচ প্রচার করিতেন না; সেজন্য তাঁহাদের হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি নিজ বংশলোপের সহিত হিন্দুসমাজে লুপ্ত। আবার যখন কোন দেশে নূতন রাজবংশ উত্থিত, লুপ্তবংশের কীর্ত্তিকলাপ সমাজে আর গীত হইত না। এই প্রকারেও নানা রাজবংশের ইতিহাস লুপ্ত। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত অধিনায়ক এবং যাঁহাদের হস্তে দেবভাষা অর্পিত, তাঁহারা ঐতিহাসিক জ্ঞাননিচয় প্রাপ্ত হইয়া সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবে পুরাণাদিগ্রন্থে লিখিয়া যান। এজন্য জাতীয় ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ এখন যাহা বিদ্যমান, তাহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম্মগ্রন্থ অতিরঞ্জিত ও সমাজের বিশ্বাস ও ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত। অতএব উহাদের ভিতর হইতে ঐতিহাসিক সত্য সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য। অপরপক্ষে ম্যাক্সমুলারপ্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ হিন্দুশাস্ত্র, আবস্তিক ভাষা, চীন ভাষা, গ্রীক ভাষা প্রভৃতি মন্থন করিয়া ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করেন, তাহাও যে একেবারে অভ্রান্ত, তাহাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কালক্রমে নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহাদের অনেক মত খণ্ডিত হইবে। যাহা হউক, এস্থলে

শাস্ত্রমত ও পাশ্চাত্যমত লইয়া আমাদের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

অনৈতিহাসিক সময়ে সভ্য আর্য্যজাতির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই আর্য্যজাতি হইতে হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমান, জারমান, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি সমুদ্ভূত। তাঁহাদের আদিম নিবাস কোথায়, সে সম্বন্ধে নানা বাদানুবাদ প্রচলিত। অনেকের মতে এসিয়ার মধ্যভূভাগ তাঁহাদের আদিম নিবাসস্থল। এ স্থলে তাঁহারা সমাজে বিবাহাদি প্রথা চালিত করিয়া, গোমেষাশ্বপালন, কৃষি-কর্ম্ম, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ নৌকাগঠন, লৌহাস্ত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতি সভ্যদেশোচিত সমাজের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মগুলি উদ্ভাবন করতঃ কালসহকারে সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হন। কিন্তু লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সেই অনুর্ব্বর দেশে জীবনসংগ্রাম আয়াসসাধ্য হওয়ায়, তদীয় বংশধরেরা কয়েক শতাব্দীতে অন্যান্য দেশে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। এই প্রকারে তাঁহাদের কয়েক দল ভারতবর্ষ, পারস্য, গ্রীশ, ইটালি প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্য বিস্তার করেন। আর্য্যজাতির ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে রোপিত হইয়া প্রকৃতিদেবীর আনুকূল্য বিশেষ প্রাপ্তে কালবশে সকল বিষয়ে উন্নতিসাধন করতঃ অধিকতর সভ্য হন এবং সমাজের উন্নতি ও অনাটনের সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষদিগের মূল ভাষাকে পরি-বর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পরিণত করেন। এই প্রকারে একজাতির বংশধরেরা কালবশে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া পুরাতন আত্মীয়তা একেবারে বিস্মৃত হন। কিন্তু আধুনিক শব্দবিদ্যার কি অপার মহিমা! ধন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলি! তোমরা আজ সেই বহুকালবিস্মৃত জাতীয় সম্বন্ধ আবিষ্কার করায় সকলের ধন্যবাদার্হ।

হিন্দুজাতিও সেই আর্য্যজাতি হইতে সম্ভূত। তাঁহারাই জগতে আপনা-দিগকে আর্য্য বলিয়া প্রথম পরিচয় দেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে তাঁহারা হিন্দুস্থানের আদিম নিবাসী নন। কিন্তু একথা হিন্দুশাস্ত্রের কোন স্থলে উল্লিখিত নাই। অতিপুরাকাল হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এসিয়ার মধ্যস্থল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি শীতপ্রধান দেশের স্বভাবজ বলদর্পে দর্পিত হইয়া, প্রকৃতিদেবীর সহস্রানুকূল্যে সবিশেষ অনুগৃহীত, অত্যুর্ব্বর,

স্বর্ণময় ভারতভূমির প্রথিত ধনেপ্সায়, কেহ বা লুণ্ঠনের জন্য, কেহ বা বসবাসের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে আর্য্যজাতি সর্ব্বাগ্রগামী। প্রথমতঃ তাঁহাদের একদল বেলুরত্যাগ ও মস্থরত্যাগের মধ্যবর্ত্তী উচ্চবিভাগ হইতে আগমন করতঃ সিন্ধুনদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত হন। কালসহকারে তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় এবং তজ্জাতীয় কয়েক দল পশ্চাৎ যোগ দেওয়ায়, তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বদক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া সমস্ত পঞ্জাবে অভিব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া, তাঁহারা আদিমনিবাসী অনার্য্য-জাতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। তন্মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পর্ব্বত জঙ্গল আশ্রয় করে এবং অপর কতকগুলি আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া শূদ্র জাতিতে পরিণত হয়।

তাঁহারা বলেন, খ্রীঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসরের সময় আর্য্যজাতি পঞ্জাবে প্রথম পদার্পণ করেন এবং ছয় শত বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহারা পঞ্জাবে উপনিবেশস্থাপন করেন। তৎকালে তাঁহারা জড়োপাসক এবং বেদমন্ত্ররচয়িতা আর্য্য ঋষিগণ কৃষকযোদ্ধা। তৎপরে খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা গঙ্গা ও যমুনা পার হইয়া প্রথম দুই শতাব্দীতে কুরু ও পাঞ্চালরাজ্য স্থাপন করতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লিপ্ত হন; পরে দুই শতাব্দীতে তাঁহারা কোশল, মিথিল ও কাশীরাজ্য স্থাপন করেন। রামায়ণোক্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধের পর সংঘটিত। রাম, সীতা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও ব্যাসদেব সকলই কাল্পনিক নাম! শ্রীকৃষ্ণ গুজরাটে উপনিবেশ স্থাপন করেন মাত্র; বেদসংগ্রহকারিদের সমষ্টিই ব্যাসদেব। এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দ্বারা নানা ঐতিহাসিক সত্য আজকাল অগাধ অনুসন্ধান বলে আবিষ্কৃত ও দুন্দুভি-স্বরে সমগ্র জগতে প্রচারিত। এদেশের কৃতবিদ্য নব্যসম্প্রদায়ও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অখণ্ড্যজ্ঞানে গ্রহণ করেন ও স্বধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন।

যাহা হউক, সভ্য আর্য্যজাতি কি ভারতের আদিমনিবাসী এবং ভারত হইতেই কি তাঁহারা পারস্য প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, অথবা তাঁহারা কি মুসলমানজাতির ন্যায় অস্ত্রবলে ভারত বিজয় করেন, এ সকল কথা ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকেরা মীমাংসা করিবেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ উল্লেখ করেন, তাহা

আমাদের বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলি তাঁহারা যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহা আমাদিগের নিকট কেবল হাস্যোদ্দীপক মাত্র। পণ্ডিতবর ম্যাক্সমূলার বলুন, আর যিনিই বলুন না কেন, আমরা তাঁহাদের কথা আদৌ গ্রাহ্য করিতে পারি না, বা পারিব না। যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ কৃষক-যোদ্ধা, ঋক্‌বেদের মন্ত্র আর্য্য কৃষকদিগের ভীতিসংবলিত গীতি মাত্র! অহহ! ব্রহ্মার শব্দব্রহ্মরূপ বেদের কিরূপ অবমাননা! সত্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মস্তকে কিরূপ পদাঘাত! যে ধর্ম্মের আভ্যন্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, তাহা আজ জড়োপাসনা মাত্র। কলিকালে সকলই সম্ভব। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের এত লাঞ্ছনাও আমরা চক্ষে দেখিতেছি! হায়! রে অদৃষ্ট!

প্রথমভাগের যুগধর্ম্মে উল্লিখিত, হিন্দুজাতি যতদিন ভারতে আগমন করেন, সেই সময়কেও তাঁহারা সৃষ্টির চারি যুগানুসারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে ত্রেতাযুগে পরশুরাম ও শ্রীরাম অবতীর্ণ এবং দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব আবির্ভূত। বুদ্ধদেব খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংঘটিত। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে খ্রীঃ পূঃ তিন সহস্র বৎসর হইল, আর্য্যজাতি প্রথমে পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর জাতীয় সত্যযুগ, খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ জাতীয় ত্রেতাযুগ, খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫০০ পর্য্যন্ত জাতীয় দ্বাপরযুগ, তৎপরে জাতীয় কলিযুগের প্রবর্ত্তন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির কলিযুগের পঞ্চ সহস্র বৎসর এখন অতীত। ইহাতে বোধ হয়, কলিযুগ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে আর্য্যজাতি ভারতে আগমন করেন।

কালসহকারে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়া পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অধিষ্ঠিত হন এবং সর্ব্বত্র রাজতন্ত্র প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, প্রত্যেক সমাজ এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। কয়েক শতাব্দীতে তদীয় বংশধরেরা পঞ্জাবের প্রাকৃতিক আনুকূল্যবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া আদিম আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি সাধন করতঃ ক্রমশঃ সভ্যতা সোপানে অগ্রসর হন। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যগত ব্রহ্মাবর্ত্তপ্রদেশে বৈদিক ধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি সাধন হয়।

আমাদের প্রপিতামহ, অমিতবলশালী আর্য্যসন্তানগণ চতুরঙ্গবলে বেষ্টিত হইয়া পঞ্জাব হইতে বহির্গত হন এবং আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থান জয় করতঃ বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেন। এইরূপে খ্রীঃ পূঃ দ্বাবিংশ শতাব্দীর সময় তাঁহারা এক দিকে মিথিল, অন্যদিকে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত অভিব্যাপ্ত হইয়া অনার্য্যজাতিবর্গকে পার্ব্বত্যদেশে তাড়িত করতঃ অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কেকয়, পাঞ্চাল, মৎস্য, হস্তিনাপুর মিথিল, দ্বারকা, হৈহয় প্রভৃতি কয়েকটী ধনধান্যপরিপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, যদু, কুরু প্রভৃতি কতকগুলি রাজবংশের কীর্ত্তিধ্বজা আর্য্যাবর্ত্তে উড্ডীয়মান করেন।

জাতীয় সত্যযুগে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে আর্য্যসমাজ আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই জাতিতে বিভক্ত। পূর্ব্বতন যুগের অধ্যাত্মবিজ্ঞান মহর্ষিমণ্ডলে নিবদ্ধ থাকায় এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে যে নূতন জ্ঞান সঞ্চিত, তাহা শ্রুতিপরম্পরায় পুরুষানুক্রমে ও শিষ্যানুক্রমে চালিত হওয়ায় ব্রাহ্মণজাতিগঠনের সূত্রপাত হয় এবং রাজন্যবর্গের চতুষ্পার্শ্বে অসমসাহসিক যোদ্ধৃবর্গ একত্রিত হইয়া পুরুষানুক্রমে শৌর্য্যবীর্য্যের অনুশীলন করায় ক্ষত্রিয়জাতি স্থাপনের সূত্রপাত হয়। তৎকালে আর্য্যসমাজে বৈদিকধর্ম্ম প্রচলিত এবং যজ্ঞানুষ্ঠান ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত।

জাতীয় ত্রেতাযুগে বা খ্রীঃ পূঃ বিংশশতাব্দীর পর, আর্য্যসমাজে লিখনার্থ লিপিবিদ্যা প্রচলিত হওয়ায় শ্রুতিপরম্পরাগত বেদের ভাষ্যস্বরূপ ব্রাহ্মণভাগ বিরচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং যজ্ঞানুষ্ঠানব্যাপারও ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে। এই সময়ে গুণকর্ম্মের বিভাগ লইয়া কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা আর্য্যসমাজে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতির যে বিদ্রোহানলে আর্য্যসমাজ বহুদিবস হইতে কলুষিত, তাহা পরশুরামের শাস্ত্রবলে ও ব্রাহ্মণজাতির আত্মোৎসর্গে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়। এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসে গমন করিয়া দাক্ষিণাত্যে আর্য্যজাতির বিজয়ভেরি ঘোষিত করেন এবং তথায় আর্য্যধর্ম্ম বিস্তার ও রাজ্যস্থাপনের পথদর্শন করিয়া যান। এই সময়ে বাল্মীকিরচিত তদীয় কীর্ত্তি-কলাপ লোকমুখে গীত হওয়ায়, উত্তরকাল-প্রচলিত রামায়ণের সূত্রপাত হয়।

জাতীয় দ্বাপরযুগে, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পর সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সমগ্রবেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যান এবং যোগেশ্বরপ্রকটিত পুরাণকাহিনী আদিপুরাণে লিখিয়া লোকপ্রখ্যাত করেন। এই সময়ে আর্য্যজাতির যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত অভিব্যাপ্ত এবং কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, দুর্য্যোধন, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণের বীরত্বকাহিনী লোকমুখে গীত হইয়া উত্তরকাল-প্রচলিত মহাভারতের সূত্রপাত হয় এবং ঐ সকল বীরপুরুষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়জাতির আদর্শপুরুষ হওয়ায় সমধিক যশস্বী হন। এই সময়ে বৈয়াকরণিকেরা বৈদিকভাষার ব্যাকরণঘটিত নিয়মাবলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বৈদিক-ভাষাকে সংস্কৃতরূপ দেবভাষায় পরিণত করিতে চেষ্টা পান। যদিও তাঁহাদের পুস্তকাবলির কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়া পাণিনি খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে স্বব্যাকরণ রচনা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হন। এই সময়ে বৈদিকভাষা দেশবিশেষে অনার্য্যভাষামিশ্রণে প্রথমে গাথা, পরে পালিরূপ প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হয়।

তৎপরে খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর পর গ্রীকদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে চারি শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আর্য্যসভ্যতার চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। অতএব স্বীকার করা উচিত, জাতীয় দ্বাপরযুগেই হিন্দুজাতি জাতীয় আধিভৌতিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন। এই সময়ে তাঁহারা নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে অভিব্যাপ্ত হন এবং ভারত মহা-সাগরের সুদূরবর্ত্তী যাবা ও বালীদ্বীপ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে নানা হিন্দুরাজ্য স্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত। রাজন্যবর্গের রাজসভা ও রাজধানী অতুল সৌন্দর্য্যে ও অতুল শোভায় সুশোভিত। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসমাজকে এক ধর্ম্মপথের পথিক করিবার জন্য, সকল সমাজকে এক আদর্শে গঠিত করিবার জন্য ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি আর্য্যজাতির সভ্যতম জনপদবিশেষের সদাচারগুলি ও সদনুষ্ঠানগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া মনুস্মৃতি রচিত। এই সময়ে শৌণক, সাংখ্যায়ন, আশ্বালয়ন, কার্ত্ত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া কল্পসূত্রাদি প্রণয়ন করতঃ জগদ্বিখ্যাত হন। যে পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানরূপ কল্পবৃক্ষের

বেদান্তরূপ বিস্তৃত শাখার সুশীতল অনাতপে ভবমরুভূমির পথশ্রান্ত লক্ষ লক্ষ পথিকবর্গ এতকাল শান্তিসুখ ভোগ করেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ কল্পবৃক্ষ এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্যক অনুশীলনের সঙ্গে আর্য্যজাতির মানসক্ষেত্রে সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত। এই সময়ে অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন কপিলদেব যুক্তি-বলে বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুবিমল জ্যোতিপ্রাপ্তে সৃষ্টিরহস্যের মূলভেদ করিয়া মানবজাতির সুখদুঃখের কারণ উদ্ঘাটন করতঃ বিশ্বাশ্চর্য্যরূপ সাংখ্যদর্শন রচনা করেন। এই সাংখ্যদর্শনের সুবিমল জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধভূমণ্ডল-বিস্তৃত বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম এতদিন কোটী কোটী মানববৃন্দকে সদুপদেশ প্রদান করে। যে আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান উত্তরকালে যাবতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদি-গুরু ও পথদর্শক, সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এই সময়ে চরকাদি দ্বারা সবিশেষ উন্নতি সাধিত। এই সময়ে বেদ ও জাতিভেদের অবজ্ঞাকারী, সাম্যমন্ত্রোপ-দেশী বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রচারিত হওয়ায় আর্য্যসমাজে মহৎ ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মে শিবলিঙ্গাদির পূজা ধীরে ধীরে প্রচ-লিত। এই সময়ে তক্ষক প্রভৃতি কতকগুলি জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া ক্রমে ক্রমে আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে থাকে।

তৎপরে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পর, গ্রীশদেশীয় যবনেরা কয়েকবার হিন্দুস্থান আক্রমণ করাতে উভয়জাতির ভিতর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং উভয়জাতিই পরস্পর পরস্পারের নিকট আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, দর্শনাদি শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করতঃ জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের উন্নতিসাধন করিয়া যায়। এই সময়ে অশোকাদি নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্মপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হন এবং কতকগুলি অনুশাসনপত্র ঘোষণা করিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যান। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দাক্ষিণাত্য ও সিংহল দ্বীপে প্রথম প্রচারিত হয়। এই সময়ে পাতঞ্জলি পাণিনির মহাভাষ্য ও যোগসূত্র রচনা করিয়া ভুবনবিখ্যাত হন। এই সময়ে শক, পল্লবাদি কয়েক বলবান জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের উত্তরাংশে বহু উপদ্রব করায়, ক্ষত্রিয়গণ উহাদিগকে সমরে পরাস্ত করেন এবং পরাভবের চিহ্নস্বরূপ শকাব্দা খ্রীষ্টের জন্মপরিগ্রহের ৭৮ বৎসর পর প্রবর্ত্তন করিয়া যান। অনেকে বলেন, কাশ্মীরাধিপতি কণিষ্ক ইহা প্রবর্ত্তন করেন।

তৎপরে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হওয়ায়, উহার জয়পতাকা অর্দ্ধ-এসিয়ায় উড্ডীয়মান হয়। যে বৌদ্ধধর্ম্ম আজ ভূমণ্ডলের তৃতীয়াংশে বিস্তীর্ণ, সে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোন স্থলে একবিন্দু শোণিতপাত হয় নাই। এই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা প্রাচ্যজগতে বিকীর্ণ। এই সময়ে আর্য্যসমাজেও বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবসূর্য্য গগনমার্গের মধ্যস্থল স্পর্শ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিপতিবর্গ বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধস্তূপ বৌদ্ধমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্বধর্ম্মের জয় সম্যক ঘোষণা করিয়া যান। এই সময়ে হিন্দুদিগের ভিতর ন্যায়, বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্র এবং বৌদ্ধদিগের ভিতর ত্রিপিটক, তন্ত্র, ললিতবিস্তর প্রভৃতি স্তূপাকার গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রের সম্যক উন্নতিসাধন হয় এবং কাল-ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতিগণ আর্য্যজাতির নিকট ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করে। এই সময়ে ভুবনবিখ্যাত কবীশ্বর কালিদাস সুললিত ও সুমধুর কাব্য রচনা করিয়া জগৎকে বিমোহিত করেন। এই সময়ে উপরোক্ত কালিদাস, বরাহমিহির, ধন্বন্তরী, অমর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ অবন্তীপতি বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্নস্বরূপ বিরাজমান হন। এই সময়ে গুপ্ত, হূংস, বল্লভি, অন্ধ্র প্রভৃতি কয়েক রাজবংশ ভারতবর্ষে চক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে শক, পহ্লব, সিথিয়ান, কাম্বোজিয়ান প্রভৃতি যে সকল জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করিতে সক্ষম হয়, তাহারা কালক্রমে পুরাতন ক্ষত্রিয়জাতির সহিত মিলিত হইয়া আর্য্য-সমাজে নূতন ক্ষত্রিয়জাতি উৎপাদন করিতে থাকে।

এতকাল আর্য্যসমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম একত্র সমভাবে প্রচলিত এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট উভয়ধর্ম্মের উপদেশকগণ সমভাবে পূজিত। পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর ব্রাহ্মণজাতি নূতন ক্ষত্রিয়জাতির সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধনে যত্নবান হন এবং অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে ইহাকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হন। কুমারিলা ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস সাধন করেন। তাঁহারাই নবোৎসাহে

উৎসাহিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃসংস্কার করতঃ একদিকে কৃতবিদ্যসমাজে বেদান্তের নির্গুণোপাসনা, অপরদিকে সাধারণপ্রচলিত পঞ্চদেবতার উপাসনারূপ সাকারোপাসনা বদ্ধমূল করেন। তৎকালে পঞ্চদেবতার মধ্যে শিবারাধনাই সমাজে প্রবল হয়। তৎপরে সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুর উপাসনা সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে পুরাণ ও তন্ত্রাদি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ ভারতবর্ষের নানাস্থানে রচিত হইয়া আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়। এই সময়ে মুসলমানেরা নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্বধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়জাতির কুলোচিত শৌর্য্যবীর্য্যের নিকট পরাস্ত হওয়ায় তাঁহারা বিফলমনোরথ হন।

তৎপরে সপ্তশতাব্দীর ভিতর মুসলমানেরা হিন্দুরাজন্যবর্গকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহাদিগকে পর্ব্বত-জঙ্গলে বিতাড়িত করিয়া এক সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এইরূপে হিন্দুজাতির গৌরবসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়। তাঁহারা পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ভারতে রাজত্ব করেন এবং অনেক হিন্দুপরিবারকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করতঃ ও অনেক দেবালয় ভগ্ন করতঃ হিন্দুধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত করিয়া যান। এই সময়ে রামানুজ, রামানন্দ, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ হিন্দুসমাজে আবির্ভূত হন এবং নূতন নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করতঃ হিন্দুধর্ম্মকে নবোৎসাহে উৎসাহান্বিত করিয়া হিন্দুস্থানে মুসলমানধর্ম্মের পরাজয় সাধন করেন। তাঁহাদেরই গুণে মহারাষ্ট্র, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি হিন্দুজাতিগণ মুসলমানসাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে হিন্দুজাতির ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়াও হয় নাই এবং পশ্চিমদেশীয় শ্বেতকায় সভ্য ইংরাজজাতি সমুদ্র হইতে আগমন পূর্ব্বক ভারত অধিকার করেন। দেড়শতাব্দীর ভিতর তাঁহারাই বন্দুকবলে ও বুদ্ধিকৌশলে দেশের পর দেশ জয় করতঃ সমগ্র হিন্দুস্থানে অদৃষ্টপূর্ব্ব একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ। তাঁহারা মুসলমান, শিখ ও মহারাষ্ট্র জাতিদিগের পরাক্রম খর্ব্ব করতঃ ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূভাগগুলি ভোগ করিতেছেন এবং পর্ব্বতারণ্যমরুভূমিময় দেশগুলি দেশীয় রাজন্যহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পদানত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের উন্নত, সভ্যতম শাসন-

গুণে আজ সমগ্র ভারতখণ্ডে অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব শান্তি বিরাজিত। তাঁহারা সভ্যদেশোচিত বাষ্পীয়শকটাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলিকে সহানুভূতিশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে বিশেষ প্রয়াসী এবং স্বদেশের শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিয়া ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে যত্নবান।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে হিন্দুজাতির জাতীয় ইতিহাসের আভাসমাত্র উপরে প্রদত্ত হইল, এজাতি কিরূপে সমুদ্ভূত? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আধুনিক হিন্দুজাতি এক বিমিশ্র জাতি। পুরাকালে আর্য্যজাতি হইতে এজাতি সমুদ্ভূত বটে, তথাচ কালক্রমে ইহা অন্যান্য জাতির সহিত বিমিশ্রিত। মুসলমানদিগের ভারতাগমনের পূর্ব্বে, যখন হিন্দুসমাজ সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত ভারতের নানা প্রদেশে গঠিত হইতে থাকে, যখন জাতি-ভেদের সীমা ইদানীন্তন কালের ন্যায় প্রকৃষ্টরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই, তখন আর্য্যজাতির পর তক্ষক, নাগ, শাক, পল্লব, সিথিয়ান, জ্যাঠ প্রভৃতি যে সকল পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে সময়ে সময়ে ভারতে আগমন করেন, তাঁহারা সকলেই কালসহকারে হিন্দুজাতির আচার-ব্যবহার অবলম্বন করতঃ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া যান। অতএব আধুনিক হিন্দুজাতি আর্য্যজাতি, আর্য্যসমাজভুক্ত অনার্য্যজাতি এবং অন্যান্য পৌত্তলিক জাতির ক্রমবিমিশ্রণে ও ক্রমবিকসনে সমুদ্ভূত। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা চিরদিন সাহঙ্কারে বলিব, যে সুসভ্য আর্য্যজাতি হিন্দুস্থান হইতে অর্দ্ধভূমণ্ডলে নিজ সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করেন, সেই আর্য্যজাতির বিশুদ্ধশোণিতই আমাদের শিরায় শিরায় বহমান এবং আমরা তাঁহাদেরই একমাত্র বংশধর। সত্য বটে, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ও বিধিনির্ব্বন্ধে আজ আমরা জগতে স্বাধীনতা হারাইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু "কালস্য কুটিলাগতি" জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে, আমরা আবার জগতে পুনরভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হইব।

হিন্দুধর্ম্মের ঐতিহাসিক স্তর।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, যেমন আধুনিক হিন্দুজাতি বিবিধ উপাদানে সৃষ্ট ও গঠিত, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মও সেইরূপ বিবিধ উপাদানে সৃষ্ট ও গঠিত। সত্য বটে, প্রাচীন আর্য্যসমাজপ্রচলিত বিশ্বাসগুলির উপর ইহার মূলভিত্তি স্থাপিত; কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এধর্ম্ম বিশেষরূপ পরিবর্ত্তিত। যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিন্দুসমাজভুক্ত, যেমন হিন্দুজাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্রবে আনীত, উহাদের সাধারণ বিশ্বাসগুলিও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মে সম্মিলিত হওয়ায় ইহার আয়তন ও কলেবর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত! হিন্দুসমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণজাতি ঐ সকল বিভিন্নদেশকালপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে আপনাদের জ্ঞানোন্নতির সহিত হিন্দুসমাজোচিত বিভিন্নপ্রকার পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া উহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ করিয়া লন। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই দেশোচিত ও কালোচিত এবং একদিকে ইহার কড়াক্রান্তি বিচার যতদূর সূক্ষ্ম, অপরদিকে ইহার স্থিতিস্থাপকতা ততদূর প্রসারিত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্পষ্ট স্বীকার করেন, হিন্দুধর্ম্ম প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াবশতঃ হিন্দুসমাজে স্তরে স্তরে ক্রমবিকশিত এবং ইহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। যে ব্রাহ্মণজাতি ইহাকে চিরদিন চালান, তাঁহারা প্রকৃত প্রকৃতি-সেবক; তাঁহারা কোন কালে কোন বিষয়ে প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিতে চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই প্রকৃতির অকৃত্রিম ধর্ম্ম।

In the religious as in the social structure, the Brahmins supplied the directing brain-power. But both processes resulted from laws of human evolution deeper than the working of any individual will and in both the product has been not an artificial manufacture but a natural development."—*Indian Empire by Hunter.*

"হিন্দুধর্ম্মের কি ধর্ম্মরূপ, কি সামাজিকরূপ, সকল স্থলেই ব্রাহ্মণগণ স্বীয় মস্তিষ্কশক্তি প্রদান করিয়া ইহাকে চালিত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়-

রূপের সকল বিষয়ই লোকবিশেষ বা জাতিবিশেষের ইচ্ছাশক্তির কার্য্য অপেক্ষা মানবিক বিবর্ত্তনের গভীরতম নিয়মানুযায়ী চালিত ও স্ফুরিত এবং উভয়রূপই কৃত্রিমতায় পরিণত না হইয়া অকৃত্রিমতায় পরিণত।"

যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে এতদূর বুঝিতে সমর্থ, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের আদ্যন্তর কোথায় এবং ইহা কিরূপ মতামতে পূর্ণ, তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই; তজ্জন্য ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য তাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ এবং এতদসম্বন্ধে নানাভ্রমেও পতিত। এখন যে সকল স্তরের পর স্তর অতিক্রম করতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুধর্ম্ম আধুনিক আকার ধারণ করে, তাহা তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নির্দ্দেশ করেন। যথা,—

প্রথমতঃ

(১) বৈদিকধর্ম্ম

(ক) অন্যান্য আর্য্যজাতির সহিত একত্র বাসকালীন ধর্ম্ম।

(খ) পারসিকদিগের সহিত সদ্ভাব-কালীন ধর্ম্ম।

(গ) পারসিকদিগের সহিত বিরোধ-কালীন ধর্ম্ম।

(২) স্মার্ত্তধর্ম্ম

(ক) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলনকালীন হিন্দু-ধর্ম্ম।

(খ) বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসনকালীন হিন্দু-ধর্ম্ম।

(৩) পৌরাণিকধর্ম্ম

(ক) মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বকালীন হিন্দুধর্ম্ম।

(খ) মুসলমানদিগের ভারতাধিকার-কালীন হিন্দুধর্ম্ম।

(গ) ইংরাজদিগের ভারতাধিকার-কালীন হিন্দুধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ

শাস্ত্রানুসারে

(১) বেদসংহিতার সময়
(২) ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের সময়
(৩) কল্পসূত্র ও স্মৃতির সময়
(৪) পুরাণ ও তন্ত্রের সময়

তৃতীয়তঃ

সর্ব্বপ্রধান দেবতা লইয়া হিন্দুধর্ম্মে কতকগুলি যুগ বর্ত্তমান, যথা :-

(১) বরুণযুগ।
(২) ইন্দ্রযুগ।
(৩) পুরুষযুগ।
(৪) ব্রহ্মাযুগ।
(৫) শিবযুগ।
(৬) বিষ্ণুযুগ।
(৭) কৃষ্ণযুগ।

বৈদিক ধর্ম্ম।

এখন ভারতবর্ষে যে সকল বেদবেদাঙ্গ প্রচলিত, উহাদের সম্যক আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিকধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করেন, তাহাই যে অভ্রান্ত ও চিরদিন সত্যজ্ঞানে পূজিত হইবে, এমন বিশ্বাস আমরা কদাচ করিতে পারি না। নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহাদের মতামত বিলক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইবে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, বৈদিকধর্ম্ম উন্নত জড়োপাসনা মাত্র। তাঁহাদের মতে আর্য্যজাতি আদিম অবস্থায় আধুনিক অসভ্যজাতির ন্যায় জড়োপাসক ; তজ্জন্য তাঁহারা জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মেঘ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক নৈসর্গিক দৃশ্যে এক এক দেবতা কল্পনা করতঃ উহাদের পরিতোষের জন্য প্রথমে তদুদ্দেশে স্তবাদি পাঠ, পরে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান

করেন। তাঁহাদের এই মতটী কতদূর সত্য ও প্রমাণসিদ্ধ, তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। এখন তাঁহাদেরই মত অনুসরণ করা যাউক।

যৎকালে সমগ্র আর্য্যজাতি এসিয়ার মধ্যভূভাগে বসবাস করেন, তৎকালে তাঁহারা বরুণ, দৌষ্পিতৃ, মাতঃপৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার উপাসক হন এবং দেবোদ্দেশে সরলভাবপূর্ণ স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া নিজ মনকে সান্ত্বনা করেন। তৎকালে আর্য্যসমাজে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বা প্রতিমাপূজন প্রচলিত হয় নাই। এই অবস্থাই আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের আদিম অবস্থা। ইহাই ইহার বরুণযুগ।

যখন আর্য্যজাতি ভারতের উত্তরখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা কয়েক শতাব্দী স্বজাতীয় ইরানিদিগের সহিত বিশেষ সখ্যভাবে আবদ্ধ থাকেন; এমন কি, উভয়জাতির জাতীয় উন্নতি প্রথমে পরস্পরের সংমিলনে ও সাহায্যে সংঘটিত। এই সময়ে আর্য্যবংশসম্ভূত রাজন্যবর্গ পঞ্জাব, গান্ধার, বাহ্লীক নাদ (Media) প্রভৃতি কয়েক দেশে রাজত্ব করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিয়াও এই উভয় জাতির ভিতর এত অধিক ঘনিষ্ঠ সংস্রব অনুশীলিত হয়, যে এখন বৈদিক ভাষায় ও আবস্তিক ভাষায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই সময়ে উভয়জাতির ভিতর দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত এবং উভয়জাতির ভিতর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ও মেজাই (Majii) পুরোহিতবর্গ কালক্রমে কুলপরম্পরাগত বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত।

উভয় জাতির ভিতর এক প্রকার দেবোপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত এবং সমসংখ্যক (তেত্রিশটী) দেবতা পূজ্য। তৎকালে হিন্দুদিগের ভিতর বরুণ এবং পারসিকদিগের ভিতর অহুরমজদ প্রধান দেবতা। প্রথমোক্তদিগের মিত্র, বায়ু, সোম, অরমতি অর্য্যমান, নরাশংস, শেষোক্তদিগের মিথ্র, বয়ু, হোম, অরমহতি, অইর্য্যমান নইর্য্যোশঙ্ঘ বলিয়া বিবেচিত। বৈদিক জ্যোতিষ্টোম, যজ্ঞ, মন্ত্র, যম, ভগ, বৃত্রহণ শব্দগুলি আবস্তিক ইয়েষনে, যশ্ন, মন্থ্র, যিম, বগ, বেরেথেঘ্ন বলিয়া বিবেচিত। এখনও উভয়জাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, পবিত্রতার জন্য গোময় ব্যবহার করে এবং বিবাহাদিসংস্কারে প্রায় একরূপ অনুষ্ঠান অবলম্বন করে। প্রথমে ইরানিসমাজে অগ্ন্যুপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়; তদ্দৃষ্টে অঙ্গিরস ঋষি আর্য্যসমাজেও অগ্নিদেবের পূজা প্রচলিত করেন এবং

তদ্বংশজাত ঋষিগণ এই দেবের উপাসনা বহুবিস্তৃত করিবার মানসে অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রগুলি আবস্তিক বিদ্দিদাদানুসারে রচিত করিয়া যান। উত্তরকালে যখন ঐ মন্ত্রগুলি অথর্ব্ববেদ নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, তখন ঐ বেদ ম্লেচ্ছপ্রকটিত বলিয়া হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ হয় এবং অপর তিন বেদের ন্যায় ইহা তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না।

অতঃপর কালক্রমে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি বহুবিস্তৃত হওয়ায়, অনেকে কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয় এবং সেই সঙ্গে আর্য্যসমাজে ইন্দ্রদেবের পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠান বহুপ্রচারিত হয়। এদিকে পারসিকদিগের ভিতর জরথুস্ জাতীয় ধর্ম্ম সংশোধন করতঃ অগ্নিদেবের উপাসনা বহু প্রচলিত করেন। অগ্নি প্রধান দেবতা বলিয়া অগ্নিসংযোগে অপবিত্র মৃতদেহের সৎকার করা দোষার্হ-জ্ঞানে পারসিকসমাজে অগ্নিসৎকারপ্রথা রহিত হইয়া যায়। মঘবাসম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে সোমযাগ ও সোমরস পানে নিবৃত্ত হয়। এইরূপ নানা কারণ বশতঃ উভয়জাতির ভিতর ধর্ম্মসংক্রান্ত ঘোরতর বিবাদ ও বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। এই ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধই উভয় জাতির চিরবিচ্ছেদের মূলীভূত কারণ। এজন্য উভয়জাতিই স্বকীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পরস্পরের দেবদেবীর ও শাস্ত্রোক্ত প্রধান ব্যক্তির ভূয়সী নিন্দা করিয়া যায়। সংস্কৃতের দেব শব্দ অবস্তায় দৈত্যপ্রতিপাদক, অবস্তার দেববাচক অহুর (অসুর) সংস্কৃতে দৈত্যপ্রতিপাদক। হিন্দুদিগের পূজ্যদেবতা, ইন্দ্র, শর্ব্ব, নাশত্য অবস্তায় দৈত্যবিশেষ বলিয়া উক্ত।

পারসিকদিগের সহিত বিরোধসংঘটনের পর, আর্য্যজাতি পঞ্জাবের অন্তঃ-পাতী সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তে (আম্বালা জেলায়) বৈদিক ধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে প্রচার করেন এবং কয়েক শতাব্দীর ভিতর ইহার সম্যক্ উন্নতিসাধন করেন। এজন্য সরস্বতীতটে নৈমিষারণ্য চিরকালই হিন্দু-দিগের ভিতর এক পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। বৈদিক সময়ে অগ্নি, সূর্য্য ও ইন্দ্র আর্য্যধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি এবং ইহাদের উদ্দেশে অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্র বিরচিত। তৎকালে আর্য্যসমাজস্থ লোকবর্গ ধনপুত্রকামনায় ও শত্রুহননেচ্ছায় পূজ্য দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন।

চতুর্ব্বেদের মধ্যে ঋক্‌বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার মণ্ডলগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংগৃহীত। ইহার দশমমণ্ডল সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। ইহার দ্বিতীয়

মণ্ডল গৃৎসামদ দ্বারা, তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্র দ্বারা, চতুর্থ মণ্ডল বামদেব দ্বারা, পঞ্চম মণ্ডল অত্রী দ্বারা, ষষ্ঠ মণ্ডল ভরদ্বাজ দ্বারা, সপ্তম মণ্ডল বশিষ্ঠ দ্বারা অষ্টম মণ্ডল কন্ব দ্বারা, নবম মণ্ডল অঙ্গীরস দ্বারা রচিত। জাতীয় সত্যযুগে যখন আর্য্যসমাজে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তৎকালে সমাজস্থ গৃহস্বামিগণ দেবোদ্দেশে সরলভাবপূর্ণ স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন। তাঁহারাই আর্য্যঋষি; তাঁহারা যেমন একদিকে গৃহস্থ কার্য্যে ব্যাপৃত ও প্রতিবেশী অনার্য্য জাতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত, তেমনি অপর দিকে তাঁহারা নিজে স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন। এই সকল স্তব উত্তরকালে ঋক্‌বেদ সংহিতায় মন্ত্ররূপে সংগৃহীত। এ সকল মন্ত্র বহুকাল আর্য্যসমাজে শিষ্যানুক্রমে শ্রুতি-পরম্পরায় প্রচলিত। জাতীয় ত্রেতাযুগে যখন আর্য্যসমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে যাগযজ্ঞাদি বহুপ্রচলিত হইয়া জটিল হইতে জটিলতর হয়, তখন আর্য্যজাতির বংশবিশেষ পুরুষানুক্রমে বহুফলপ্রদ উৎকৃষ্ট মন্ত্রের অধিকারী হওয়ায় সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। তৎকালে এই সকল মন্ত্র ব্রহ্মনামে কথিত এবং যাঁহারা ঐ সকল মন্ত্র ব্যবহার করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে উক্ত হন। এইরূপে জাতীয় ত্রেতাযুগে যাগযজ্ঞের বহুপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা আর্য্যসমাজে প্রবর্ত্তিত। কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে আপনাদিগকে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, দ্বারপালাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক যজ্ঞকে বহুব্যাপারবিশিষ্ট করতঃ সমাজে স্বকীয় আধিপত্য বদ্ধমূল করেন। হোতাদিগের জন্য ঋক্‌বেদ সংহিতা, উদ্গাতাদিগের জন্য সামবেদ এবং অধ্বর্য্যুদিগের জন্য যজুর্ব্বেদ সঙ্কলিত।

জাতীয় ত্রেতাযুগে সংহিতাগুলি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ; তখন উহাদের ভাষ্যস্বরূপ ব্রাহ্মণভাগও রচিত। ব্রাহ্মণগুলির শেষ ভাগ আরণ্যক বলিয়া উক্ত এবং উপনিষদ আরণ্যকের অন্তর্গত।

ঋক্‌বেদের	দুই ব্রাহ্মণ		অত্রেয়ী ও কুশিতক।
সামবেদের	"		তাণ্ড্য ও ছান্দোগ্য।
কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের	এক	"	তৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ।
শ্বেত যজুর্ব্বেদ	এক	"	শতপথব্রাহ্মণ।
অথর্ব্ববেদ	এক	"	গোপথব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণগুলির শেষভাগ আরণ্যক।

ঋক্‌বেদের অত্রেয়ী ও কুশিতক আরণ্যক।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের— অত্রেয়ী আরণ্যক।

(সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের আরণ্যক নাই)

উপনিষদগুলি

ঋক্‌বেদের—অত্রেয়ী, ও কুশিতক।

সামবেদের—ছান্দোগ্য, তালবকার।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের—বাজসনেহি, বৃহদারণ্যক।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের—তৈত্রেয়ী কঠ, শ্বেতাশ্বতর।

অথর্ব্ববেদের—মুণ্ডক, প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য।

যে সময়ে পারসিকদিগের সহিত হিন্দুজাতির বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডল ও যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের ইন্দ্রযুগ বলা উচিত। এই সময়ে ইন্দ্রদেব ত্রিদশাধিপতি হন এবং তিনি চিরদিনই হিন্দুশাস্ত্রে দেবরাজ নামে কথিত। আকাশে রাত্রিকালে অগণিত নক্ষত্র উদয় হয়; এ জন্য মেঘাধিপতি আকাশরূপী ইন্দ্র গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করায় গুরুর অভিসম্পাতে সহস্রাক্ষ হন। গুরুপত্নীর সতীত্বাপহরণে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবাসী ছাত্রদিগকে নিবারণ করিবার জন্যই, বোধ হয়, ঐরূপ ঘটনা শাস্ত্রে উল্লিখিত।

বৈদিক সময়টী সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া আর্য্যসমাজে প্রচলিত। এই সময়ে পুরাণোক্ত শিব রুদ্ররূপী পবনদেব, বিষ্ণু আদিত্যবিশেষ এবং গায়িত্রী সূর্য্যদেবের স্তবমাত্র। এই সময়ে জীবনের বিবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠানকালে বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়; রাজন্যবর্গও অশ্বমেধাদি মহৎ মহৎ যজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পাদন করেন। এই সকল যজ্ঞসম্পাদনে ব্রাহ্মণজাতিই সকলের অধিনায়ক হন। সমাজে আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, তাঁহারা যাগযজ্ঞের ব্যাপারগুলিকে জটিল হইতে জটিলতর করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পান। পৌরাণিক যুগে তাঁহারা যেমন নানা দেবদেবীর পূজা ও নানা ব্রত প্রবর্ত্তিত করিয়া আপনাদের প্রতাপ হিন্দুসমাজে অক্ষুণ্ণ রাখেন, সেইরূপ বৈদিক সময়েও তাঁহারা যাগযজ্ঞের ব্যাপার জটিলতর করিয়া

আপনাদের প্রতাপ আর্য্যসমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সবিশেষ যত্নবান হন। স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়াই তাঁহারা চিরদিন ধর্ম্মগ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় লেখেন নাই এবং সংস্কৃত ভাষার সম্যক অনুশীলন করেন। অতএব ভাবিয়া দেখ, ব্রাহ্মণজাতি কতদূর স্বার্থপর! যে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্ম সহস্র বৎসর সগৌরবে হিন্দুস্থানে প্রচলিত, যে ধর্ম্ম দ্বারা অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে ভারতীয় সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ, সে ধর্ম্ম কেবলমাত্র বেদ ও ব্রাহ্মণ জাতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় বলিয়া ইহার জন্মভূমি হিন্দুস্থান হইতে চিরনির্ব্বাসিত।

এইরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মত প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা ঋক্‌বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলিতে এক ব্রহ্মের নিদর্শন পাইয়া বলেন :—

"Arya Rishees in Rigveda passed from Nature up to Nature's God."—*R. C. Dutt.*

যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য, বৈদিকধর্ম্ম কি উন্নত জড়োপাসনা এবং আর্য্য ঋষিগণ কি কৃষকযোদ্ধা? তাঁহারা কি ভীতিসংবলিত চমৎকাররস কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ভয়াবহ প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেবতা কল্পনা করতঃ ও তদুদ্দেশে স্তবস্তুতি পাঠ করতঃ আপনাদের দুর্ব্বল মনকে সান্ত্বনা করান? পরে স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতি আপনাদের প্রভুত্ব সমাজে স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠান শিক্ষা দিয়া কি কোটী কোটী মুদ্রা অনর্থক ব্যয় করান? অহো! আমাদের প্রপিতামহ মহর্ষিগণের কি দুর্ব্বুদ্ধি! তাঁহারা নিজ বুদ্ধির দোষে কত কোটী কোটী মণ ঘৃত সামান্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন ও যজ্ঞস্থলে আর্য্যকৃষককুলের সামান্য স্তুতি সপ্তস্বরে গান করতঃ লোকবর্গকে কেমন ব্যামোহিত করেন! কোথা হে মহামহোপাধ্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ! আপনারা এই সকল ঐতিহাসিক সত্য এখন আবিষ্কার করাতে আমাদের প্রকৃত ধন্যবাদার্হ। এখন আপনাদের শ্রীচরণ পূজা করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যখন আমরা ঋষিপ্রোক্ত বাক্যগুলি পদদলিত করিয়া আপনাদের সামান্য কথাগুলি শিরোধার্য্য করি, তখন পূজার আর বাকি কি?

এখন বৈদিক ধর্ম্মটী একবার হিন্দুর নয়নে দেখা যাউক। যিনি প্রকৃত হিন্দু, তিনি মনে করেন, চতুর্ব্বেদ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শব্দব্রহ্মের রূপমাত্র এবং

ইহারা তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইতে বিনিঃসৃত। তাঁহার মানসপুত্র মহর্ষিগণই জগতে চতুর্ব্বেদ প্রকাশ করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সৃষ্টির এই চতুর্যুগ ব্যাপিয়া বেদ জগতে প্রচলিত। এ কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতনের জন্য প্রকৃত বেদ বা ব্রহ্মবিদ্যা জগতে ঈষৎ প্রকাশিত এবং ইহার মন্ত্রশক্তি লুপ্তপ্রায়। বেদের যথার্থ অর্থ অতীব গূঢ়; যোগেশ্বর মহাত্মাগণই সে অর্থ বুঝিতে সক্ষম। আমরা কলিযুগের মানব; আমরা সে অর্থ বুঝিতে এখন অসমর্থ। সে দিনকার সায়নাচার্য্য, যাঁহার টীকা ও টীপ্পনি দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদসম্বন্ধে নানামত প্রচার করেন, তিনিও কলিযুগের মানব; তিনি বেদের গূঢ় অর্থের কি ধার ধারেন? দেখ, বেদের আদ্যক্ষর এক ওঁ শব্দের অর্থ কত গূঢ়! অ, উ, ম এই তিন বর্ণে সমগ্র জগৎ নিহিত। তিনি ঋক্‌বেদের যে অর্থ করেন, তাহা ত ইহার বাহ্যিক অর্থ মাত্র। সেই অর্থ দেখিয়া বৈদিকধর্ম্মের সমালোচনা করিলে, ইহার প্রকৃত অবমাননা করা হয়। সে দিনের খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের অর্থও অনেক স্থলে কত গূঢ় ও গভীর! সে সকল অর্থ যোগেশ্বর মহাত্মারাই ভালরূপ বুঝিতে পারেন। তবে কে-জানে-কোন-সময়ের অতি প্রাচীনকালের বেদের অর্থও একমাত্র সায়নাচার্য্যের টীকা দেখিয়া কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়? জগতের প্রাচীনগ্রন্থ মাত্রেই দুর্ব্বোধ্য। যে স্থলে পণ্ডিতগণ কোন গ্রন্থের অর্থ করিতে অপারগ, সেই স্থলে তাঁহারা উহার মনোভিমত অর্থ করিয়া লন। ঋক্‌বেদের এইরূপ মনোভিমত অর্থ করিয়াই ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিকধর্ম্ম সম্বন্ধে অপরূপ মতামত প্রচার করেন। পরদেহকর্ত্তনে কাহারও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না। সেইরূপ পরধর্ম্মশাস্ত্রের সমালোচনা অনায়াসে করা যায় এবং তৎসম্বন্ধে অপরূপ মতামত প্রকাশ করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক কৃতবিদ্য লোক তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করতঃ স্বধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হন।

তাঁহাদের মুখে তিনটী অপরূপ কথা শ্রবণ করা যায়। (১) বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতি সভ্য, অথচ জড়োপাসক; আবার তাঁহারা পরব্রহ্মের জ্ঞানও প্রাপ্ত হন, (২) যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান জড়োপাসনার পরিচায়ক মাত্র, (৩) আর্য্য ঋষিগণ কৃষকযোদ্ধা এবং ঋক্‌বেদের মন্ত্র কৃষককুলের গান মাত্র। এ

কথাগুলিতে হিন্দুমাত্রেরই হাস্যোদ্রেক হয়। হনুমানহস্তে জানকীপ্রদত্ত মুক্তমালা যেরূপ সমাদৃত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের হস্তেও চতুর্ব্বেদ এখন সেইরূপ সমাদৃত। মেষশৃঙ্গের নিকট হিরকও চূর্ণ হইয়া যায়।

তাঁহাদের মনে কতকগুলি কুসংস্কার বদ্ধমূল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, যে গ্রীশ ও রোমের পূর্ব্বে জগতের কোন জাতি সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হয় নাই। এখন তাঁহাদের বিশ্বাস মিসর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, আর্য্যজাতি ও চীন পূর্ব্বে সভ্য হয়; কিন্তু উহাদের পূর্ব্বে সমগ্র জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। এখন জগতে যে সকল জাতি অসভ্য, তাহারাই জড়োপাসক; অতএব আর্য্যজাতি প্রথম সভ্য হইবার পূর্ব্বে তাঁহারাও জড়োপাসক এবং দেবতাদিগের পরিতোষের জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু আজকাল যে সকল জাতি জড়োপাসক, উহাদের মধ্যেও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রচলিত নাই। তবে আমরা কি প্রকারে স্বীকার করি, যে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী আর্য্যজাতি জড়োপাসক? তাঁহারা পঞ্চদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যে সময় বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, সেইটী আর্য্যসভ্যতার চূড়ান্ত সময়। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচলনের সঙ্গে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান আর্য্যসমাজে অপ্রচলিত হয়। উহার পূর্ব্বে সভ্য আর্য্যজাতি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জড়োপাসনা করেন, এ কথায় কি কদাচ বিশ্বাস করা যায়? আজকাল সভ্য জাতি যেমন একেশ্বরবাদী, পুরাকালের সভ্য জাতি পৌত্তলিক এবং তৎপূর্ব্বের সভ্য জাতি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী। মানবের বুদ্ধিশক্তি কলিযুগে যেমন বিকশিত, তিনি তদনুরূপ কালোচিত ধর্ম্ম পালন করেন। একেশ্বরবাদ বল, পৌত্তলিকতা বল, যজ্ঞানুষ্ঠান বল, এই তিনই মানবের উন্নতাবস্থাসূচক। কেবল মাত্র তাঁহার বুদ্ধিশক্তির কিঞ্চিৎ তারতম্য বশতঃ ও শিক্ষার প্রভেদ বশতঃ তিনি উপরোক্ত কোন না কোন মার্গ অবলম্বন করেন।

বেদের নানাস্থানে যে পরব্রহ্মের কথা উল্লিখিত এবং যাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য মূর্খেরা সিদ্ধান্ত করেন, যে কৃষকযোদ্ধা আর্য্যঋষিগণ বৈদিক সময়ে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরকে বুঝিতে পারেন, তাহা কি আধুনিক সভ্যজাতিদের অসার একেশ্বরবাদ? না সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মায়াতীত গুণাতীত পরব্রহ্মের উপাসনা? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেব, অসুর, যোগেশ্বর, মহাত্মা

ও মহর্ষিগণ যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ দ্বারা যে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই পরব্রহ্মের কথাই বেদে লিখিত; আর আজকাল কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ যে লৌকিক ঈশ্বরে বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহার বিষয় বেদে লিখিত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিষয়টী আদৌ বুঝিতে পারেন না; তজ্জন্য তাঁহারা বৈদিকধর্ম্মসম্বন্ধে মহৎভ্রমে পতিত এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদ্যন্তর কোথায়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম।

প্রথমভাগে উল্লিখিত, সত্যযুগে যখন দেবরূপী মানব সুমেরু পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তৎকালে প্রকৃত বেদ বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান দৈববাণীযোগে দেবমণ্ডলীর ভিতর প্রকটিত। সৃষ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে দেবাসুরগণ সহজাত যোগবলে সেই আধ্যাত্মিকজ্ঞান অনুশীলন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া যান। যুগধর্ম্মানুসারে মানবদেহে যেরূপ স্থূলত্বের পরিবর্দ্ধন ও আধ্যাত্মিকতার অপগমন হয়, অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা মহাত্মামণ্ডলীর ভিতর নিবদ্ধ হইয়া যায়। আর্য্যজাতির মহর্ষিগণও সেই সকল মহাত্মাদিগের বংশে সম্ভূত। তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করতঃ যোগবলে সমস্ত অবগত হন। তাঁহারাই ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিভুবনজ্ঞ যোগেশ্বর মহর্ষি; তাঁহারা পরাক্রমশালী আর্য্য কৃষকযোদ্ধা নন। যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রামসীতা সকলকেই উড়ান, তাঁহারা যে মহাত্মা যোগেশ্বর মহর্ষিগণকে কৃষকযোদ্ধা বলিবেন, ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই।

শাস্ত্রমতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে চারিবেদ নিঃসৃত; এজন্য তাঁহার মানসপুত্র বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ ঋক্‌বেদের এক এক মণ্ডল ব্রহ্মার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আর্য্যসমাজে প্রচার করেন। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের আদ্যগ্রন্থ চতুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্যই শাস্ত্র ঐরূপ নির্দ্দেশ করে। যথার্থ বলিতে কি, এখন যাহা বেদ বলিয়া সংসারে খ্যাত, তাহা প্রকৃত বেদ বা ব্রহ্মবিদ্যা নয়; তাহা বেদের অপভ্রংশ মাত্র। হিন্দুসমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ কালের সর্ব্বসংহারিকাশক্তি সত্ত্বেও কলিযুগে সমাজের প্রয়োজনমত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য যাহা রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহাই এখন বেদ নামে প্রচলিত। যোগেশ্বর বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদিগের এই বেদের প্রতিকূলে কেন দণ্ডায়মান হন? সেইরূপ এখন যাহা উপনিষদ নামে সমাজে খ্যাত, তাহাও প্রকৃত উপনিষদ নহে, পুরাকালীন উপনিষদের অপভ্রংশ মাত্র।

ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্য যাহা শাস্ত্রে লেখা আবশ্যক বোধ করেন, তাহাই আধুনিক উপনিষদে লিখিত (ব্ল্যাভাস্কির মত)।

ঋকবেদ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের উদ্দেশে বিবিধ স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। এ সকল কি আর্য্যকৃষককুলের ভীতিসংবলিত গীত মাত্র? তাহারা কি হল-চালনাকালে ঐ সকল সরলভাবপূর্ণ সঙ্গীত গান করিয়া আপনাদিগের পরিশ্রমের লাঘব করিত? এ সকল সঙ্গীত শ্রুতিপরম্পরায় আর্য্যসমাজে চালিত হওয়ায়, উত্তরকালে স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতি কি আপনাদের উদরান্ন সংস্থানের জন্য বিবিধদ্রব্যের আয়োজন করিয়া উহাদিগকে সপ্তস্বরে গান করতঃ লোকবর্গকে কেবলমাত্র প্রতারণা করিয়া যান? পুরাকালের আর্য্য ঋষি-গণ কি চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ প্রভৃতি নৈসর্গিক দৃশ্যের অসাধারণত্ব দর্শনে উহাতে দেবতা কল্পনা করতঃ তাহাদের পরিতোষের জন্য স্তব-স্তুতি পাঠ করিয়া যান? মূর্খ, বর্ব্বর জড়োপাসক যেমন আকাশের মেঘের গভীর নিনাদ শ্রবণে ভয়ে গিরিগুহায় প্রবেশ করে, পুরাকালে আর্য্য-ঋষিগণও কি সেইরূপ মেঘের শব্দে ভীত হইলে ঐ সকল স্তব আওড়া-ইয়া আপনাদিগকে আশ্বাস দেন! পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ইহা কতদূর মূর্খতা, কতদূর অজ্ঞানতা, যে তাঁহারা আজ কতকগুলি স্বকপোল কল্পনা প্রচার করতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত! তাঁহাদের মতামত বিকৃতমস্তিষ্কের প্রলাপ বলিয়া আমাদের জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋক্‌বেদপাঠে যে সিদ্ধান্ত করেন, যৎকালে আর্য্য-জাতির ভিতর বরুণ সর্ব্বপ্রধান পূজ্যদেবতা, তৎকালের মতামত হিন্দু-ধর্ম্মের আদ্যস্তর, একথাও আমরা আদৌ গ্রাহ্য করিতে পারি না। কিন্তু সৃষ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে দেবরূপী ও অসুররূপী মানবের ভিতর যে নির্গুণ পরব্রহ্মোপাসনা, যোগাভ্যাস, ও তপশ্চরণ প্রচলিত, তাহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদ্যস্তর। এজন্য আমরা সাহঙ্কারে বলিতেছি যে, হিন্দুধর্ম্মের আদ্যস্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত; আর যাঁহারা ভাবেন, ব্রহ্মবিষ-য়ক জ্ঞান বেদান্ত ও উপনিষদ লিখিবার সময় আর্য্যসমাজে প্রথম প্রকটিত, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত। হিন্দুধর্ম্মের আদ্যস্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত বলি-

য়াই ইহার আদ্যগ্রন্থ ঋক্‌বেদেও পরব্রহ্মের কথা নানা স্থানে উল্লিখিত। আমরা কদাচ স্বীকার করিব না, যে জড়োপাসক আর্য্যজাতি জড়জগৎ অন্বেষণ করিতে করিতে পরিশেষে যুক্তিবলে একেশ্বর জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সেইরূপ এক পারসিকজাতির সহিত হিন্দুজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মিসর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, ক্যাণ্ডিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত পুরাকালে আর্য্যজাতির কিরূপ সংশ্রব ছিল, তাহাও কালে আবিষ্কৃত হইবে।

এখন বৈদিক ধর্ম্ম কি প্রকার, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা কর্ত্তব্য। মায়াতীত, গুণাতীত, পরব্রহ্মের চিৎশক্তি এই মায়াময় জড়জগতে সূক্ষ্মজগতস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রকটিত; উহারাই যাবতীয় জড়শক্তির মূলে অধিষ্ঠিত; উহারাই পরব্রহ্মের আজ্ঞাবহ দাসস্বরূপ একোদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুশৃঙ্খলতার সহিত জড়জগৎ চালান। এখন কলিযুগের মানব বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিসংহারবিষয়ক যাবতীয় ক্রিয়া একেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত; তিনি আর দেবতাদিগের অস্তিত্ব মানেন না এবং দেবোদ্দেশে যাহা কিছু করা যায়, তাহা তিনি পৌত্তলিকতাজ্ঞানে ঘৃণা করেন। বস্তুতঃ জড়শক্তির মূলে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের পূজা ও স্তবস্তুতি করিলে অপ্রজ্ঞাত পরব্রহ্মের স্তবস্তুতি করা হয়। এখন ঐ সকল দেবগণ কি প্রকারে স্তবনীয় ও পূজনীয় হওয়া উচিত, তাহাই বেদে প্রদর্শিত; তজ্জন্য চতুর্ব্বেদ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানা স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল স্তবস্তোত্র বিবিধস্বরে গীত হইলে, সূক্ষ্মজগতে বিবিধ ফলোৎপাদন করে। এখন কলিযুগবর্দ্ধনের সঙ্গে বেদের মন্ত্রশক্তি লুপ্ত এবং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও হিন্দুসমাজে অপ্রচলিত।

গীতায় লিখিত—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষঃ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ
তৈর্দ্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

"পুরাকালে যজ্ঞের সহিত অথবা যজ্ঞদ্রব্যের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি বলেন, ওহে প্রজাগণ! তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও এবং যজ্ঞই তোমাদের যাবতীয় ইষ্টফল প্রদান করুক। তোমরা যজ্ঞদ্বারা (হবিভাগ প্রদান করিয়া) দেবতাদিগের সংবর্দ্ধন কর এবং দেবতারাও বৃষ্ট্যাদিদ্বারা অন্নোৎপাদন করিয়া তোমাদিগের সংবর্দ্ধন করুন; এইরূপ পরস্পর পরস্পরের সহিত আদান প্রদান দ্বারা তোমরা পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। যজ্ঞ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া দেবতারা তোমাদের অভিলষিত ভোগ্যবস্তু সকল প্রদান করিবেন; আর যে ব্যক্তি দেবদত্ত (অন্নাদি) ভোগ্যবস্তু দেবতাদিগকে না দিয়া ভোগ করে, সে ব্যক্তি তস্কর। যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; আর যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপাত্মাগণ পাপই ভোজন করে। অন্ন হইতে প্রাণিগণের, পর্জ্জন্য হইতে অন্নের, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্যের এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি; আর কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ পরমাত্মাস্বরূপ অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়ত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত জানিবে।" যজ্ঞানুষ্ঠানের কয়েকটী মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। যেমন রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া উহাদিগকে নানা আপদ্‌বিপদ্ কালে রক্ষা করেন এবং নানাবিষয়ে উহাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন, সেইরূপ দেবতাদিগকে যজ্ঞাংশ প্রদান করিলে, তাঁহারাও আমাদিগকে নানা দৈববিপদে রক্ষা করেন এবং নানা বিষয়ে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এস্থলে যদি দেবতাদিগের উপর তোমার বিশ্বাস শিথিল হয় এবং তুমি ভাব, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই, তখন তুমি দেবোদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান অনর্থক জ্ঞান করিয়া থাক। সংসারের যাবতীয়

ভোগ্যবস্তু আমরা যে সকল দেবতা হইতে প্রাপ্ত হই, তাঁহাদিগের উপর কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই আমরা তাঁহাদিগকে যজ্ঞাংশ প্রদান করি। এখন যেমন সভ্যদেশের জনসাধারণ দেবতাদিগের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনিয়ন্তা একেশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহারা তেমনি তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা কেবল কথায় প্রকাশ করে মাত্র এবং তজ্জন্য দ্রব্যাদির কিছুমাত্র আয়োজন করে না। যে সময়ে লোকের যেরূপ ধর্ম্মভাব, তাহারা তদনুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমোদ উপভোগ করে; এজন্য আজকাল যজ্ঞানুষ্ঠান জড়োপাসনার চিহ্নস্বরূপ বিবেচিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; ইহাও ধর্ম্মের উচ্চ-ভাব। বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ ইহার মহোচ্চভাব লোকে এখন বুঝিতে অসমর্থ।

আরও দেখ, সূর্য্যদেব পৃথিবী হইতে অপর্য্যাপ্ত বারিবাষ্প শোষণ করতঃ বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীকে উর্ব্বরা করেন। সেইরূপ দেবতারাও আমাদের নিকট হইতে যজ্ঞাংশ গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে অপর্য্যাপ্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করেন। এইটী সূক্ষ্মজগতের কথা। জড়জগৎ হইতে এ বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। এখন জিজ্ঞাস্য, যজ্ঞ হইতে কি প্রকারে মেঘোৎপত্তি হইত? মনে কর, বেদের মন্ত্রশক্তি ইন্দ্রদেবকে প্রসন্ন করাইয়া মেঘোৎ-পাদন করিত, এ কথা আর্য্যসমাজের কুসংস্কার মাত্র; তথাচ যখন পরীক্ষা-দ্বারা ইহা সম্যকরূপে স্থিরীকৃত, যে ব্যোমমার্গে ডাইনামাইট দ্বারা প্রভূত ধূম উৎপাদন করিলে, সেই ধূমরাশি মেঘাকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে বৃষ্টি পতিত হয়, তখন যে যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত অগ্নিতে আহুত হওয়ায় যথেষ্ট ধূম উৎপন্ন হইত, তদ্দ্বারা বারিবর্ষণের যে বিশেষ সুবিধা হইত, তদ্বিষয়ে কি কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত?

যাহা হউক, যখন যজ্ঞানুষ্ঠান এতকাল আর্য্যসমাজে প্রচলিত, তখন নিশ্চ-য়ই উহা দ্বারা আর্য্যসমাজ বিশেষরূপ উপকৃত। সত্য বটে, লোকের শিক্ষা, দীক্ষা ও ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ইহা আর্য্যসমাজে ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া যায়; তথাচ ইহা যে কালোচিত অত্যুন্নত ধর্ম্মানুষ্ঠান, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আরও দেখ, যে যজ্ঞের বেদি নির্ম্মাণ হইতে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি উদ্ভূত, যে যজ্ঞের কালনির্ণয় হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র উৎপন্ন, যে

যজ্ঞ কি কদাচ বর্ব্বরসমাজোচিত জড়োপাসনার পরিচায়ক হইতে পারে? যে যজ্ঞ হইতে ঐ সকল উৎকৃষ্ট শাস্ত্র উদ্ভূত হওয়ায় ভারত ঐ সকল বিষয়ে সমগ্র জগতের আদিগুরু, সে যজ্ঞ কি জড়োপাসনার চিহ্ন? অতএব আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়া চিরদিন সাহঙ্কারে বলিব যে যজ্ঞানুষ্ঠান সমাজের উন্নতাবস্থাসূচক এবং বৈদিকধর্ম্ম কালোচিত উন্নত ধর্ম্মমত; ইহা কদাচিৎ জড়োপাসনা হইতে পারে না।

এখন বৈদিক ধর্ম্মান্তর্গত সূত্রযুগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইউ-রোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে এই সময়ই আর্য্য সভ্যতার চূড়ান্ত সময়। এই সূত্রযুগেই হিন্দুসমাজের যাবতীয় গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিত। বোধ হয়, অল্পায়াসে শাস্ত্রোক্ত কথা কণ্ঠস্থ করিবার জন্য চিরদিন সূত্রগ্রন্থগুলির এত আদর এবং এখনও উহারা হিন্দুসমাজে সবিশেষ প্রচলিত। বেদের ব্রাহ্মণগুলি রচিত হইবার অনেক পরে কল্পসূত্র রচিত হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়াকলাপ সুপ্রণালীতে ও সুশৃঙ্খলায় লিখিত। কল্পসূত্র তিন প্রকার, যথাঃ—

(১) শ্রৌত—ইহাতে বৈদিক প্রধান প্রধান যজ্ঞের বিবরণ লিখিত।

(২) গৃহসূত্র—ইহাতে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের যাবতীয় সংস্কার বর্ণিত।

(৩) ধর্ম্মসূত্র—ইহাতে চতুবর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক ব্যবস্থাবলি সন্নিবেশিত।

এসময়েই চতুর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও যাগযজ্ঞ হিন্দুসমাজে সম্যক অনুষ্ঠিত হয়। যেমন একদিকে চতুরাশ্রমধর্ম্ম দ্বারা হিন্দুসমাজ সভ্যতার পথে অধিক অগ্রসর হয়, তেমনি অপরদিকে যাগযজ্ঞ বহুকাল ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায়, আর্য্যসমাজে ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। এই সময় হইতেই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের উপর সাধারণ লোকের ভক্তি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ বলেন, বৈদিক সময়ের অন্তিমভাগে বেদোক্ত প্রধান প্রধান দেবতাদিগের পূর্ব্ব গৌরব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয় এবং দেবমণ্ডলীর ভিতর ব্রহ্মার পদ বৃদ্ধি করা হয়। এই সময়ে লোকে যাগযজ্ঞের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলনকালীন হিন্দুধর্ম্ম।

যৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত, তৎকালে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ, তাহা লিখিবার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধদেব ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। কথিত আছে, যখন তিনি স্বীয় ধর্ম্মমত জগতে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি বুদ্ধগয়ার নিকট বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন; এজন্য তৎ-প্রচারিত ধর্ম্মের নামও বৌদ্ধধর্ম্ম। এ মহাত্মার জীবনীসম্বন্ধে নানা মুনির নানামত প্রচলিত। তন্মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণন করেন, তাহাই আজকাল সকলে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যদিও তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় সময়োচিত শিক্ষা লাভ করতঃ বৈরাগ্যবশতঃ রাজ্যত্যাগ করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে তৎকালোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যান। তাঁহারা বলেন, যখন সমগ্র আর্য্যসমাজে বেদ সর্ব্বত্র পূজিত এবং কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রবল, তখন তিনি উভয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া সামাজিক ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করতঃ জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তৎকালে জনসাধারণ ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা চালিত হইয়া যজ্ঞাদিতে নানাবিধ পশু হত্যা করায় অতীব হিংসাপর হয়। তৎপ্রতিকারের জন্য তিনি অহিংসা পরম ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন।

অপর লোকের মতে, তিনি প্রকৃত মহাত্মা অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন যোগেশ্বর এবং তাঁহার যোগবল সহজাত। যোগবল ব্যতীত কোন মহাত্মা জগতে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ, ঈষা, মুষা, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য দেব প্রভৃতি সকল মহাত্মাই যোগেশ্বর এবং যোগবলেই তাঁহারা জগতে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। সেইরূপ বুদ্ধদেবও যথার্থ যোগেশ্বর এবং যোগবলেই তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং যোগবলেই তিনি জগতে নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন। তিনি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তিনি স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অবনত মানবধর্ম্মের সংস্কার করিবার জন্য অতুল বিভব ও অতুল সম্পদ ত্যাগ করেন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের

যে সকল গূঢ় প্রাচীন শাস্ত্র হইতে যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণ ও শ্রীকৃষ্ণাদি মহাত্মাগণ মহাসত্য প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন, বুদ্ধদেবও যোগবলে সেই সকল শাস্ত্র অবগত হইয়া তৎকালোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত জগতে প্রচার করেন। তৎপ্রচারিত নির্ব্বাণ, কর্ম্মফল, ধ্যানযোগ প্রভৃতি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মত-গুলি সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতেই গৃহীত। কলিকালে মানবসমাজে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের যাহা প্রকাশ করা উচিত, তাহাই তিনি জগতে প্রচার করেন; তদ্ভিন্ন তিনি গুপ্তবিষয় দুই এক শিষ্যের নিকট প্রকাশ করেন মাত্র। তৎ প্রচারিত ধর্ম্মেরও দুইটি রূপ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত; ব্যক্ত রূপে ইহা হিন্দুধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু অব্যক্ত বা গূঢ়রূপে হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

কথিত আছে, যে সময়ে তিনি স্বকীয় ধর্ম্মমত জনসমাজে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময়েই তিনি যোগ-সিদ্ধ হন এবং এই সময়েই পরমার্থজ্ঞান তদীয় হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হয়। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনিও হিন্দুতপস্বিদিগের সহিত ঘোর তপস্যা করেন; কিন্তু উহাতে তাঁহার মনে কিছুমাত্র সন্তোষলাভ না হওয়ায়, তিনি তপস্বিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, হিন্দুদিগের তপস্যার অনাদর করিবার জন্য বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা ঐরূপ লিখিয়া যান। তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, যেমন তিনি স্বসমাজপ্রচলিত ধর্ম্মমতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, তাঁহার উপদেশের উপর জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্যই তদীয় শিষ্যবর্গ প্রচার করেন, ধর্ম্মোপদেশ দিবার পূর্ব্বে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। এখন তিনি একদিনে পরমার্থজ্ঞান লাভ করুন, অথবা আজীবন যোগসাধন করিয়া পরমার্থজ্ঞান লাভ করুন, তিনি যাহা লোকসমাজে প্রচার করেন, তাহা ধর্ম্মজগতের অতুলনীয় মহাসত্য। সত্য বটে, বেদের কর্ম্মকাণ্ড বা বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি হিন্দুশাস্ত্রে নাস্তিক বলিয়া উক্ত, তথাচ তিনি আদৌ নাস্তিক নন। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মায়াতীত পরব্রহ্মের উপাসক এবং আপনাকে সোঽহং বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ তদীয় উপদেশ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাকেই পরব্রহ্ম স্থানে পূজা করেন। সেইরূপ যে ঈষা

আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার শিষ্যেরাও তাঁহার উপদেশের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পুত্র-পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন। এস্থলে বলা উচিত, যেমন খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ভিতর লৌকিক ঈশ্বর মায়াতীত পরব্রহ্মের মায়ারূপ এবং হিন্দুদিগের ভিতর ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিব পরব্রহ্মের মায়ারূপ, সেইরূপ বৌদ্ধদিগের ভিতর বুদ্ধদেবও পরব্রহ্মের মায়ারূপ।

যৎকালে আর্য্যসমাজ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করতঃ বিবিধ পশু হত্যা করিয়া ঘোর নির্দ্দয় হয়, তখন বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াই সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন। যখন ব্রাহ্মণজাতি সাধারণ সমাজকে বেদের কর্ম্মকাণ্ডানুসারে কেবল মাত্র যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান উপদেশ দেন এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া যান, তখন মহাত্মা বুদ্ধদেব যোগবলে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মহৎ মহৎ সত্য প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থজ্ঞান সাধারণভাবে প্রচার করেন এবং তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণজাতির বিপক্ষে খড়্গ উত্তোলন করিতে বাধ্য হন।

সত্য বটে, আজকাল বৌদ্ধধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে আকাশপাতাল প্রভেদ, তথাচ ইহা স্বীকার করা উচিত, আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষের শাখা, বৌদ্ধধর্ম্মও সেই সনাতন কল্পবৃক্ষের অপর একটী প্রকাণ্ড বহুবিস্তৃত শাখা মাত্র। যদিও বৌদ্ধধর্ম্ম চিরদিনের জন্য ইহার জন্মভূমি ভারত-বর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত; তথাচ ইহা আমাদের প্রধান গৌরবের বিষয়, যে মহাত্মা বুদ্ধদেবের ভারতে জন্মগ্রহণ হওয়াতে ভারত চিরদিনের জন্য পবিত্রীকৃত; যেহেতু, তৎপ্রচারিত ধর্ম্মই সমগ্র অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে, এসিয়ায় প্রাচ্যভাগে ও নানা দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা জ্যোতি বিকীর্ণ করে।

বুদ্ধদেব যেরূপ উৎসাহ, আগ্রহ ও বজ্রনিনাদের সহিত স্বীয় ধর্ম্মমত জগতে প্রচার করেন এবং তদীয় শিষ্যগণ তৎপ্রদর্শিত সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করতঃ তাঁহার ধর্ম্মমত যেরূপভাবে প্রচার করেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম অচিরে নানাস্থানে বিস্তৃত হয় এবং ব্রাহ্মণগণও হতবুদ্ধি হইয়া যান। তাঁহাদিগের উৎসাহ বশতঃ কয়েক শতাব্দীর ভিতর এ ধর্ম্ম কোথায় চীন ও তাতার, কোথায় যাবাদি দ্বীপপুঞ্জ সর্ব্বস্থলে প্রচারিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রগুলি সংস্কৃতভাষায় লিখিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির নিকট ইহার দ্বার

চিরদিন অবরুদ্ধ প্রায়। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি পালি প্রভৃতি সহজ বোধগম্য প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় এ ধর্ম্ম অত্যল্পকাল মধ্যে সাধারণ সমাজের সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়; এমন কি, যে আর্য্যসমাজ এতাবৎ কাল ব্রাহ্মণজাতির কঠোর শাসনে শাসিত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, সেই আর্য্যসমাজই আবার বুদ্ধদেববিকীর্ণ নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দলে দলে সহস্র সহস্র স্বার্থত্যাগী, সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী ভিক্ষু-ভিক্ষুনী উৎপাদন করতঃ দেশদেশান্তরে ও দিগ্‌দিগন্তরে নূতনধর্ম্মের কীর্ত্তি-ধ্বজা উড্ডীয়মান করে এবং অসংখ্য অসভ্য বর্ব্বর সমাজে ভারতীয় সভ্যতাজ্যোতি বিকীর্ণ করে। ধন্য বুদ্ধদেব! ধন্য তোমার ধর্ম্মোপদেশ! ধন্য তোমার উৎসাহ! কোথাও একবিন্দু শোণিতপাত না করিয়া তোমার ধর্ম্মাত্মা অধ্যবসায়ী শিষ্যানুশিষ্যগণ ধীরে ধীরে ত্বৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে অর্দ্ধভূমণ্ডলে বিস্তৃত করেন। ভারতে তোমার জন্মগ্রহণ হওয়াতে ভারত চিরদিনের জন্য বৌদ্ধদিগের নিকট পুণ্যক্ষেত্র।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতবর্ষ চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধে বেষ্টিত হওয়ায়, ইহার নরপতিবৃন্দ কোন সময়ে ভারত হইতে অন্যান্য দেশে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, যে ভারত নানাদেশে স্বীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিকীর্ণ করতঃ উহাদিগকে সাত্বিকভাবে জয় করে, সে ভারতের নরপতিগণ যদি দিগ্বিজয়ে সশস্ত্রে বহির্গত না হন, তাহাতে তাঁহাদের কি দোষ দেওয়া উচিত? আর যে খৃষ্টান ও মুসলমান নরপতিগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য নরকণ্ঠবিনিঃসৃত শোণিতপ্রবাহে নানাদেশ প্লাবিত করেন, তাহাতেই বা তাঁহাদের কতদূর সুখ্যাতি করা উচিত?

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে সহস্র বৎসর সতেজে ও সগৌরবে প্রাদুর্ভূত থাকে এবং নানাপ্রদেশের নরপতিবৃন্দ ইহার সবিশেষ পোষকতা করিয়া যান। পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর ইহা ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তিনশতাব্দীর মধ্যে মুসলমানদিগের আগমনের কিছু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণজাতির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া যায়। বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বা-

সিত হইবার সময় কৃতঘ্ন ভারতমাতাকে সাশ্রুলোচনে সহস্র অভিসম্পাত প্রদান করে; সেজন্য আজ আমাদের দুঃখিনী ভারতমাতা পরাধীনতারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধা এবং চীন প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা সুখে সুখী।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, বৌদ্ধধর্ম্ম কিপ্রকারে নির্ব্বিবাদে ইহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে চিরনির্ব্বাসিত? ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল! বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে তোমরা ভারতে স্বশত্রুদিগের বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকরণের জন্য ইতিহাস কোনরূপ দীর্ঘকাল-ব্যাপী ধর্ম্মযুদ্ধের সাক্ষ্য প্রদান করে না। তরবারি বলে ব্রাহ্মণগণও জয়-লাভ করেন নাই। সত্য বটে, হিন্দুসমাজে যে নূতন ক্ষত্রিয়জাতি আবির্ভূত হন, তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতির সবিশেষ সাহায্য করতঃ নানা দেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হন এবং ইহার উন্নতি সাধন করেন; তথাচ ব্রাহ্মণগণ জাতিভেদের কঠোরশাসনবলে ও আত্মোৎসর্গবলে পৌরা-ণিক ধর্ম্মের সম্যক স্ফূর্ত্তি করতঃ কালক্রমে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করতঃ আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ করেন; তাহাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম চিরদিনের জন্য ভারতে লুপ্ত হইয়া যায়।

আরও দেখ, নিসর্গপ্রধান ভারতভূমিতে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম চির-দিনের জন্য প্রবল হইতে পারে না। সেজন্য বলা উচিত, এ ধর্ম্ম কাল-ক্রমে স্বয়ং কালকবলিত হইয়া যায়। দুর্ব্বল মানব প্রকৃতিদেবীর ভয়া-বহ মূর্ত্তি দর্শনে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত কিছুতেই নিজ ভয়বিহ্বল মনকে সান্ত্বনা করিতে পারেন না। এজন্য নির্গুণ বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস এদেশের প্রকৃতিসিদ্ধ। যখন স্বয়ং প্রকৃতি প্রকৃতি-সেবক ব্রাহ্মণজাতির উপর এত অনুকূল, তখন ব্রাহ্মণদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম কি প্রকারে এ দেশে বহু-কাল স্থায়ী হইতে পারে? বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধদেব পরব্রহ্মের অবতার নন; কিন্তু তিনিই পরব্রহ্ম। এই মহৎ ভ্রমবশতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে লুপ্ত হইয়া যায়।

তৎকালে একদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম সমাজে যত প্রবল হইতে থাকে, এধর্ম্ম নিরাকরণার্থ অন্যদিকে ব্রাহ্মণজাতি জাতিভেদের কঠোর শাসন ততই দৃঢ়-তর করিতে থাকেন। যিনি একবার ভুলক্রমে স্বজাতি ত্যাগ করতঃ

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তিনি অটুট হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারেন না। বহুকাল একত্র সংস্রবে থাকায় বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকৃষ্ট মতামত হিন্দুধর্ম্মে ক্রমশঃ মিলিত হইয়া যায়। কালক্রমে বুদ্ধদেবও হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান দেবতা বিষ্ণুর অবতার বিশেষ বলিয়া গ্রাহ্য হন। বৌদ্ধদিগের পীঠস্থান গয়া ও শ্রীক্ষেত্র ক্রমশঃ হিন্দুদিগের মহৎ তীর্থ হইয়া যায়। যখন লোকে হিন্দুধর্ম্মেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকৃষ্ট মতামত দেখিতে পায়, তখন কোন্ নির্ব্বোধ ব্যক্তি কুলপরম্পরাগত জাতীয় সম্মান ত্যাগ করতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লইতে যায়? এই প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ সমাজে জয়লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হয়। ইতিপূর্ব্বে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের মিশ্রণে জৈনসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধগণও হিন্দুদিগের বাক্যবাণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জৈনসম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া যায় এবং জৈনসম্প্রদায়ও বৌদ্ধধর্ম্মের নামগন্ধ স্বধর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দেয়। এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে লুপ্ত হইয়া যায়।

যেমন খ্রীষ্ট জগতে মারটিন লুথর কর্ত্তৃক প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবার পর, সেণ্ট ঈগনেসাস ল্যায়োলাপ্রমুখ ধর্ম্মসংস্কারকগণ ইউরোপীয় জনসাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার করেন; সেইরূপ হিন্দুসমাজেও শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ধর্ম্মসংস্কারকগণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া স্বধর্ম্মের আমূল সংস্কার করেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যদেবও অল্পবয়সে সন্ন্যাসব্রতে ব্রতী হন, সমগ্র বেদবেদান্তে পূর্ণ অধিকার লাভ করেন এবং যোগসিদ্ধ হন। পরিশেষে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয়ের জন্য তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। সত্য বটে, তিনি চতুরঙ্গবলে পরিবৃত হইয়া তরবারি বলে দেশবিশেষ জয় করেন নাই; কিন্তু তাঁহারই দিগ্বিজয় যথার্থ সাত্ত্বিক দিগ্বিজয়। তিনি আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন, যে সকল পুস্তকাদি রচনা করেন এবং যেরূপ উৎসাহের সহিত সমগ্র ভারতে ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলন করেন, তাহাতে তাঁহার যশোরাশি যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভারতে দেদীপ্যমান থাকিবে এবং তাহাতে তাঁহার নাম ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত চিরদিন সমস্বরে উদ্ঘোষিত

হইবে। গৃহাশ্রমী দ্বারা তাদৃশ ধর্ম্মোন্নতিসাধন হওয়া অসম্ভব জ্ঞানে তিনি ভারতের চতুষ্কোণে চারিটী মহামঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিদিগের আদর্শে হিন্দুধর্ম্মের সন্ন্যাসিকুল প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। পূজ্যপাদ জগৎগুরুর এই সকল শিষ্যানুশিষ্য বিবিধ শাস্ত্র রচনা করতঃ অথবা পূর্ব্বতন শাস্ত্রসমূহের আমূল সংশোধন করতঃ হিন্দুসমাজকে যেরূপ নবোৎসাহে উৎসাহিত করেন, তাহাতেই আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বত্র জয় জয়কার হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম চিরদিনের জন্য ভারতে লুপ্ত হইয়া যায়।

যেমন এক সময়ে পূজ্যপাদ মহাত্মা বুদ্ধদেব যেরূপ উৎসাহরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসরণ করতঃ ভারতে মহাদাবানল প্রজ্জলিত করেন এবং সেই দাবানল ক্রমশঃ অর্দ্ধভূমণ্ডলে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যদেবও বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকরণার্থ যেরূপ উৎসাহরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসরণ করেন, তাহাতে সমগ্র ভারতে দাবানল প্রজ্জলিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মও সেই দাবানলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কোথায় হে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যদেব! ধন্য তোমার সন্ন্যাসব্রত ধারণ। ধন্য তোমার বেদান্তজ্ঞান! ধন্য তোমার উৎসাহ! তোমার নিকট আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ ঋণে আবদ্ধ, তাহা এক মুখে বর্ণন করা যায় না। ভারতে তোমার জন্মগ্রহণ না হইলে, হয়ত আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনের জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তখন কোথায় বা বেদবেদান্ত! কোথায় বা রামায়ণ ও মহাভারত! সকলই অনন্তকালের অনন্তস্রোতে ভাসিয়া যাইত। অতএব আইস, আমরা সকলে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিভাবে প্রণত হই।

এখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে হিন্দুধর্ম্মের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লেখা কর্ত্তব্য। যৎকালে বৌদ্ধ-ভিক্ষুভিক্ষুনিগণ অসাধারণ উৎসাহের সহিত বৌদ্ধমত ভারতে প্রচার করেন এবং অশোকাদি নৃপতিবৃন্দ ইহার সবিশেষ পোষকতা করায় জনসাধারণ দলে দলে ঐ মত অবলম্বন করে, তৎকালে ব্রাহ্মণজাতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন বটে, কিন্তু তাঁহারা একেবারে নিরুৎসাহ বা পরাস্ত হন না। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্ম্মই সমভাবে আর্য্যসমাজে প্রচলিত থাকে এবং উভয় ধর্ম্মের অধিনায়কগণ রাজন্যবর্গ দ্বারা সমভাবে পূজিত ও আদৃত হন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই পুরাকালীন

বৈদিকধর্ম্ম আর্য্যসমাজে স্মার্ত্তধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কালবশাৎ বৈদিকভাষা যতই সাধারণ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দুর্ব্বোধ্য হয়, শ্রুতিশাস্ত্র হইতে সহজ বোধগম্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলি রচিত হয়; জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে কালবশাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে হিন্দুসমাজের সাধারণ বিশ্বাস যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সাধারণ বিশ্বাসানুযায়ী লিখিত হওয়ায় এবং উহাদের দর্শন প্রতিপাদিত অর্থ ও প্রত্যর্থ হওয়ায় এক দেশের সাধারণ বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয় এবং অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়। এই প্রকারে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি স্মার্ত্তধর্ম্ম ভারতে প্রবল করে।

যে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত, তৎকালে হিন্দুসমাজে প্রথমে স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রবল হয়; পরে আধুনিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং পরিশেষে উহারাই সম্যক পরিবর্দ্ধিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে দূরীভূত করে। যতদিন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে একত্র প্রাদুর্ভূত, ততদিন উভয় ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের মতামত, আচার ব্যবহার ও উপাখ্যানাদি লইয়া স্বদেহ পুষ্ট করে। সত্য বটে, পূজ্য দেবতা, বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও জাতিভেদ লইয়া উহাদের মতভেদ থাকে; কিন্তু ধ্যানযোগ, যোগাভ্যাস, মুক্তি, মায়াবাদ, যোনিভ্রমণ, কর্ম্মফল, অহিংসা, তীর্থভ্রমণ, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, জপমালা, সন্ন্যাসধর্ম্ম, বিশ্বমৈত্রীভাব, নিষ্কামধর্ম্ম, ভক্তিযোগ, দানধর্ম্ম, শাস্ত্রপাঠ, মঠবিহারাদি নির্ম্মাণ, তন্ত্রশাস্ত্র রচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে চালনা করে এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে আত্মস্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, মহাত্মা বুদ্ধদেবও সেই আদ্যস্তর হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহৎ মহৎ সত্য লইয়া স্বীয় ধর্ম্ম জগতে প্রচার করেন; এজন্য নানা বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে এত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

যে সময়ে বুদ্ধদেব জগতে আবির্ভূত, সে সময়ের অধিকাংশ পণ্ডিত অসার যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৃপ্তি বোধ করিতেন না; এজন্য তিনি যাগযজ্ঞের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তৎকালোচিত ধর্ম্ম প্রচার করেন। সমাজের ও মানবমনের যে অবস্থায় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান আদৃত হয়, বুদ্ধদেবের সময় সে অবস্থার বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অতএব বৈদিক যাগযজ্ঞের

অনুষ্ঠান অপেক্ষা বৌদ্ধমত যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার যে বৌদ্ধধর্ম্ম পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া উহার স্থানে কেবল বুদ্ধদেবের পূজা করে, সে ধর্ম্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম যে আরও উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই; নতুবা কি প্রকারে উপরোক্ত ধর্ম্ম ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হয়?

স্মার্ত্তধর্ম্মানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ ও সূর্য্য এই পঞ্চদেবতার পূজন হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয় এবং এক এক দেবতা লইয়া এক এক মূলসম্প্রদায় আবির্ভূত হয়। এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মা, পরে শিব, তৎপরে বিষ্ণুর উপাসনা ভারতে বহু বিস্তৃত হয়। যে সময়ে যোগেশ্বর কপিল মুনির সাংখ্যমত হিন্দুসমাজে সমাদৃত হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃতির ত্রিগুণানুসারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতার পদগৌরব আরম্ভ হয়; তন্মধ্যে রজঃপ্রধান ব্রহ্মা, তমঃপ্রধান শিব, সত্ত্ব-প্রধান বিষ্ণু সমাজের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে দেবমণ্ডলীর ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন; কারণ মানব যে সময়ে যে গুণলাভের প্রার্থী হন, তিনি স্বীয় পূজ্য দেবতায় সেই গুণের পূর্ণ বিকাশ দেখেন।

যে সময়ে মনুসংহিতা রচিত হয়, সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্মযুগ প্রবর্ত্তিত। আজকাল বিষ্ণুর যে সকল গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত, ব্রহ্মযুগে সে সকল শব্দ ব্রহ্মায় প্রযুক্ত হয়। এখন বিষ্ণু নারায়ণ, ব্রহ্মযুগে ব্রহ্মাই নারায়ণ। তৎকালে লোকে ব্রহ্মার মৎস্য প্রভৃতি অবতার গ্রহণে বিশ্বাস করিত। এখন ব্রহ্মার কোন উপাসকসম্প্রদায় বর্ত্তমান নাই। শিবোপাসনাই ব্রহ্মার উপাসনা লোপ করিয়া দেয়; তজ্জন্য শাস্ত্রে কথিত, মহাদেব ব্রহ্মার একটী মস্তক কর্ত্তন করেন। শিবোপাসকগণ শাস্ত্রে ব্রহ্মার ভূয়সী নিন্দা করেন। তিনি স্বদুহিতার উপর প্রেমাসক্ত হন, এ অপবাদ তাঁহারাই শাস্ত্রে প্রকাশ করেন।

সত্য বটে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় হিন্দুসমাজে আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম আদৌ বিকশিত হয় নাই, তথাচ ইহার মৌলিক বিশ্বাসগুলি হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। যে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ বীরত্ব ও লোকাতিগ গুণগ্রামের জন্য ক্ষত্রিয়সমাজে বহুকাল হইতে বিখ্যাত এবং যাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ রামায়ণ ও মহাভারতে গীত

হওয়ায় উঁহাদের উপর লোকের ভক্তি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে, তাঁহারা বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে পূজিত হইতে থাকেন। যে শিবোপাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতে প্রচারিত হয়, সেই শৈবধর্ম্মই কয়েক শতাব্দীর ভিতর ভারতে সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠে এবং কাশী এ ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র হয়। শঙ্করাচার্য্যদেব শৈবধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতিসাধন করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালেবর দেশে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তত্ত্ববিদ্যাবিৎ মহাত্মাদিগের মতে তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। এই যোগেশ্বর মহাত্মা যে সময়েই ভারতে আবির্ভূত হউন না কেন, তাঁহারই অধ্যবসায় ও উৎসাহগুণে হিন্দুসমাজ পুনরায় ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পরিপুষ্ট কলেবরকে কালান্তক যমোপম শঙ্করদেবের ত্রিশূলাঘাতে বিপর্য্যস্ত করিতে সক্ষম হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম অবস্থায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্ম এবং পূর্ব্বাঞ্চলে তন্ত্রমতানুযায়ী শাক্তধর্ম্ম প্রবল হয়; কিন্তু মধ্যভারতে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রথমে জৈনমত, পরে শৈবমত, তৎপরে বৈষ্ণবমত ক্রমশঃ প্রবল হয়। ঐ সকল প্রদেশস্থ মন্দিরাদি উপরোক্ত সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

যাহা হউক, ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণজাতি উৎকৃষ্ট পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ করতঃ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূলোৎপাটন করিতে সমর্থ। যে বৌদ্ধধর্ম্ম সগৌরবে ভারতে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া প্রচলিত, সে বৌদ্ধধর্ম্মের নামগন্ধ আজ কোন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে (কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং)! কেবল মাত্র ব্রাহ্মণজাতির বুদ্ধিকৌশলে হিন্দুসমাজের কোন ব্যক্তি জানিতেন না, যে বৌদ্ধধর্ম্ম এতকাল ভারতে প্রচলিত; তাঁহারা স্তূপাকার বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের পরিবর্ত্তে স্তূপাকার হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া যান; কিন্তু তাঁহাদের সকল বুদ্ধিকৌশল আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট পরাস্ত। উঁহারা নানাশাস্ত্র মন্থন ও নানাবিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃতির অখণ্ড্য প্রমাণ দেন।

এখন দেখা যাউক, বিলুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের কি কি স্থায়ী চিহ্ন এখন ভারতে বর্ত্তমান ?

(১) অর্দ্ধহিন্দু ও অর্দ্ধবৌদ্ধ, জৈনসম্প্রদায় এখনও নানা প্রদেশে বর্ত্তমান। এ সম্প্রদায়স্থ লোকে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিক সদাচারী ও অহিংসাপর ; ইহাদের ভিতরও বুদ্ধদেবের নামগন্ধ নাই।

(২) নাস্তিকমত প্রচারার্থ বিষ্ণুর নবম অবতারে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব !

(৩) যে গয়ায় বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বধর্ম্মমত প্রচার করেন এবং যাহা বৌদ্ধদিগের মহৎতীর্থ, সেই গয়া আজ হিন্দুদিগেরও একটী মহৎ-তীর্থ। তথায় পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান প্রদত্ত হয়। দেখ, বিধর্ম্মী আরঙ্গজীব হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের জন্য কাশীর বিশ্বেশ্বর-মন্দির ভগ্ন করতঃ উহার উপাদানে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন ; কিন্তু বিধাতার ভবিতব্য, বিশ্বেশ্বরের মন্দির পুনঃ নির্ম্মিত হয় এবং উহার চূড়াদেশ স্বর্ণপটাহে আবৃত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধ-গয়ার ধ্বংস সাধন করেন না এবং উহার সন্নিকটে হিন্দুমাত্রেরই অবশ্যপ্রতিপাল্য পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ড-দানের ব্যবস্থা করিয়া যথার্থ সাত্বিকভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধন করেন।

(৪) শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিমাত্র। কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি অনুসারে হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত। তথাকার মহাপ্রসাদ জাতিভেদাবজ্ঞাকারী বৌদ্ধমতের পরিচয় দেয় ; তথাকার রথযাত্রাও বৌদ্ধ ও জৈনদিগের রথচালনার পরিচয় দেয়।

(৫) অশোকাদি নৃপতিবৃন্দের খোদিত অনুশাসনপত্র ; অজয়ন্ত, ইলোরা, এলিফাণ্টাদ্বীপের পর্ব্বতগহ্বরস্থ মন্দিরাদি ও বৌদ্ধমঠবিহারের ভগ্নাবশেষ আমাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়।

পরিশেষে বক্তব্য, বৌদ্ধধর্ম্মের সমূলোচ্ছেদ সাধনে ব্রাহ্মণজাতির যে অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশিত, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। মুসলমান-ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম তরবারি বলে, পাশব বলে অন্যান্য ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম একবিন্দু শোণিতপাত না করিয়া স্বশত্রুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ। ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে আর কি হইতে পারে ?

মুসলমানদিগের ভারতাগমনের পূর্ব্বকালীন হিন্দুধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে দূরীভূত করিবার পর পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ-জাতি পঞ্চশতাব্দীকাল হিন্দুসমাজের অধিনায়কত্ব পূর্ণাংশে ভোগ করতঃ নির্ব্বিবাদে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন। এই সময় তাঁহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন; তাঁহারা এতকাল যে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত, তাহা ভারতে লুপ্তপ্রায়; এখন তাঁহারা নূতন ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান এবং নবোত্থিত ক্ষত্রিয়জাতি তাঁহাদের প্রধান সহায়। এখন তাঁহারা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের ভক্তিমার্গ পূর্ণ প্রকটিত করেন। এই সময়ে দেশে দেশে বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইয়া সমগ্র ভারত শাস্ত্রগ্রন্থে পূর্ণ হয় এবং আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বত্র পূর্ণ-বিকাশ হয়। তদানীন্তন রাজন্যবর্গও লক্ষ লক্ষ রজতমুদ্রা ব্যয় করিয়া সুবিশাল মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করতঃ হিন্দুধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তাঁহারা যে সকল মহোচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যান, সে সকল মন্দির কালের সর্ব্বসংহারিকা-শক্তি উপেক্ষা করতঃ এখনও আকাশমার্গে স্বীয় মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক সগর্ব্বে ও সদর্পে তাঁহাদের বদান্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ দেদ্দীপ্যমান। শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থলের মন্দির দর্শনে কাহার না মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়? এই সময়ে হিন্দুসমাজে কোথাও শৈবধর্ম্ম, কোথাও শাক্তধর্ম্ম, কোথাও বা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল হয়। এই সময়ে যে সকল পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হয়, উহারাই উপরোক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্মকে দেশবিশেষে প্রবল করিয়া দেয়।

এস্থলে ইহা সকলের জানা আবশ্যক যে, পুরাণাদি লিখিত হইয়াই যে ঐ সকল ধর্ম্মমত হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, এমন নহে। অতিপ্রাচীনকাল হইতে ঐ সকল দেবদেবীর উপর বিশ্বাস সমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত; সেজন্য শাস্ত্রকারেরা সাধারণ সমাজের বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়া সাধারণ ধর্ম্মমতগুলি সমাজে আরও বদ্ধমূল করেন এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতিসাধন করেন। দেখ, ভারতচন্দ্র মাণিকপীরের বিষয় লিখিয়া যান, ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। বহুদিবস মুসলমানসমাজের সংস্রবে থাকিয়া জনসাধা-

রণ মাণিকপীরে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে বলিয়াই তিনি স্বপুস্তকে ঐরূপ লিখিয়া যান। সেইরূপ শাস্ত্রকারেরা একদিনে শিব বা বিষ্ণুকে সংহারকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা প্রতিপাদন করেন নাই। আর্য্যসমাজবিশেষে কালক্রমে ধর্ম্ম-বিষয়ক উন্নতির সঙ্গে অথবা অন্যান্য জাতির সংস্রবে ঐ সকল বিশ্বাস উদ্ভূত। শাস্ত্রকারেরা ঐ সকল বিশ্বাসগুলিকে সমাজে আরও বদ্ধমূল করিবার জন্য বা অন্যত্র প্রচার করিবার জন্য উহাদের সম্যক পোষকতা করেন। সমাজে যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি সাধিত, সাধারণ বিশ্বাসগুলিকে সর্ব্বত্র সমভাবে চালিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা আপনাদের উন্নত দার্শনিক জ্ঞান স্বাহায্যে উহাদের তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে আরও বদ্ধমূল করেন। সেজন্য বিজ্ঞানের মতে ঐ সকল ধর্ম্মমত সামাজিক নির্ব্বাচনে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও কালক্রমে বিকশিত।

আজকাল নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে মনে করেন, যে স্বার্থপর ব্রাহ্মণ-জাতি অপর জাতিদিগকে কুসংস্কারজালে জড়িত করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব সমাজে পূর্ণভাবে বজায় রাখিবার জন্যই পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। তাহার সাক্ষ্য, দেখ ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্রদেবও ব্রহ্মশাপে সহস্রাক্ষ হন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। নব্যসম্প্রদায় বলেন, পৌত্তলিক পৌরাণিক ধর্ম্ম কেবল কুসংস্কারে পূর্ণ এবং ব্রাহ্মণজাতির বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ ও হিন্দুজাতির জাতীয় অধঃপতন বশতঃ পৌরাণিক ধর্ম্মের সম্যক স্ফূর্ত্তি হয়; এজন্য আধুনিক হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণজাতির কঠোর শাসনে কুসংস্কারাবদ্ধ হইয়া সামান্য পুতুল-পূজায় তৃপ্তিবোধ করে।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে ব্রাহ্মণজাতি সামান্য দক্ষিণা বা ভিক্ষা প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে আবহমানকাল ধর্ম্মপথে চালান, তাঁহারাই কি স্বার্থের পূর্ণ অবতার? আর যে ইংরাজরাজ রাজপ্রসাদের প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে পাশ্চাত্য বিদ্যালোক প্রদান করেন, তাঁহারাই কি নিঃস্বার্থের পূর্ণ অবতার! পৌরাণিক ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াই কি স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতি হিন্দু-সমাজকে কুসংস্কারে জড়িত করেন এবং জাতীয় অধঃপতন আনয়ন পূর্ব্বক ভারতমাতাকে পরাধীনতারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করান? যে জাতির বুদ্ধিভ্রংশ-বশতঃ ভারতের এতদূর অমঙ্গল সম্পাদিত, সে জাতি কেন ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া আজ ভারতে সর্ব্বত্র পূজ্য?

পৌরাণিক ধর্ম্ম কি কেবল কুসংস্কারে পূর্ণ? যে ধর্ম্ম কালোচিত উৎকর্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক মানবকে মনের সকল ভাবে একমাত্র ঈশ্বর অন্বেষণ করিতে উপদেশ দেয় এবং যে ধর্ম্ম মনের যাবতীয় সাত্ত্বিকভাব স্ফুরণ করিতে চেষ্টা পায়, কে বলে, সে ধর্ম্ম অপকৃষ্ট? কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্ট, কি মুসলমান, জগতের কোন ধর্ম্মই হৃদয়স্থ সাত্ত্বিকভাবের স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা পায় না! এ বিষয়ে উহারা এক প্রকার মৌনাবলম্বন করে। জগতে একমাত্র পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মই এ বিষয়ে চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করে। একমাত্র পৌরাণিক ধর্ম্ম মানবকে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত ও তন্ময় করিয়া আনন্দে নৃত্য করায়। এ ধর্ম্মই তাঁহাকে অসাধারণ ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ-জাতি সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই এ ধর্ম্ম বিকাশ করেন এবং ইহা দ্বারাই সমাজের আধ্যাত্মিকতা চিরদিন এত অধিক স্ফুরিত। কি দর্শন, কি কাব্য, কি সঙ্গীত, কি শিল্প, সকল বিষয়েই যেমন হিন্দু অচিন্তনীয় উন্নতি ও অলৌকিক পরাকাষ্ঠা দেখান, তেমনি তিনি একমাত্র পৌরাণিক ধর্ম্ম দ্বারা মানবধর্ম্মের অলৌকিকত্ব প্রকাশ করেন। কে বলে এ ধর্ম্ম অপকৃষ্ট? যে ধর্ম্ম অর্দ্ধভূমণ্ডলবিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় সাধন করে, কে বলে, সে ধর্ম্ম অপকৃষ্ট?

এখন পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রথমে শিবোপাসনা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তন করে। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যসমাজে পশ্চিমোত্তর হইতে অগ্ন্যুপাসনা প্রচলিত হইবার পর, যে সকল পৌত্তলিকজাতি পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং হিন্দুদিগের আচারব্যবহার অবলম্বন করতঃ কাল-ক্রমে হিন্দুসমাজভুক্ত হয়, তাহারাই ভারতে লিঙ্গোপাসনা আনয়ন করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে বোধ হয়, এ ঘটনাটী খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতা-ব্দীতে সংঘটিত। এই লিঙ্গোপাসনা মিসর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিদিয়া, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি সকল সভ্য জনপদবর্গে প্রচলিত ছিল এবং এতৎসম্বন্ধে তত্তৎ দেশে নানা বীভৎস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইত।

অনেকে লিঙ্গোপাসনার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি মানবহৃদয়ে স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি সমধিক প্রবল। এখনও জনসাধারণ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা যেরূপ চালিত,

তাহারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সেরূপ চালিত নয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে কাম-রিপু চিরকালই মানবহৃদয়ে অধিক প্রবল। সেজন্য অতিপুরাকাল হইতে নিকৃষ্ট সুখাসক্ত মানব কামরিপু সেবনের প্রধান অঙ্গ, লিঙ্গ ও যোনির উপাসক হন। যেমন অসভ্যাবস্থায় বাহ্যজগতের ভীতিবিস্ময়োদ্দীপক নৈসর্গিক দৃশ্য-পটল তাঁহার সরলান্তঃকরণকে প্রথম আকৃষ্ট করে, সেইরূপ সৃষ্টিরক্ষার প্রধান অঙ্গীভূত জননেন্দ্রিয় দুইটীও তাঁহার চিত্তকে সম্যক আকৃষ্ট করে। এই কারণেই লিঙ্গোপাসনা মানবসমাজে প্রথম প্রাদুর্ভূত।

লিঙ্গোপাসনা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবার পর, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে, ইহা ক্রমশঃ উন্নতভাব ধারণ করে। যে লিঙ্গোপাসনা নিকৃষ্ট-সুখের পরিচায়ক, যে লিঙ্গোপাসনার পদ্ধতি দর্শনে সভ্যজাতির মনে স্বতঃ ঘৃণার উদ্রেক হয়, সেই অসভ্যোচিত লিঙ্গোপাসনাকে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণগণ পরমেশ্বরপর-মেশ্বরীর পূজায় বা প্রকৃতিপুরুষের পূজায় পরিণত করেন। আমরাও ভক্তসন্তান-বৎ সেই শিবলিঙ্গকে জগৎপাতা জগদীশ্বর জ্ঞান করি এবং সেই শিবযোনিকে জগন্মাতা বিশ্বেশ্বরী জ্ঞান করি। এই প্রকারে হৃদয়স্থ পিতৃমাতৃভক্তি অনুসারে নির্গুণ পরব্রহ্মের হরগৌরীরূপ দুই মায়ারূপের পূজন হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত।

লিঙ্গোপাসনার সহিত হিন্দুসমাজে পৌত্তলিকতা বা প্রতিমাপূজনের প্রথম সূত্রপাত হয়। তৎপূর্ব্বে বা বৈদিক সময়ে কোন দেবতার প্রতিমূর্ত্তি হিন্দু-সমাজে পূজিত হয় নাই। তৎকালে সাধারণসমাজে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সাগ্নিকদিগের অগ্ন্যুপাসনা প্রচলিত এবং ধর্ম্মাত্মা মহর্ষিগণ জ্ঞানমার্গানুসারে নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসক। ভারতে লিঙ্গোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইবার পর, বিশ্বেশ্বর, সোমনাথ, কেদারনাথ, রামেশ্বর, বদ্রিনাথ, ওঙ্কারনাথ প্রভৃতি দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভারতের নানা স্থানে প্রসিদ্ধ হয়। উহাদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি যেরূপ বদ্ধমূল হইতে থাকে, পৌরাণিকগণ উহাদের মাহাত্ম্য ও মহিমা স্ব স্ব গ্রন্থে সেইরূপ প্রকটিত করেন এবং দেশীয় রাজন্যবর্গও উহাদের মন্দিরাদি নির্ম্মাণে ও পূজাদি বিষয়ে সেইরূপ মুক্তহস্ত হন। ঐ সকল শিবলিঙ্গ কোন সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, যে স্মরণাতীত কাল হইতে উহাদের পূজা হিন্দুসমাজে প্রচলিত এবং উহাদের পীঠস্থান চিরদিন হিন্দুদিগের মহৎতীর্থ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, পৌরাণিক ভক্তিযুগে ভক্ত সাধকগণ সাধারণ-সমাজপ্রচলিত উপাস্য দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করতঃ পৌত্তলিকতার সম্যক স্ফূর্ত্তি করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজ্য দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ক্রমবিকাশে হিন্দুজাতির মানসক্ষেত্রে উদিত। সাধকগণের হৃদয়ে দেবোদ্দেশে ভক্তি যেরূপ স্ফুরিত, ভক্তিসূচক উপাদান লইয়া পূজ্য দেবতাদিগের রূপও তেমনি ধীরে ধীরে পরিকল্পিত। সত্ত্বপ্রধান শ্রীবিষ্ণু একদিনে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পদ্মপলাশলোচন, চতুর্ভুজ দেবতা হন নাই। মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তিও সেইরূপ ভক্ত সাধকদিগের নূতন নূতন ভক্তিসূচক উপাদানে ক্রমনির্ম্মিত।

কেহ কেহ বলেন, শতসহস্রযোজনব্যাপী অভ্রভেদী হিমগিরির যে কৈলাসশিখর শিবভূমি বলিয়া বিখ্যাত, সেই কৈলাসপর্ব্বতের আদর্শে শিবমূর্ত্তি পরিকল্পিত। কৈলাসপর্ব্বত সতত বরফাবৃত, এজন্য মহাদেব শ্বেতকায়। কৈলাসপর্ব্বতের কণ্ঠদেশ সতত সঞ্চরমান জলধরপটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় আবৃত, এজন্য তিনি নীলকণ্ঠ। কৈলাস-পর্ব্বতের শিখরদেশ স্তূপীকৃত বরফ দ্বারা স্তরে স্তরে আবৃত, এজন্য তিনি জটামৌলী। কোন ভাবপ্রধান কবি কৈলাসপর্ব্বতোপরি চন্দ্রদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার শশিমৌলী আখ্যা প্রদান করেন। হিমাদ্রির মস্তকোপরি গঙ্গাদেবী বহমানা; এজন্য মহাদেবও গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করেন। পূর্ব্বে পাশুপত প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা শৈবগণ সংসার হইতে বৈরাগ্যাবলম্বন করতঃ ভস্মাবৃতদেহে দিগম্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার বা নির্গুণ লিঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। লোকে যে অবস্থাটী স্বকীয় সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য করেন, তাঁহারা সেই অবস্থাটী ঈশ্বরে বা তাঁহার সাকার প্রতিমূর্ত্তিতে আরোপ করেন; এজন্য মহাদেবও শ্মশানবাসী, ভস্মাবৃতদেহ, দিগম্বর বা অজিন-বাস, বিজয়পানোন্মত্ত, ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তিও ধর্ম্মাত্মা কবিগণের কল্পনাবলে নির্ম্মিত। মথুরাবাহিনী কালিন্দী নদীর যে সলিল কৃষ্ণবর্ণ, উহারই আদর্শে শ্রীকৃষ্ণের নাম ও বর্ণ পরিকল্পিত। প্রেমোন্মত্ত ভক্তসাধক ঈশ্বরপ্রেমে গদগদ হইয়া নৃত্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধর ত্রিভঙ্গমুরারিরূপ কল্পনা করেন।

এইরূপে বিধর্ম্মী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের অশেষপূজ্য দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির উপর উপহাস করেন এবং উহাদের উপর হিন্দুসমাজের বিশ্বাস ও ভক্তি মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পান। কি পাপ! কি পাপ! এ সকল পাপকথা ভক্ত হিন্দুর শ্রবণ না করাই কর্ত্তব্য। এ সকল পাপকথা শ্রবণ করিলেও আমাদের মহাপাপ। এ সকল পাপকথা মনে চিন্তা করিলেও আমাদের মহাপাপ। এখন আমাদের কি দুরদৃষ্ট! হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এ সকল পাপকথা লেখনী হইতে নিঃসরণ করিতে হইল। হা হত বিধে! সূক্ষ্ম জগতস্থ যে সকল দেবতা পরব্রহ্মের চিৎশক্তির উপাধি, যাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি পরমযোগী মহর্ষিগণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ও দিব্যচক্ষে সন্দর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি এতদূর বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যে যাহাই বলুন না কেন, আমাদের স্থিরবিশ্বাস যে, আমাদের প্রপিতামহ মহর্ষিগণ সমাধিস্থ হইয়া দেবদেবীর যেরূপ মূর্ত্তি দিব্যনয়নে সন্দর্শন করেন, তাহাই পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত, চিত্রে আলেখিত ও প্রতিমায় উদ্ভাসিত। কলিযুগের অধম মানব এখন উহাদিগকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পান না। এখন তিনি ঐ সকল দেবমূর্ত্তি হৃদ্‌পদ্মে সদা ধ্যান করুন, মন্দিরাদিতে উহাদিগকে দর্শন করিয়া নিজ চর্ম্মচক্ষু সার্থক করুন, ইহাই তাঁহার এখন প্রকৃত ধর্ম্মসাধন।

শৈব ধর্ম্মানুসারে দেবাদিদেব মহাদেব পরব্রহ্ম স্থানে পূজিত এবং তিনিই পরাৎপর, পরমপিতা পরমেশ্বর। তমঃপ্রধান মহাদেব জগতের যাবতীয় অমঙ্গলরাশি দূরীভূত করায়, তিনি আমাদের শঙ্কর ও শিব। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যদেবপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসিকুল শৈবধর্ম্মকে ভারতে বহুপ্রচারিত করেন। তাঁহারাই মহাদেবকে পিতৃভাবে পূজা করিতে উপদেশ দেন। যৎকালে অন্যান্য দেশে একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় পরমপিতা পরমেশ্বর সর্ব্বত্র পিতৃভাবে পূজিত, তৎকালে দেবাদিদেব মহাদেবও হিন্দুসমাজে পিতৃভাবে পূজিত এবং বাবা তারকনাথ! বাবা বৈদ্যনাথ! বলিতে আমাদের পিতৃভক্তি শতসহস্রধারে উত্থিত। এখনও হিন্দুসমাজ "বুড়োশিবের পায়ে সেবা" দিতে উন্মত্ত।

সকলেই জানেন, অস্মদ্দেশে বাবা তারকনাথ কিরূপ জাগ্রত দেবতা এবং

কত কত লোকে তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া অসাধ্য রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায়! মনের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেই কি সকলে এমন মহোপকার প্রাপ্ত হয়? যখন সামান্য চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস থাকিলে, তৎপ্রদত্ত একবিন্দু ঔষধে রোগের যন্ত্রণা নিবারিত হয়, তখন জাগ্রত দেবতার উপর অটল অচল বিশ্বাস থাকিলে লোকে কেন না রোগমুক্ত হইবে? এই প্রকারে বাবা তারকনাথের বিপুল অর্থাগম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে অর্থের তাদৃশ সদ্ব্যবহার হয় না। এমন সুদিন কবে হবে, যে দিন তথাকার পুণ্যাত্মা মোহন্ত হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিসাধনমানসে চতুষ্পাঠীর ভালরূপ সাহায্য করিয়া বঙ্গদেশের অধ্যাপককুলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন ও মাধবগিরিকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন?

শৈবধর্ম্মানুসারে হিন্দুসমাজে দুইটী মহোৎসব প্রবর্ত্তিত, শিবরাত্রি ও চড়কোৎসব। শিবরাত্রের দিন হিন্দুমাত্রেই উপবাসে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করেন এবং চৈত্রমাসে এখনও বঙ্গের অনেক লোক সন্ন্যাসী সাজিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। প্রজাবৎসল ইংরাজের অনুগ্রহে আমাদের চড়কোৎসব এখন নামে পর্য্যবসিত।

এখন শাক্তধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। শক্তির উপাসনা হিন্দুসমাজে শিবযোনি হইতে প্রবর্ত্তিত এবং বিবিধ তন্ত্রশাস্ত্র দ্বারা ইহা বহুপ্রচারিত। বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিমদশায় বা ইহার নিরাকরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তন্ত্রশাস্ত্রগুলি রচিত ও বহুপ্রচারিত হয় এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ও অনুষ্ঠান সবিশেষ বলবৎ হয়। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদিগের তন্ত্রশাস্ত্রগুলি ভারতে অপ্রচলিত করিবার জন্যই হিন্দুদিগের ভিতরও তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হয়। যাহা হউক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, যেমন পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে পুরাণাদি বহুপ্রচারিত হওয়ায় শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রবল হয় ও বৌদ্ধধর্ম্মের নাশ হয়, সেইরূপ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে তন্ত্রশাস্ত্রগুলি বহুপ্রচারিত হওয়ায় শাক্তধর্ম্ম প্রবল হয় এবং এ ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস সাধন করে।

তন্ত্রোক্ত বীরাচার দেখিয়া অনেকে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

"To the historian, the *Tantra* Literature represents not a special phase of Hindoo Thought but a diseased form of the human mind which is possible only when the national life has departed, when all political consciousness has vanished and the lamp of knowledge is extinct."—*R. C. Dutt.*

"ইতিহাস লেখকের নিকট তন্ত্রশাস্ত্রগুলি হিন্দুচিন্তার কোন বৈশেষিক অবস্থা প্রকাশ করে না। কিন্তু যখন জাতীয়জীবন অপগত বা অদৃশ্য, রাজতান্ত্রিক সজীবতা অন্তহৃত ও সমাজে জ্ঞানপ্রদীপ নির্ব্বাপিত, তখন মানবমনের যতদূর বিকার সম্ভব, সেই সঁকল বিকারে তন্ত্রশাস্ত্রগুলি পরিপূর্ণ।"

হায়! হায়! হিন্দুধর্ম্মের কিরূপ অবমাননা ও লাঞ্ছনা! যে ধর্ম্মাত্মা হিন্দু যে কোন সাধনপথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর অন্বেষণ করুন না, তিনি সেই পথের আদ্যন্ত অবগত হইয়া ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা পাইবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহার কিরূপ অপবাদঘোষণ ও তাঁহার প্রতি কিরূপ দোষারোপ! যে তন্ত্রশাস্ত্র মানবমনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে মৃত্তিকানির্ম্মিত সাকার দেবীর পূজন প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে উপদেশ দেয়, যে শাস্ত্র ষটচক্রভেদ দ্বারা যোগের পরাকাষ্ঠা ও ইন্দ্রিয় দমনার্থ নিয়ম সংযমাদি ভালরূপ শিক্ষা দেয়, যে শাস্ত্র লতাসাধন, শবসাধন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সাধনোপায় উপদেশ দেয়, যে শাস্ত্র অদৃশ্যযোনিগত ডাকিনী ও প্রেতিনীগণকে সাধন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কলিকালের মানবকে সিদ্ধ করিতে চায়, সে শাস্ত্র যদি নিকৃষ্ট সুখাসক্ত মানবকে নিকৃষ্ট সুখভোগে প্রমত্ত করিয়া তাঁহাকে যথার্থ ধর্ম্মপথের পথিক করে, তজ্জন্য উহার কোনরূপ দোষ দেওয়া কি কর্ত্তব্য? তবে কেন তন্ত্রশাস্ত্রের এত নিন্দাবাদ লোকমুখে শ্রুত হয়? তন্ত্রোক্ত কুলক্রিয়াদি দর্শনে কেহ কেহ অনুমান করেন, অনার্য্য অসভ্য জাতির সংস্রবে হিন্দুসমাজে যে সকল বীভৎস ক্রিয়াযোগ প্রবর্ত্তিত, ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের ধর্ম্মোন্নতির সহিত সেই সকল জঘন্য ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্মের উন্নতভাব ধারণ করাইতে চেষ্টা পান। কেহ কেহ বলেন, কুলক্রিয়ার অন্তর্গত পঞ্চমকারের অর্থ উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারী ভেদে বিভিন্ন। যাহা হউক, যে তন্ত্রে ধর্ম্মের স্বর্গীয়ভাব নিহিত, সে শাস্ত্রের এক কুলক্রিয়ার জন্য নিন্দা করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে শক্তিদেবীর প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকাদি উপকরণে নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক উহাকে সাক্ষাৎ সজীব জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে পূজা করাই বিধেয়। দেবীর পূজা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি ষোড়শোপচারে সম্পন্ন। কোন দেশের কোন জাতি মা! মা! বলিয়া ঈশ্বরকে এমন ভক্তিভাবে ডাকিতে শিক্ষা করে নাই। কোন কালে কোন ধর্ম্ম এমন ভক্তিপূর্ব্বক মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে শিক্ষা দেয় নাই। দুর্গোৎসব বাঙ্গালী জীবনের একটী মহানন্দদায়ক মহোৎসব। এমন মহোৎসব কোন্ দেশের কোন্ ধর্ম্ম শিখায় বল? খ্রীষ্টানের গুড্ ফ্রাইডে ও মুসলমানের মহরম ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে অকিঞ্চিৎকর। পূজোপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশ যেরূপ আনন্দে উন্মত্ত, এমন কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। দীনদরিদ্র বঙ্গবাসীর গৃহে জগজ্জননী, অশেষদুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা বৎসরান্তে তিনদিনের জন্য আগমন করেন এবং তদুপলক্ষে সকলে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে আনন্দোৎসব করেন, এমন সর্ব্বমনোরম, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। ওহে বঙ্গবাসিগণ! ধন্য তোমাদের জীবন! বাল্যকাল হইতে তোমরা এই আনন্দোৎসবে যোগদান করতঃ এই পাপতাপপূর্ণ ভবসংসারে অন্ততঃ তিনদিনের জন্য জগজ্জননীর শ্রীচরণ কমলে প্রণত হও ও অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হও, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় তোমাদের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? পাঠক! তোমার শুভাদৃষ্টবশতঃ এ সুন্দর মনোহর দৃশ্য এখনও তোমার নয়নপথে পতিত। কিন্তু লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হয়, যে পাশ্চাত্য কালস্রোত সমাজে খরবেগে বহমান, তাহা ইহাকেও কালগর্ভে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে এবং তোমার প্রপৌত্রাদিগণের সময়, হয়ত এ দৃশ্য চিরদিনের জন্য ভারতে অস্তমিত হইবে!

জড়বাদী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যেমন মহাশক্তির উপাসক, সেইরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম্মও প্রকৃতিরূপ মহামায়ার উপাসক! যেমন আদ্যা মহাশক্তি জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিকাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, তাড়িৎ, উত্তাপ এবং জীবজগতে জীবনীশক্তি প্রভৃতি নানারূপে বিভক্ত হইয়া অনন্ত কেলি প্রদর্শন করে; সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মও এক মহামায়াকে দশমহাবিদ্যায় বিভক্ত

করিয়া উহাকে নানারূপে ভাবিতে উপদেশ দেয়। যেমন ভগবানের দশ অবতার পুরাণে উপদিষ্ট, মহাশক্তির দশ রূপও সেইরূপ তন্ত্রে প্রদর্শিত।

মহাদেবী কাত্যায়নীর দালানভরা প্রতিমা দর্শনে কাহার না মাতৃভক্তি শতসহস্রধারে উথলিয়া পড়ে? কোন্ ধর্ম্মাত্মা মহাযোগী দিব্যনয়নে এ দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করতঃ আমাদের উপকারার্থে শাস্ত্রে বর্ণন করিয়া যান? ওহে কৃতবিদ্য পাঠক! যদি তোমার এরূপ ধারণা হয়, যে এ দেবমূর্ত্তি কবির কল্পনামাত্র, তথাচ একবার ভাব দেখি, যে ভাবুক ধর্ম্মাত্মা কবি বিশ্বসংসার অন্বেষণ পূর্ব্বক এমন ভক্তিব্যঞ্জক উপাদান ও মনোরম বস্তু লইয়া সেই দশভুজা কাত্যায়নীর প্রতিমূর্ত্তি মনোমধ্যে প্রথম গঠন করেন, তিনি কি সামান্য মানব? যে প্রতিমাদর্শনে আমরা মার নামে আজ অনন্যভক্তিতে উন্মত্ত, যে প্রতিমাদর্শনে আমরা সংসারের যাবতীয় শোকতাপ বিস্মৃত হই, যে প্রতিমাদর্শনে অধম বঙ্গবাসী আজ ধর্ম্মজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই প্রতিমা যিনি মনোমধ্যে প্রথম কল্পনা করেন, তিনি ধর্ম্মজগতে কত শ্রেষ্ঠ? ওহে সুশিক্ষিত পাঠক! মনে কর শাস্ত্রের সকল কথা সামান্য উপকথা মাত্র এবং কাত্যায়নী বিগত মন্বন্তরে ঐরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহিষাসুর বধ করেন নাই, তথাচ দশভুজা মহাদেবী মহিষাসুর দলনে একপদ সিংহোপরি, অপর পদ অসুরোপরি স্থাপন পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা, ইহার কি কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না? সংসারের ঘোর জীবনসংগ্রামে প্রকৃতি দেবী কি দশদিক হইতে অসুররূপী, সয়তানরূপী বিশ্বের অকল্যাণ-রাশির সহিত পশুরাজরূপ পাশব-বলের সংঘর্ষণ ঘটাইয়া উভয়কে পদতলে স্থাপন পূর্ব্বক জগতের কল্যাণ সাধন করেন না?

সেইরূপ মহাদেবোপরি করালবদনা লোলজিহ্বা, নৃমুণ্ডমালিনী, খড়্গহস্তা মহাকালীর মহানৃত্য কি কবির কল্পনামাত্র? কার্ত্তিক মাসের ঘোর অমানিশায় তাঁহার মহাপূজা হয়, ইহার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? যেরূপ সংসারে বহুসংখ্যক লোকে ঐ মাসে নানা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, হিন্দুধর্ম্মও সেইরূপ ঐ মাসে প্রকৃতিদেবীর ভয়াবহ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহার পরিতোষের জন্য ষোড়শোপচারে পূজা করিতে উপদেশ দেয়। জড়রূপী, শবরূপী মহাদেবের বক্ষোপরি তদীয় অর্দ্ধাঙ্গ-

রূপিনী মহাশক্তি মহাকালিকা কিরূপে সহস্র সহস্র নর বধকরতঃ নৃমুণ্ডমালায় বিভূষিত হইয়া সমগ্র জগতকে সন্ত্রাসিত করেন, তন্ত্রকল্পিত কালিকা-মূর্ত্তিতে তাহাই প্রতিফলিত। যেমন জননীর ভ্রূকুটিদর্শনে সন্তান ভীত ও ত্রস্ত, জগজ্জননীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনেও জগজ্জন ভীত, ত্রস্ত ও তদীয় শ্রীচরণপদ্মে প্রণত।

যে বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে প্রবল হয়, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবধর্ম্মও হিন্দুসমাজে কালক্রমে ক্রমবিকশিত ও ক্রমস্ফুরিত। বৈদিকসময়ে বিষ্ণু আদিত্য বিশেষ বলিয়া উক্ত বটে; কিন্তু দার্শনিকযুগে হিন্দুসমাজের ধর্ম্মোন্নতির সহিত এ শব্দের অর্থ অন্যরূপ হয়। তখন বিষ্ণু শব্দে বিশ্বপালনকর্ত্তা বুঝায় এবং তদবধি তিনি হিন্দুশাস্ত্রে পরব্রহ্মের সত্ত্বপ্রধান মায়ারূপ। এজন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ উপহাস করেন, বৈদিক সময়ের আদিত্যরূপী বিষ্ণুর পদমর্য্যাদা শাস্ত্রে বর্দ্ধিত হওয়ায়, তিনি কালক্রমে পরাৎপর পরমেশ্বরের স্থল অধিকার করেন। যখন তাঁহাদেরও গড্ শব্দে (god) সামান্য দেবতা বুঝায় এবং ঐ শব্দের আদ্য অক্ষরটী বড় করিলেই পরমেশ্বর বুঝায়, তখন তাঁহারা কেন আমাদের ধর্ম্মের উপর বিদ্রূপ করেন? তাঁহাদের উপহাসেই বা হিন্দুধর্ম্মের কি ক্ষতি? যখন ঐ সকল বিশ্বাস কালক্রমে বদ্ধমূল হইয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত, তখন তাঁহাদের কথায় কে নিজ বিশ্বাস হারায়?

স্মার্ত্তযুগে যখন হিন্দুসমাজে স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রবল, তখন পঞ্চদেবতার মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত এবং স্থলে স্থলে তাঁহারই পূজা রীতিমত অনুষ্ঠিত। অতএব বলা উচিত, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলনের পূর্ব্বে বিষ্ণূপাসনা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রবল, তখন একদিকে শৈবধর্ম্ম এবং অপরদিকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ হিন্দুদিগের ভিতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে।

যখন ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি মনে বিকশিত, তখন মানব শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ প্রাপ্তির কামনায় সত্ত্বগুণের যেরূপ পক্ষপাতী হন বা ইহার যেরূপ সমাদর করেন, তিনি তমোগুণকে সেইরূপ ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। এ কারণ তমঃপ্রধান শিবের উপাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণতেজ হইয়া

সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুর উপাসনা হিন্দুসমাজের নানা স্থানে প্রবল হয়। এ কারণ শ্মশানবাসী অজিনবাসা ভস্মাবৃত ভোলানাথ অপেক্ষা পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পীতাম্বরবাসা শ্রীবিষ্ণু লোকের অধিক প্রিয় হন। এদিকে বিষ্ণুপুরাণাদি বিষ্ণুপ্রধান পুরাণগুলি রচিত ও প্রচারিত হওয়ায় হিন্দুসমাজে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও মহিমা বর্দ্ধিত হয় এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম নানাস্থানে বলবৎ হইতে থাকে। তৎপরে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রামানুজ স্বামী দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হইয়া, বেদান্তমতের নূতন ব্যাখ্যা করতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্মের জয়জয়কার করেন। যেমন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যদেব হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনমানসে মঠাদি নির্ম্মাণ করতঃ শৈবসন্ন্যাসিকুল প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক শৈবধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন; সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা রামানুজস্বামীও বৈষ্ণব সন্ন্যাসিকুল প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্যক উন্নতি সাধন করিয়া যান। আধুনিক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যে সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় বর্ত্তমান, তিনিই সকলের আদিগুরু।

শাস্ত্রমতে বিশ্বপালনকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণু ভূভারহরণার্থ ও ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ কয়েকবার পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ; তন্মধ্যে রামাবতার ও কৃষ্ণাবতার হিন্দুসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্য। অনেকে মনে করেন, যে রামায়ণ ও মহাভারতাদির গুণে তাঁহাদের যশোরাশি বহুকাল হইতে সমাজে প্রখ্যাত হওয়ায়, তাঁহারা বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে পূজিত এবং তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি জাতীয় হৃদয়মন্দিরে কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ নানা নিন্দাবাদ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্মের বিস্তর অবমাননা করেন। তাঁহারা আমাদের দগ্ধ মুখখানি সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পান বটে; কিন্তু তাঁহাদের মুখমণ্ডলও যে আমাদের অপেক্ষা অধিক দগ্ধ, তাহা তাঁহারা জানেন না। যখন সেদিনের খ্রীষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি স্বপ্রবর্ত্তককে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গম্বর বা স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া মানিতে পারে, তখন যদি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম আমাদের অশেষ মঙ্গলার্থ অতিপ্রাচীন কালের, কে-জানে-কোন-সময়ের ধার্ম্মিকবর শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষজ্ঞানে পূজা করিতে উপদেশ দেয়, তাহাতে এ ধর্ম্মের অপরাধ কি? যাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাই পুণ্য।

মুসলমানদিগের আগমনের বহুপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর পূর্ণাবতার জ্ঞানে হিন্দু-সমাজে পূজিত এবং শাস্ত্রকারেরা তাঁহারই বিবিধ লীলা সম্যক বর্ণন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতিসাধন করেন। যেমন কাশী শৈবদিগের মহৎ পুণ্যক্ষেত্র, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা, বৃন্দাবন ও দ্বারকা বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ। ভাগবতাদি পুরাণে ঐ সকল পুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ও মহিমা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ায়, উহারা চিরদিন আমাদের মহৎ তীর্থ।

মুসলমানদিগের ভারতাধিকারকালীন হিন্দুধর্ম্ম।

মুসলমানদিগের ভারতাধিকারকালে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ বিপর্য্যস্ত ও বিপন্ন, ইতিহাসপাঠক মাত্রেই তাহা অবগত। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংস-সাধনের জন্য মুসলমানধর্ম্ম কি না করে! কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে এ ধর্ম্ম অন্তর্নিহিত শক্তিবলে সেই বিপদরাশি হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। যে প্রবলপ্রতাপান্বিত ধর্ম্ম তরবারিবলে স্পেন হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধভূমণ্ডলে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান করে, সে ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াও কালক্রমে উহার নিকট পরাস্ত। ধন্য হিন্দুসমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল! তোমরা হিন্দুস্থানে ম্লেচ্ছ মুসলমানধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিতে সমর্থ। যেরূপ ক্ষত্রিয়জাতি মুসল-মান-তরবারির নিকট পরাভব স্বীকার করে, তোমরাও যদি সেইরূপ মুসল-মানধর্ম্মের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে, কোথায় বা আমাদের বেদবেদান্ত! কোথায় বা আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত! কোথায় বা ষড়দর্শন! কোথায় বা পুরাণাদি। সকলই কালস্রোতে ভাসিয়া যাইত ও চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইত! যেমন তোমরা কায়মনোবাক্যে ও প্রাণপণে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি সংরক্ষণে সচেষ্ট হইয়াছিলে, এখনও তোমরা সেজন্য হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানে অধিরূঢ়। সমাজকে কুসংস্কার শিক্ষা দাও, আর সুসংস্কার শিক্ষা দাও, যখন তোমরা আমাদের জাতিধর্ম্ম ও জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করিতে সমর্থ, তখন আমরা তোমাদের শ্রীচরণকমলে স্বতঃ ও পরতঃ প্রণত হইব। হিন্দুকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া যিনি তোমাদের নিন্দাবাদ করেন, তিনি সমাজের অকালকুষ্মাণ্ড।

আজকাল যেমন খ্রীষ্টানজাতিদের ভাগ্যোদয়, পঞ্চশতাব্দীবৎসর পূর্ব্বে মুসলমানজাতিদিগেরও তদনুরূপ অভ্যুদয় হয়। মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ বিধর্ম্মী কাফেরকে তরবারিবলে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করায় মহাপুণ্য নির্দ্দেশ করেন। এজন্য মুসলমান চিরদিন একহস্তে কোরাণ ও অপরহস্তে তরবারি লইয়া স্বধর্ম্মপ্রচারে দৃঢ়ব্রত। পয়গম্বরের এক কথায় জগতে যে মহাদাবানল প্রজ্বলিত, তাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাঁহারই উপদেশানুসারে তদীয় সেবকবর্গ কিরূপ উৎসাহে ও কিরূপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে অর্দ্ধভূমণ্ডলে স্বরাজ্য ও স্বধর্ম্ম বিস্তার করেন, তাহা সকলেরই বিদিত। তাঁহারা যে দেশ অধিকার করেন, সে দেশে পূর্ব্বতন রাজ্যবিলোপের সঙ্গে পূর্ব্বতন ধর্ম্মও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত। এখন সে দেশে মুসলমানজাতি ব্যতীত পূর্ব্বতন জাতির কোনরূপ চিহ্নমাত্র নাই। ভারতবর্ষেও তাঁহারা পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়া সুদীর্ঘকাল আধিপত্য করেন। হিন্দুধর্ম্মবিলোপের জন্য তাঁহারা কত সহস্র সহস্র হিন্দুপরিবারকে তরবারিবলে বা রাজপ্রসাদ প্রলোভনে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন! কত শত শত দেবমূর্ত্তি ও দেবালয় ভগ্ন করিয়া তদীয় উপাদানে মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণ করেন! কোথায় হে পাষণ্ড, নিঘৃ'ণ্য মামুদ, আরঙ্গজীব ও কালাপাহাড়! তোমরা দুর্ব্বল হিন্দুধর্ম্মের উপর কত উৎপাত কর! তোমাদেরই অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম তোমাদের উপর কত অভিসম্পাত প্রদান করে! তাহারই জন্য তোমাদের রাজশক্তি আজ বিলুপ্ত এবং তোমাদের বংশধরেরা আজ পরের পদানত। তোমরা হিন্দুধর্ম্মের উপর কতদুর অত্যাচার কর! তাহারই জন্য আজ ভারতের তৃতীয়াংশ লোক ম্লেচ্ছ মুসলমান।

হিন্দুধর্ম্মের উপর মুসলমানধর্ম্ম যত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে, হিন্দুধর্ম্মও ইহার জাতিভেদরূপ অভেদ্য দুর্গ আরও দৃঢ়তর করতঃ স্বসমাজকে শাসন করে এবং এই প্রকারে সেই সুদীর্ঘ বিপদ্‌কাল যাপন করিতে সমর্থ। যেমন লোকবিশেষের জীবনে দুঃসময় পতিত হইলে, একমাত্র ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে, সেই বিপদ্‌কাল উত্তীর্ণ হইয়া অনায়াসে নিজ অস্তিত্ব বজায় করা যায়; সেইরূপ জাতীয় জীবনের দুঃসময়েও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া জাতীয় আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিলে, সে দুঃসময় অতিবাহিত করিয়া জাতীয় অস্তিত্ব বজায় করা যায়। এজন্য ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণজাতি সেই ঘোর বিপদ্‌কালে, ভারতের সর্ব্বত্র

[illegible] রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহারা আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করেন [illegible]াজ আমরা সপ্তশতাব্দীর পর স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ [illegible]া বিস্ফারিতহৃদয়ে হিন্দুনামের গৌরব করি। তাঁহারা আমাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করেন বলিয়া, এখনও আমরা তাঁহাদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করি।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করে এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেশভেদে প্রবল হয়। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ ইতিপূর্ব্বে হিন্দুসমাজে যে উৎসাহরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসরণ করেন, রামানন্দস্বামী, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্য, কবীর নানক প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মাগণ তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উত্তেজিত করতঃ সমগ্র হিন্দুস্থানে যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত করেন, তাহাতেই মুসলমানধর্ম্ম সবিশেষ দগ্ধ হয়; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় ইহা ভস্মীভূত হইয়া যায় না। ঐ সকল ধর্ম্মাত্মাগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতিসাধনমানসে স্বসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক সমগ্র হিন্দুসমাজের মহদুপকার সাধন করেন। উপরোক্ত মহাত্মাগণের নিকট আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম চিরঋণে আবদ্ধ। তাঁহারা যেরূপ উৎসাহের সহিত বিবিধ শাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া যান ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যান, সেই উৎসাহের গুণে বহুসংখ্যক লোক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে নাই। মহাত্মা নানক পঞ্জাবে স্বসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত না করিলে, বোধ হয়, সমগ্র পঞ্জাব মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। সেইরূপ মধ্য প্রদেশে কবীর, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব এবং মহারাষ্ট্রে একনাথ স্বামী হিন্দুসমাজের মহদুপকার সাধন করেন। তদ্ভিন্ন আরও কত প্রদেশে কত মহাত্মার আবির্ভাব হয়! ইহাদেরই উপদিষ্ট শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রাপ্ত হইয়াই সমগ্র হিন্দুসমাজ নূতন ধর্ম্মবলে বলীয়ান হয় এবং মুসলমানধর্ম্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হয়। সত্য বটে, তাঁহারা যে সকল সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, তন্মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের জাতিভেদপ্রথা না মানায় সাধারণ হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত; কিন্তু কালক্রমে সাধারণ সমাজই তাঁহাদের উৎকৃষ্ট মত অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সবিশেষ পোষকতা করেন।

মুসলমানদিগের সময় হিন্দুসমাজে যে সকল আচারব্যবহার প্রচলিত,

উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, কি প্রকারে হিন্দুজাতি ম্লেচ্ছ মুসলমানজাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্ট থাকিবে। এই সময়ে দেশভেদে হিন্দুমহিলাগণের ভিতর অবরোধপ্রথা, চৌকাপ্রথা, খাদ্যাখাদ্যের বিচার প্রভৃতি নানা আচার ও ব্যবহার প্রচলিত। এই সময় হইতে উপধর্ম্মপালনই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হয়। এই সময়েই জাতিভেদের কঠোরশাসন সমাজে আরও দৃঢ়তর হয়।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা একটী জ্বলন্ত সত্য, যখনই কোন কারণ বশতঃ এ ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত, তখনই নূতন নূতন সংস্কারকবৃন্দ হিন্দুসমাজে অবির্ভূত হইয়া সনাতনধর্ম্মরক্ষণে সচেষ্ট হন। তাঁহারাই এ ধর্ম্মের এক এক নূতন ভাব স্ফুরণ করতঃ সাধারণ সমাজকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করেন। বল্লভাচার্য্যের বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, চৈতন্যদেবের প্রেমভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁহাদেরই উৎসাহ বশতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এত ধর্ম্মবিপ্লব ও এত রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে ও কালসমুদ্রে অবিরামস্রোতে বহমান হইতে সক্ষম। সত্য বটে, সকল সম্প্রদায়ই দেশোচিত ও কালোচিত হওয়ায় পুরাতন সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে বিভিন্ন; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এমনি স্থিতিস্থাপকগুণ যে, কালবশতঃ ঐ সকল সম্প্রদায়ও হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত, তখন শাক্তগণ উহার যথেষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু এখন শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের ভিতর তাদৃশ বিরোধ দৃষ্ট হয় না এবং বৈষ্ণবগণও সাধারণ হিন্দুসমাজভুক্ত।

ইংরাজদিগের ভারতাধিকারকালীন হিন্দুধর্ম্ম।

আজকাল ইংরাজদিগের অধিকার কালে হিন্দুধর্ম্মের যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিকরূপ বিগত দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত, তাহাই প্রবল। দেশভেদে ইহার শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবমত এখনও প্রবল। পূর্ব্বাঞ্চলে শাক্তমত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণবমত ও দাক্ষিণাত্যে শৈবমত প্রবল। আবহমানকাল সমাজের জ্ঞানন্নোতি ও ধর্ম্মোন্নতির সহিত যে সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত হিন্দুধর্ম্মে স্ফুরিত ও বিকশিত, তাহাই সর্ব্বত্র গৃহীত, অনুশীলিত ও

আদৃত। ইহার সামাজিক রূপের যে সকল আচারব্যবহার সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিপালিত। এখনও দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ মহোৎসব ও অন্যান্য উপমহোৎসব এবং জীবনের বিবিধ সংস্কার বৈদিক নিয়মানুসারে বা তান্ত্রিক নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত। এখনও শৈব ও বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণ দেশে দেশে তীর্থভ্রমণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা করেন এবং লোকে তীর্থদর্শন ও গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্যলাভ করেন। এখনও সমগ্র হিন্দুসমাজ প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দুশাস্ত্রানুসারে চালিত ও পূজ্য-ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা অনুশাসিত। কিন্তু পাশ্চাত্য বিদ্যাবিস্তৃতির সঙ্গে প্রধান প্রধান নগরীতে পাশ্চাত্য স্রোত বহমান হওয়ায় তথায় হিন্দুয়ানী ও ধর্ম্মভাব মন্দীভূত, সমাজশাসন শিথিল, জনসাধারণ অনেক বিষয়ে যথেচ্ছাচারী এবং অধ্যাপককুল ও পুরোহিতবর্গ অনাদৃত ও অপূজ্য। এইরূপে আমাদের আচারব্যবহারও কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

সুসভ্য, রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজরাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না বা কোনরূপ অত্যাচার করেন না। কিন্তু তাঁহারা ভারতের মঙ্গলার্থে পাশ্চাত্য বিদ্যারূপ যে চন্দনতরু রোপণ করেন, তাহা কালে বিষবৃক্ষে পরিণত হইবে এবং ইহার বিষময় ফলে হিন্দুসমাজে বিষম অনর্থপাত ঘটিবে। আর তাঁহাদের পৃষ্টপোষিত খ্রীষ্টান মিসনরিগণ স্বধর্ম্মপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রথমাবস্থায় অনেক বিকৃতমস্তিষ্ক হিন্দুযুবককে স্বধর্মে দীক্ষিত করেন। ইহাতে হিন্দুসমাজের অমঙ্গল কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত। কিন্তু তাঁহারা এখন স্বধর্ম্মপ্রচারে প্রায় বিফলমনোরথ। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতেছেন যে ভারতবাসী কস্মিনকালে খ্রীষ্টধর্ম্মকে সাদরে ও সাগ্রহে আলিঙ্গন করিবে না বরং ইহার উপর চিরদিন বীতশ্রদ্ধ থাকিবে। যে স্থলে মুসলমানধর্ম্ম এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া পঞ্চশতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের যথাৎ অপকার করিতে অসমর্থ, সে স্থলে খ্রীষ্টধর্ম্ম একমাত্র বাইবেল লইয়া এ ধর্ম্মের কি অনিষ্ট করিবে?

যৎকালে খ্রীষ্টধর্ম্মমত কৃতবিদ্য সমাজে আদৃত এবং লো... খ্রীষ্টধর্ম্মালিঙ্গনার্থ উদ্‌গ্রীব, তৎকালে ধর্ম্মাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গগগনে... হইয়া বেদান্ত হইতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এর বার্ত্তা ভারতে পুনঃ প্রচার...

এবং বঙ্গীয় সুধিবর্গের ধর্ম্মপিপাসা ও ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে খ্রীষ্টমত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া খ্রীষ্টমত খণ্ডন করেন। রবিবাসরে গির্জ্জায় খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মানুশীলন দেখিয়া, তিনিও ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া রবিবাসরে সমাজগৃহে ঈশ্বরারাধনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। আধুনিক সাকারবাদী হিন্দুশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দেও, তিনি প্রাচীন শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের পরাজয় সাধন করেন। যেমন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যদেব বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসিদিগের আদর্শে শৈবসন্ন্যাসিকুল প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় সাধন করেন; সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়ও বেদান্তের শ্রেষ্ঠমত দ্বারা খ্রীষ্টমত খণ্ডন করেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মেরই পরাজয় সাধন করেন। কোথায় হে পূজ্যপাদ রামমোহন রায়! হিন্দুব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি হিন্দুধর্ম্মের কি মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছ? 'একমেবাদ্বিতীয়ং'এর বার্ত্তা প্রচার করিয়া তুমি যে সকল লোককে হিন্দুধর্ম্মপূজিত বেদান্তের সুশীতল অনাতপে আশ্রয় প্রদান করিয়াছ, তাঁহারা সকলেই তদভাবে নিশ্চয়ই ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইত। যে সকল হিন্দুযুবক পাশ্চাত্যবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া পৌত্তলিকতাকে ঘৃণাচক্ষে অবলোকন করিতেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই তুমি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছ; যদি তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চিরদিনের জন্য হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতেন, তাহাতে হিন্দুসমাজের কত অমঙ্গল ও কত ক্ষতি হইত? এজন্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত, সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত এবং রামমোহন রায়প্রমুখ ধর্ম্মাত্মাগণের নিকট হিন্দুসমাজ চিরঋণে আবদ্ধ।

এখন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের উপর সাধারণ হিন্দুসমাজের যেরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখা যায়, তাহা কালক্রমে মন্দীভূত হইবে এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ও কালে সাধারণ হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইবে। যখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, তখন তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ও সাধারণ হিন্দুসমাজের ঘৃণাস্পদ হয়, কিন্তু কালক্রমে তাহাও হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হওয়া যায়।

কোথায় হে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি এখনও বুঝিতে পার নাই, যে হিন্দুধর্ম্মের জাতিভেদপ্রথা ও সংস্কারগুলি না মানাতে তোমাদের উপর সাধারণ হিন্দুসমাজের এত বিদ্বেষ এবং তোমাদেরও এমন ক্রমাবনতি! তোমরা অজাতি কুজাতির কন্যা বিবাহ কর, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করাও, পরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা ও জীবনের বিবিধ সংস্কার মান না, ইহাতেই তোমরা আজ হিন্দুজাতির বিদ্বেষানলে পতিত। মহাত্মা রামমোহন রায় এরূপ ভ্রমে পতিত হন নাই; কিন্তু স্বর্গীয় কেশবসেনই বিকৃতমস্তিষ্ক হিন্দু-যুবকদিগের চালক হইয়া এই ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারই দোষে ব্রাহ্মসমাজের এমন অবনতি। যদি তোমরা হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা ও সংস্কারগুলি বজায় রাখিয়া হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ করতঃ কেবল পরব্রহ্মের বা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে, আজ তোমাদের ধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি সাধন হইত এবং শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ও দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রোড়-দেশে আশ্রয় লইত। তোমাদের নিজ দোষে তোমাদেরই সত্য ধর্ম্ম আজ মুষ্টিমেয় দলে নিবদ্ধ। তোমরা শ্রেষ্ঠমতটী হিন্দুধর্ম্মপূজিত বেদান্ত হইতে গ্রহণ করিলে, গির্জ্জার আদর্শে নিজ সমাজ ও মন্দির প্রস্তুত করিলে, বৈষ্ণব-দিগের সংকীর্ত্তনটুকু লইলে; কিন্তু হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা ও সংস্কার-গুলি না মানায় তোমরা স্বসম্প্রদায়ের বিস্তর অনিষ্ট করিয়াছ। *

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা একটী জলন্ত সত্য, যখন যুগধর্ম্মানুসারে বা সময়গুণে এধর্ম্ম অন্য কোন পরাক্রান্ত ধর্ম্মকর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত, তখনই নূতন নূতন সংস্কারকগণ আবির্ভূত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মের অনুকরণে স্বশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতর মত গ্রহণ পূর্ব্বক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা পান। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকরণের জন্য শঙ্করাচার্য্যদেবের আবির্ভাব, মুসলমানধর্ম্মের পরাজয়ের জন্য চৈতন্যাদি মহাত্মাগণের আবির্ভাব এবং খৃষ্টধর্ম্মের পরাজয়ের জন্য রামমোহন রায়প্রমুখ সংস্কারকগণের আবির্ভাব উপরোক্ত মহাসত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

---

* এস্থলে ব্রাহ্মগণ আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবেন না। যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, তাহাই এ লেখনী হইতে নিঃসৃত হইল।